

ইসলামী চিন্তাধারার উপর এক'শ একটি মুনাযিরা

মূল ঃ মুহাম্মদ মুহাম্মদী ইশতিহারদী

অনুবাদ ঃ মীর আশরাফ-উল-আলম

প্রকাশনায় ঃ ইমাম আলী (আঃ) ফাউন্ডেশন, কোম-ইরান।

ইসলামী চিন্তাধারার উপর

এক'শ একটি মুনাযিরা



মূল ঃ মুহাম্মদ মুহাম্মদী ইশতিহারদী

অনুবাদ ঃ মীর আশরাফ-উল-আলম

প্রকাশনায় ঃ ইমাম আলী (আঃ) ফাউন্ডেশন, কোম-ইরান।

مائة و احدى مناظرة، باللغة البنغالية

نام كتاب	:	صد و يك مناظرة
مؤلف	:	آية الله محمد محمدى اشتهاردي
مترجم	:	مير اشرف العالم
ويرايش	:	محمد سميع الحق
ناشر	:	مؤسسه امام علي (ع)
تيراژ	:	2000
نوبت چاپ	:	اول
تاريخ	:	1427هجرى
چاپ خانه	:	ستاره.

ইসলামী চিন্তাধারার উপর এক'শ একটি মুনাযিরা

মূল	ঃ	মুহাম্মদ মুহাম্মদী ইশতিহারদী।
অনুবাদ	ঃ	মীর আশরাফ-উল-আলম।
সম্পাদনা	ঃ	মোঃ সামিউল হক।
প্রকাশনায়	ঃ	ইমাম আলী (আঃ) ফাউন্ডেশন, কোম-ইরান।
প্রকাশকাল	ঃ	১৪২৬ হিঃ।
কপি	ঃ	২০০০।
মুদ্রণে	ঃ	সিতারা প্রেস, কোম-ইরান।

بسم الله الرحمن الرحيم

বই প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

Imam Ali (a.s) Foundation.
Qom- I.R.Iran.
P, Box : 37185/737.
Fax : 009802517743199.
Tel: 009802517743996.
http://www.alimamali.com

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের প্রতি অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি মানুষকে বিবেক দানের মাধ্যমে অন্যান্য পশু থেকে আলাদা করেছেন। বিবেক হচ্ছে এমন এক ঐশী সম্পদ যার গুরুত্ব পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর মানুষ এই বিবেকের মাধ্যমেই সত্য অনুসন্ধান করতে পেরেছে এবং অসত্য বা ভুল পথকে নির্দিষ্ট করতে।

প্রকৃতপক্ষে কাল কেয়ামতের দিনেও এই বিবেক দিয়েই হিসাব-নিকাশ করা হবে। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন ভাল থেকে মন্দ আর নেকি থেকে ত্রুটিকে আলাদা করার জন্যেই মানুষের মাঝে তা দিয়েছেন। আর এই বিবেকই হচ্ছে সে দিনের ঐ সমস্ত কিছুর ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, দ্বীন ইসলাম অন্যান্য দ্বীনের বিপরীতে পরিপূর্ণ একটি দ্বীন ও ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তা অন্যান্য দ্বীনের মতই দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণেই মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে একটাই আর তা হল, হাদীসে সাকালাইনের প্রতি দৃষ্টি না দেয়া। যে হাদীসটি অতি প্রসিদ্ধ ও মুতাওয়াতির সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। তাই যে কেউ এই হাদীসটির মাধ্যমে সত্য পথের ঠিকানা খুজবে, আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করবেন। আর এর বিপরীতে যে কেউ এই হাদীসটির সাথে বিরোধিতা করবে বা ইজতিহাদ করবে অথবা নফ্সকে তার বিপরীতে স্থান দিবে তারা গোমরাহ্ হয়ে যাবে।

যে বইটি বর্তমানে আপনাদের হাতে আছে তা একজন তাকওয়া সম্পন্ন বিশিষ্ট লেখকের সুদীর্ঘ কষ্টের ফসল। যা তিনি বিবেক সম্মত দলিল ও যুক্তি দিয়ে লিখেছেন। এই বইটি ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যের পথ খুজে পাওয়ার অধিকার আপনাদের রয়েছে। তবে এই বইতে যে সকল দলিল ব্যবহার করা হয়েছে তা অতি উচ্চমানের এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি এই বইতে উল্লেখিত প্রতিটি দলিলই হচ্ছে বিবেক সম্মত এবং যা কিছু তার সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে তাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনেরও সহানুভূতি থাকে।

ইমাম আলী (আঃ) ফাউণ্ডেশন এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে বিশেষভাবে গর্বিত। কেননা এই ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও দায়িত্বই হচ্ছে এ ধরনের কাজ করা যা মানুষকে হেদায়েতের ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। সাথে সাথে যারা এই বইটি প্রকাশে সাহায্য করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে মঙ্গল কামনা করছি।

و قل اعملوا فيسرى الله عملكم و رسوله

ভূমিকা

ইসলামে মুনাযিরা (তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা-পর্যালোচনা করা) এবং এর উদ্দেশ্যসমূহকে অগ্রগামীতায় পৌছাতে তার ভূমিকা ও বিষয়ের উম্মুক্ততা, সত্যের উদঘাটন এবং প্রকৃত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন চিন্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটেছে এবং উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে পৌছানোর উপযুক্ত সময়। যদি ধরেও নেই, শুধুমাত্র গোঁড়ামী ও আক্রোশের কারণে তা গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও অন্ততঃপক্ষে তার মাধ্যমে চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণ অপরিহার্য করে দেয়া যাবে।

কেননা এটা পরিস্কার যে, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বল্লমের শক্তি দিয়ে কখনই চিন্তা ও বিবেকসমূহের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। আর যদি মনে করি এমনভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাহলে তা হবে অপরিপক্ক ও ভিত্তিহীন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কোরআনে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটিকে মূল হিসাবে চিহ্নিত করে চারটি ক্ষেত্রে নবীকে (সাঃ) বলেছেন ঃ

قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ

ভিন্নমত পোষণকারীদের উদ্দেশ্যে বল! যদি তারা সত্য বলে থাকে তাহলে নিজেদের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আনতে (বাকারা ঃ ১১১ ও অন্যান্য)।

যখন ইসলাম অন্যদেরকে দলিল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তির প্রতি দাওয়াত করে তখন অবশ্যই নিজেকেও দলিল ও যুক্তি নির্ভর হতে হবে।

সূরা নাহ্ল-এর ১২৫ নং আয়াতে নবীকে (সাঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, হে পয়গাম্বর!

اُدْعُ اِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ.

মানুষদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় হিকমত, ভাল উপদেশ ও বির্তক বা যুক্তিযুক্ত বাহাসের মাধ্যমে দাওয়াত কর।

'হিকমত'-এর অর্থ হচ্ছে এমন এক দৃঢ় পদ্ধতি যা আক্বল ও ইল্মের (জ্ঞান) সমন্বয়ে গঠিত। আর 'ভাল উপদেশ'-এর অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপদেশ, যার মধ্যে রয়েছে আবেগ এবং তা পরিশোধিত হতে চাওয়া ব্যক্তির অনুভূতিকে সত্যের প্রতি উজ্জীবিত করে। 'মুজাদিলাহ'-এর অর্থ হচ্ছে বিতর্ক পদ্ধতি, আলোচনাতে সম্মুখ সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা। এমন পদ্ধতি যদি ইন্সাফ ও সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হয়ে থাকে তবে তা অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণকারীদের মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা ঃ কিছু কিছু মানুষ প্রকৃত সত্যকে উপলব্দি করার ক্ষেত্রে অধিক চিন্তাশক্তি

ও গভীর ক্ষমতা সম্পন্ন। এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য উপযুক্ত পথ হচ্ছে আক্বল সম্বলীত যুক্তি-দলিলসমূহ। আবার অনেকের অবস্থান নিম্নে, যার কারণে তাদের চিন্তাশক্তি ও উপলব্দির ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ে। আর সে কারণেই তাদের সম্পূর্ণ জীবনই হচ্ছে গোঁড়ামীযুক্ত, প্রথা ভিত্তিক ও আবেগ প্রবণে ভরা। এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে ভাল উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত করতে হবে।

অনেকে আবার একগুয়ে, জেদী ও ভুল চিন্তাধারার অধিকারী এবং সব ক্ষেত্রেই সব কিছুকে পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজের বাতিল চিন্তা-চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যুক্তি-দলিল ও ভাল উপদেশ তার কাছে কোন মূল্যই রাখে না। এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে অবশ্যই বির্তক করতে হবে, কিন্তু উপযুক্ত বিতর্ক অর্থাৎ এমন বির্তক বা বাহাস যার মধ্যে ইন্সাফ, সুন্দর ধারনা ও প্রকৃত সত্য থাকবে।

সুতরাং মুনাযিরার সময় অবশ্যই যারা মুনাযিরা করবেন তাদের সমমানের ও সমপর্যায়ের হতে হবে। আর সব ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে মুনাযিরায় প্রবেশ করতে হবে।

যেমনভাবে নবী (সাঃ) বিভিন্ন অবস্থায় এই তিন পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন এবং লোকজনকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন।

ইমাম সাদিক (আঃ), যিনি অন্ততঃপক্ষে চার হাজার শিষ্যকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একটি দল বিভিন্ন জ্ঞান ভিত্তিক বিষয়ের উপর মুনাযিরার কৌশলবিদ ছিলেন। যখন ভিন্নমত পোষণকারীরা জ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করার জন্য তাঁর কাছে আসতো, যদি তাঁর সময় না থাকতো সে ক্ষেত্রে তিনি ঐ শিষ্যদেরকে নির্দেশ দিতেন তাদের সাথে বিতর্ক বা বাহাস করার জন্য।

আল্লাহ্ অবিশ্বাসী ও দুনিয়া লোভী মানুষ, যেমন ইবনে আবিল আ'উজা, দাইছানী, ইবনে মুকাফ্ফা' ও ....বারংবার ইমাম সাদিক (আঃ) ও তাঁর শিষ্যদের সাথে বির্তক বা বাহাস করেছে। ইমাম তাদের কথাবার্তাগুলোকে শুনতেন এবং পরবর্তীতে একের পর এক সেগুলোর জবাব দিতেন। এমনভাবে জবাব দিতেন যার কারণে ইবনে আবিল আ'উজা বলে ঃ

ইমাম সাদিক (আঃ) আমাদের যত দলিল আছে তা আনার জন্য বলেছিলেন। আমরা আমাদের দলিলসমূহকে স্বাধীনভাবে বর্ণনা করতাম, আর তিনি তা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এমনভাবে শুনতেন যা আমরা মনে করতাম যে, তাকে হারিয়ে দিয়েছি, কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার পালা আসতো তখন দৃঢ়তার সাথে এক এক করে আমাদের দলিলসমূহকে পর্যালোচনা ও প্রত্যাখ্যান করতেন। এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন যে অন্য যেকোন প্রকার অজুহাত এনে বিতর্ক বা বাহাস করার পথ আমাদের জন্য বন্ধ করে দিতেন।

পবিত্র কোরআনে ইব্রাহীম খালিলের (আঃ) মুনাযিরাসমূহঃ

পবিত্র কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুনযিরাসমূহের কিছু সংখ্যক উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এগুলো উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আক্বীদাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পথের পথিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বরং বিভিন্ন অঙ্গনে প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজের যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য ও দলিলাদীর মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের পক্ষে প্রতিরোধ করতেন।

মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনায় ইব্রাহীম (আঃ) যা পবিত্র কোরআনে এসেছে এভাবে যে, তিনি মূর্তি ঘরের সমস্ত মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেন কিন্তু বড় মূর্তিটিকে না ভেঙ্গে ঐ ভাবেই রেখে দিলেন। যখন নমরুদের বিচারালয়ে তাকে বলা হল ঃ 'কেন মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গেছো?'

তিনি উত্তরে বললেন ঃ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هذا فَاسْئَلُوهُمْ اِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ

বরং বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে, যদি মূর্তিগুলো কথা বলতে পারে তবে তাদের কাছে প্রশ্ন করো (আম্বিয় ঃ ৬২)।

ইব্রাহীম (আঃ) এই যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপুজারীদের আক্বীদা-বিশ্বাসের বিষয়কে যুক্তির মাধ্যম হিসেবে নির্দিষ্ট এবং তাদের মুখের উপর চপেটাঘাত করেন।

মূর্তিপুজারীরা বলে ঃ 'হে ইব্রাহীম! তুমি নিজে খুব ভাল করেই জান যে, মূর্তি কথা বলে না'।

ইব্রাহীম (আঃ) এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ 'সুতরাং কেন এই মূর্তিগুলোকে পূজা করছো, কোন প্রকার কাজ করার ক্ষমতা যাদের মধ্যে নেই এবং যারা তোমাদের কোন উপকার ও অপকার কিছুই করতে পারে না? কেন কেন? ভর্ৎসনা তোমাদের এবং তোমাদের হীন ও নিম্ন পর্যায়ের মা'বুদদের উপর, তোমারা কী চিন্তা কর না?'[১]

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাব যে, নমরুদ (ইব্রাহীমের (আঃ) যুগের জালিম শাসক) ইব্রাহীমকে (আঃ) বলে ঃ 'তোমার খোদা কে?'

তিনি বলেন ঃ 'আমার খোদা এমন কেউ যে, মৃত্যু ও জীবন তাঁর হাতে, আমি এমন খোদাকে সিজদাহ্ করি'।

নমরুদ ভ্রমাত্মক মত প্রকাশের মাধ্যমে প্রবেশ করে বলল ঃ 'হে অজ্ঞ! এ তো আমার হাতে, আমিই তো জীবিত করি আর আমিই তো মেরে ফেলি। তুমি কি দেখনা দোষি ব্যক্তি যার ফাঁসির ঘোষনা হয় তাকে আমার নির্দেশে মুক্ত করে দেয়া হয়। আর

---

[১]। আম্বিয়া ঃ ৬৫।

কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে আমি যদি চাই তবে তাকে ফাঁসি দিতে পারি?।

এই বলেই নমরুদ নির্দেশ দিল একজন ফাঁসির আসামীকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আর একজন আসামীকে (যে ফাঁসির আসামী নয়) ফাঁসি দিতে।

ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের ভণ্ডামির সামনে নিজের দলিলকে এরূপে বর্ণনা করলেন ঃ "শুধুমাত্র জীবন-মৃত্যুই আল্লাহ্‌র হাতে নেই বরং এই পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়। আর এই দৃষ্টিকোণে আমার আল্লাহ্ প্রত্যহ সকালে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদীত এবং সন্ধ্যায় তাকে পশ্চিমাকাশে অস্তমিত করান। যদি তুমি সত্য বলে থাক তবে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদীত করে পূর্বাকাশে অস্তমিত করাও"।

পবিত্র কোরআন বলছে ঃ فبهت الذى كفر و الله لا يهدي القوم الظآلمين -

"নমরুদ এই দলিলের বিপরীতে কোন দলিলই না আনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সে আর কোন কথা বলার শক্তি পেল না, আল্লাহ্ জালিমদেরকে হিদায়ত করবেন না" (বাকারা ঃ ২৬০)।

মুনাফিকদের সাথে ইব্রাহীমের (আঃ) অনেক মুনাযিরাহ্ ও দলিলসমূহের মধ্যে এই দুটি নমুনাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যা পবিত্র কোরআনে এসেছে।

উল্লেখিত নমুনাসমূহ থেকে এ বিষয়টি আমাদের কাছে পরিস্কার যে, সঠিক মুনাযিরার পদ্ধতি শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং ইসলামের শত্রুদের সাংস্কৃতিক যুদ্ধের মুকাবিলায় উপযুক্ত মুনাযিরাহ্ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরী হয়ে থাকা, যাতে করে নিজেদের সাংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে তাদরে বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

পবিত্র কোরআনে সূরা নিসার ৭১ নং আয়াতে আমরা পড়ে থাকি ঃ

يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم -তোমরা যারা ঈমান এনেছো, শত্রুদের মুকাবিলায় তোমাদের প্রস্তুতিকে ধরে রাখ।

এই আয়াতটি ঐ বিষয়েরই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসলমানগণ অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে সকল সময় শত্রুদের মুকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে। আর সকল ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্র। আর অবশ্যই তা অন্যান্য ক্ষেত্রের থেকে অধিক ফলদায়ক। আর এই ক্ষেত্রের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে মুনাযিরাহ্ ও আলোচনা করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শি হওয়া। কেননা এখানে জ্ঞানগত আলোচনাতে আমরা বিশ্বাসী।

ইমাম সাদিক (আঃ) বিরোধীদের সাথে মুনাযিরাহ্ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

خاصموهم و بينوا لهم الهدى الذي انتم عليه و بينوا اهم ضلالتهم و باهلوهم في علي عليه السلام.

"বিরোধীদের সাথে আলোচনা কর এবং হিদায়েতের পথকে (যে হিদায়েতের পথে তোমরা আছ) তা তাদের প্রতি বয়ান কর। আর তাদের গোমরাহীর পথকে তাদের সামনে তুলে ধর। আর সত্য যে আলীর (আঃ) পক্ষে ছিল সে ব্যাপারে তাদের সাথে মুবাহিলা কর"[১]।

এই কারণেই, নবী (সাঃ) ও ইমামগণ (আঃ) এবং শিয়া মাযহাবের বড় বড় আলেম ওলামা সর্বদা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মুনাযিরাহ্ বা আলোচনা করতেন। আর এভাবে অনেককেই হিদায়েতের পথে প্রবেশ করিয়েছেন এবং তাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করিয়ে গোমরাহী থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন[২]।

ইমাম বাকির (আঃ) বলেছেন ঃ

علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذى يلي ابليس و عفاريته يمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن ان يتسلط عليهم ابليس و شيعته النواصب الافمن انتصب كان افضل ممن جاهد الروم و الترك و الخزر الف مرة لانه يدفع عن اديان محبينا و ذلك يدفع عن ابدانهم.

"আমাদের আনুগত্যকারী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনুরূপ সীমান্ত রক্ষীর মত শয়তান ও তার সৈন্যদের মুকাবিলায় প্রথম সারীতে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা আমাদের শিয়াদের মধ্যে যারা দুর্বল এবং শয়তানের হামলার বিপরীতে কোন প্রতিরোধ করতে পারে না তাদের পক্ষে ঐ ধরনের ব্যক্তিবর্গ ঢাল হিসেবে কাজ করে থাকেন। আর তাদরকে শয়তানের আনুগত্য করা হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। এ ধরনের শিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মর্যাদা যারা নিজেদেরকে (দ্বীন রাক্ষার ক্ষেত্রে) প্রতিরক্ষাকারী হিসেবে নির্দিষ্ট করেন তাদের দায়িত্ব ইসলামের শত্রুদের যারা রোম, তুর্কী ও খাযার বা অন্যান্য দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদের থেকেও হাজার হাজার গুন বেশী। কেননা তারা তো শিয়া মাযহাবের বিজ্ঞ আলেম, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী আক্বীদ-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিকে রক্ষা করা। আর তারা দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধু স্বরূপ, যদিও বর্তমানে প্রতিটি দেশের সীমান্ত রক্ষীগণ রয়েছে[৩]।

আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক 'সালতুত' -এর বক্তব্য ঃ

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১০, পৃঃ-৪৫২।

[২]। এ ধরনের মুনাযিরাহ্ সম্পর্কে জানতে 'ইহতিজাজ তাবরাসী' নামক গ্রন্থে এবং বিহারুল আনোয়ারের ৯ ও ১০ নং খণ্ড লক্ষ্য করুন।

[৩]। ইহতিজাজ তাবরাসী, খণ্ড-১, পৃঃ-১৫৫।

শেইখ মুহাম্মদ সালতুত মিশরের আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক ও মুফতী ছিলেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ

و الباحث المستوعب المنصف، سيجد كثيراً فى مذهب الشيعه ما يقوى دليله و يلتئم مع اهداف الشريعة من صلاح الاسرة و المجتمع و يدفعه الى الاخذو الارشاد اليه.

> 'ইনসাফ সহকারে অনুসন্ধানকারীগণের সকল দিক থেকে ইসলামের ব্যাপারে গবেষণা করা বলতে যা বুঝে থাকি, তা আমরা শিয়া মাযহাবের আলেমগণের মধ্যে দেখতে পাই। আর এ কারণেই তাদের প্রদত্ত দলিলসমূহ অনেক মজবুত ও দৃঢ় হয়ে থাকে। যা ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে সমাজ ও পরবর্তী বংশধর সংশোধনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যতা রাখে। আর তা এমনভাবে করে থাকে যা মানুষকে তাদের মাযহাবের প্রতি আকর্ষিত করে থাকে'।

তারপর তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি কয়েকটি উদাহরণ[১] দিয়ে বলেনঃ 'যখন আমার কাছে উক্ত বিষয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তখন আমি শিয়াদের ফতোয়া অনুযায়ী উত্তর দিয়ে থাকি[২]।

আল্ আযহার বিশ্বাবিদ্যালয়ের একজন উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষকের পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করাটা আমাদের মুসলিম ঐক্যের জন্য আশার আলো স্বরূপ। কেননা তিনি শিয়া মাযহাবকে একটি দলিল ভিত্তিক প্রকৃত ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য মাযহাব উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের এই বইয়ের ৮৫ নং মুনাযিরাহ্তে উল্ল্যেখ করেছি।

এই বই সম্পর্কিতঃ

এই বইতে বিভিন্ন ধরনের মুনাযিরার নমুনা যেমন নবীর (সাঃ) ও ইমমাগণের (আঃ) এবং তাদের বড় বড় ছাত্রদের পেশ করা হয়েছে। তাদের মুনাযিরাহ্সমূহ উপযুক্ত দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে মানুষকে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসা অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে আনা। সাথে সাথে আমাদেরকে এটা শিক্ষা দেয় যে, কিভাবে সত্যের পক্ষে ঢাল হিসেবে দাড়াতে হবে। আমাদেরও উচিৎ এ ধরনের মুনাযিরার পদ্ধতিকে আয়ত্ব করা।

---

[১]। যেমন ঃ একই স্থানে তিন তালাকের অবৈধতা এবং এরূপ বলা যে, যদি আমি ঐ বাড়ীটা বিক্রি করে দেই তার অর্থ হচ্ছে তোমাকে তালাক দেয়া হয়ে গেল (যা অবৈধ), ...ইত্যাদি।

[২]। 'আল ইয়াকযাহ্' পত্রিকা, বাগদাদ-৩৫ সাল, সংখ্যা-৯৬, (ফি সাবিলিল ওয়াহিদাতুল ইসলামিয়া) থেকে, পৃঃ-২৭ ও ৩০।

আর তা বিভিন্ন গোমরাহ্ ব্যক্তিকে সঠিক পথে আনতে সাহায্য করবে।

এই বইটিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

প্রথম ভাগ ঃ নবী (সাঃ) ও ইমামগণ (আঃ) এবং তাদের ছাত্রদের বিভিন্ন মুনাযিরার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ইসলামের বড় বড় আলেমগণের মুনাযিরার নমুনাসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে।

আশা করি এই বইটি মুনাযিরার পদ্ধতি সম্পর্কে এবং তা ইসলামের প্রচারের পদ্ধতি জানতে আমাদেরকে সাহায্য করবে। আর প্রকৃত ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

কোম ঃ মুহাম্মদ মুহাম্মদী ইশতিহারদী।

১৩৭১ ফার্সী



প্রথম অধ্যায়ঃ নবী (সাঃ) ও ইমামদের বিভিন্ন মুনাযিরার নমুনা



১- নবীর (সাঃ) সাথে পাঁচ দলের মুনাযিরা

ইসলাম বিরোধী পাঁচটি দল, যার প্রতিটি দলে পাঁচজন করে মোট পচিশজন ছিল। সবাই সম্মিলীত হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, নবীর (সাঃ) সাথে মুনাযিরা বা বাহাস করবে।[১]

উক্ত পাঁচটি দল হচ্ছে যথাক্রমে ঃ ইয়াহুদী, খৃষ্টান, নাস্তিক (খোদা অবিশ্বাসী), দুই উপাস্যে বিশ্বাসী ও মূর্তি পুজারী।

এরা মদীনায় নবীর (সাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর চার পার্শ্বে ঘিরে বসলো। তিনি হাসি মুখে তাদেরকে মুনযিরা বা বাহাস শুরু করার অনুমতি দিলেন।

ইয়াহুদীরা বললঃ

'আমরা বিশ্বাসী যে, "উ'যাইর" নবী[২] আল্লাহ্র সন্তান। এ ব্যাপারে আপনার সাথে বাহাস করতে এসেছি। যদি এই আলোচনায় আমাদের কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং আপনি যদি আমাদের সাথে একমত পোষণ করেন, সে ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণ হবে যে, আমরা আপনার থেকে এগিয়ে রয়েছি। আর যদি আমাদের সাথে একমত পোষণ না করেন তবে উপায়হীন হয়েই আপনার বিরুদ্ধাচরণ করব'।

খৃষ্টানরা বললঃ আমরা বিশ্বাসী যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র সন্তান এবং

---

[১]। এই ঘটনাটি ইমাম সাদিক (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই ঘটনার প্রকৃত প্রবক্তা হচ্ছেন ইমাম আলী (আঃ)। ইহ্তিজাজ -তাবরাসী, খণ্ড- ১, পৃঃ- (১৬-২৪) উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ হয়েছে।

[২]। 'উ'যাইর' বনি ইস্রাঈলের নবীগণের একজন নবী। তিনি হযরত মুসার (আঃ) পরে এসেছেন। বাখতুন নাস্র থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর হামলায় তিনি বন্দী হন এবং বাগদাদের নিকটবর্তী শহর বাবুলে তাকে নির্বাসন দেয়া হয়। তিনি হুকামানসি বাদশাহ্দের শাসনামলে প্রায় একশত বছর বাবুলে বনি ইসরাঈলদেরকে সত্যের পথে দাওয়াত ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি খৃষ্টিয় সনের পূর্বে ৪৫৮ সালে বনি ইসরাঈলের একটি দলের সাথে উরশালিম সফর করেন এবং ওখানে তৌওরাত কিতাব ও তার নির্দেশসমূহকে তাদের মধ্যে - যা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং বনি ইসরাঈল তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিল- তিনি পূণরায় তা জীবিত ও সংশোধন করেন। খৃষ্টিয় সনের পূর্বে ৪৩০ সালে তিনি এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন। যেহেতু ইয়াহুদীরা তাকে খুব বেশী ভালবাসতো তাই তিনি ইন্তেকাল করার পরে তার ব্যাপারে অনেক কথাই বলতো এবং শেষ পর্যায়ে তাকে আল্লাহ্র ছেলে বলতে শুরু করে, যদিও বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গির কোন সমর্থক নেই বা বিলিন হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তার সাথে একাকার হয়ে গেছেন। আপনার কাছে এসেছি এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। যদি আমাদের কথা মেনে নেন এবং আমাদের আক্বীদার সাথে একমত পোষণ করেন তবে এই আক্বীদার ক্ষেত্রে আমরা আপনার থেকে অগ্রগামী। আর আমাদের সাথে আপনি একমত পোষণ না করলে আমরা অবশ্যই আপনার সাথে বিরোধীতা করব।

নাস্তিকরা (খোদা অবিশ্বাসী) বলল ঃ

'আমরা বিশ্বাসী যে, পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বা বিষয়ের কোন সূচনা বা শেষ নেই। আর পৃথিবী হচ্ছে প্রাচীন এবং সব সময় থাকবে। এ ব্যাপারে বাহাস করার জন্যই এখানে এসেছি। যদি আমাদের সাথে এক মত হন তাহলে এটা স্পষ্ট যে, আমরা আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ। নতুবা আমরা আপনার বিরোধীতা করব'।

দুই উপাস্যে বিশ্বাসীরা সামনে এসে বলল ঃ

'আমরা বিশ্বাস করি যে, এই পৃথিবীর দুটি পরিচালক বা সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। একজন নূরকে সৃষ্টি করেছেন আর অপরজন অন্ধকারকে। এ বিষয়ে মুনাযিরা করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। যদি এই আলোচনাতে আমরা এবং আপনি একই বিশ্বাসে উপণিত হতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে জয় বা সম্মান আমাদেরই, আর যদি এর বিপরীত হয় তবে সেক্ষেত্রে আমরা আপনার সাথে বিরোধীতা করতে বাধ্য হবো'।

মূর্তি পুজারীরা এগিয়ে এসে বলল ঃ

'আমরা বিশ্বাসী যে, আমাদের হাতে তৈরী কৃত মূর্তিগুলো আমাদের প্রভু। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এখানে এসেছি। যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যায় তবে সেক্ষেত্রে আমরাই শ্রেষ্ট। আর যদি তা না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আপনার সাথে বিরোধীতা ও শত্রুতা করতে বাধ্য হবো।

তাদের প্রতি নবীর (সাঃ) উত্তর ঃ

নবী (সাঃ) প্রথমে সকলের জন্য সাধারণভাবে কিছু কথা বললেন ঃ "তোমরা তোমাদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে বয়ান করেছো এখন আমার পালা যে, আমি আমার আক্বীদা-বিশ্বাসকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো"। 'আমি এমন এক খোদায় বিশ্বাসী যিনি হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় এবং যার কোন শরিক নেই। আর তিনি ব্যতীত অন্য যে কোন উপাস্যে অবিশ্বাসী। আমি এমন এক পয়গাম্বর যে, খোদা আমাকে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর জন্যেই পয়গাম্বরীর দায়িত্ব দান করছেন। আমি তাঁর রহমতের সুখবর দানকারী এবং তাঁর আযাবের ভয় প্রদর্শনকারী। পৃথিবীর সকল কিছুর জন্যেই আমি হচ্ছি হুজ্জাত। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে বিরোধীতাকারীদের বিরোধীতা এবং শত্রুতাকারীদের শত্রুতা থেকে রক্ষা করবেন'।

তারপর নবী (সাঃ) তাদের সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে আসতে বললেন। যাতে করে

তারা আলাদা আলাদাভাবে মুনাযিরা করতে পারে। প্রথম যে দলটি মুনাযিরা করতে আসলো তারা ছিল ইয়াহুদী।

নবী (সাঃ) এবং তাদের মধ্যে যে মুনাযিরাটি সংঘটিত হয়েছিল তা নিম্নরূপঃ

এক ঃ ইয়াহুদী দলের সাথে মুনাযিরা ঃ

নবী (সাঃ) ঃ তোমরা কি এটাই চাও যে, আমি কোন দলিল ছাড়াই তোমাদের কথা গ্রহণ করি?

তারা ঃ না।

নবী (সাঃ) ঃ উ'যাইর যে আল্লাহ্র ছেলে সে ব্যাপারে তোমাদের দলিল কী?

তারা ঃ কিতাবে তৌওরাত মূলতঃ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর কারো পক্ষেই তা পূর্বের রূপে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা ছিল না। উ'যাইর পূণরায় তা তার পূর্বের রূপে ফিরিয়ে এনেছিল। এ কারণেই আমারা বলে থাকি যে, সে আল্লাহ্র ছেলে।

নবী (সাঃ) ঃ যদি এই দলিলটি, উ'যাইরের আল্লাহ্র ছেলে হওয়ার দলিল হয়ে থাকে, তবে হযরত মুসা যিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে তৌওরাত এনেছিলেন এবং অনেক মু'জিযাও দেখিয়েছেন যা তোমরাও বিশ্বাস কর, তবে তার জন্য এটা উত্তম নয় কি যে, সে আল্লাহ্র ছেলে অথবা তার থেকেও বড় কিছুতে ভূষিত হবে। তাহলে তোমরা মুসার ব্যাপারে যার মর্যাদা আরো উচ্চে ছিল কেন এরূপ বল না?

আর যদি তোমাদের বিশ্বাস এটা হয়ে থাকে যে, সে অন্যান্য পিতা পুত্রের মতই বিয়ে ও সহবাসের মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করেছে, তাহলে তোমরা আল্লাহ্কে পৃথিবীর একটি জীবিত প্রাণীর সাথে তুলনা এবং দৈহিক অবয়বে ও পৃথিবীর সীমাবদ্ধতায় আটকে দিলে। আর এই কথার অর্থ হল তোমরা ভেবে নিয়েছ যে, আল্লাহ্কে অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে এবং তিনি অন্য সৃষ্টিকর্তার সাহায্য কামনা করেন।

তারা ঃ উ'যাইর যে আল্লাহ্র ছেলে এবং তার জন্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঐরূপ নয়, যেভাবে আপনি বলছেন। বরং আমাদের দৃষ্টি হচ্ছে ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের ক্ষেত্রে। যে রূপে আমাদের অনেক শিক্ষকই তাদের ভাল ছাত্রদেরকে অন্যদের থেকে উপরে স্থান দানের ক্ষেত্রে বলে থাকেন "হে আমার সন্তান" অথবা "সে আমার সন্তান"। এটা তো পরিস্কার যে, শিক্ষকের এই সন্তার বলার অর্থ এ নয় যে, ঐ ছেলের মায়ের সাথে মিনলের মাধ্যমে তার জন্ম হয়েছে। এ ছেলে তো অন্যের বা ঐ শিক্ষকের সাথে কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখে না। আর এরূপে আল্লাহ্ তা'য়ালা উ'যাইরের ব্যক্তিত্ব ও সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাকে সন্তান বলেছেন। আর আমরা এই দৃষ্টিকোণে তাকে আল্লাহ্র ছেলে বলে থাকি।

নবী (সাঃ) ঃ তোমাদের এ কথার উত্তর হচ্ছে ঐরূপ যা আগেই

বলেছি, আর তা হচ্ছে ঃ যদি এই দলিলের কারণে আমরা উ'যাইরকে আল্লাহ্‌র ছেলে মনে করি তবে এটাই উত্তম যে, যে ব্যক্তি উ'যাইরের থেকে আরো বেশী মর্যাদা সম্পন্ন তাকে আল্লাহ্‌র ছেলে মনে করবো। যেমন মুসা (আঃ)।

আল্লাহ্ তা'য়ালা কখনো মানুষকে বিভিন্ন দলিলের ভিত্তিতে অথবা তাদের স্বীকারোক্তির কারণে তাদেরকে নিন্দিত বা দণ্ডিত করে থাকেন। দলিলমতে ও তোমাদের স্বীকারোক্তিতে এটাই প্রকাশ পায় যে, তোমরা উ'যাইরের ব্যাপারে যা বলছো হযরত মুসার (আঃ) ব্যাপারে তার থেকেও বেশি বলে থাকো। যেমন উদাহরণ দিয়েছো যে, কোন একজন প্রবীণ ব্যক্তি অথবা শিক্ষক তার উত্তম ছাত্রকে কোন রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াই শুধুমাত্র সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের জন্য বলে থাকেন ঃ

'হে পুত্র' অথবা 'সে আমার সন্তান' এই দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত ছাত্র তার শিক্ষকের আরেকটি প্রিয় ছাত্রের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বললে 'সে আমার ভাই' এবং তার শিক্ষকের ক্ষেত্রে বললে 'তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক' অথবা 'তিনি আমার পিতা বা পিতৃস্থানীয়'

এ সকল উক্তিসমূহ সম্মান ও মর্যাদাদানের জন্য। যে ব্যক্তি অতি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তার জন্য বড় বড় সম্মানিয় উক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই মনে কর যে বলা উচিৎ ঃ মুসা আল্লাহ্‌র ভাই অথবা শিক্ষক অথবা মাওলা অথবা তাঁর পিতা, কেননা মুসার সম্মান ও মর্যাদা উ'যাইরের থেকেও অনেক উপরে ছিল।

এখন তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবো, সত্যিই কি তোমরা বৈধ মনে কর যে; মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র ভাই অথবা পিতা অথবা চাচা অথবা শিক্ষক অথবা মাওলা অথবা তাঁর পরিচালক হোক। আর আল্লাহ্ মুসাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাকে বলবেন ঃ 'হে পিতা, হে শিক্ষক, হে চাচা, হে পরিচালক,............?

ইয়াহুদীরা উত্তর না দিতে পেরে চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর তারা বলল "এ ব্যাপারে আমাদেরকে গবেষণা ও চিন্তা করার অনুমতি দেন!"

নবী (সাঃ) ঃ অবশ্যই, যদি তোমরা পবিত্র অন্তরে ইনসাফের সাথে চিন্তা কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্যের প্রতি হিদায়েত করবেন।

দুই ঃ খৃষ্টান দলের সাথে মুনাযিরা ঃ

খৃষ্টান দলের পালা পৌছালো, নবী (সাঃ) তাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা বলে থাক আল্লাহ্ তা'য়ালা (আদি ও অনন্ত), তাঁর ছেলে হযরত ঈসার সাথে একাকার হয়ে গেছেন। তোমাদের এ ধরনের কথার অর্থ কী ?

তোমাদের এসব কথার অর্থ কী এটাই যে, আল্লাহ্ আদি ও চিরন্তণ সত্তা ছিলেন, অবতরণ করেছেন এবং একটি বর্তমান (নতুন) সত্তায় পরিণত হয়েছেন বা বর্তমান

(নতুন) সত্তার (ঈসা) সাথে একাকার হয়ে গেছেন অথবা এর উল্টো যে, ঈসা হচ্ছে নতুন সত্তা এবং সীমাবদ্ধ, সে নিজের উন্নতি ঘটিয়ে (অদি ও চিরন্তণ) আল্লাহ্র সাথে একাকার হয়ে গেছে। অথবা তোমাদের একাকার হয়ে যাওয়া কথার অর্থ কি ঈসার (আঃ) মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে ?!

যদি তোমরা প্রথমটাকে বিশ্বাস করে থাক অর্থাৎ অদি ও চিরন্তণ সত্তার পরিবর্তন হয়ে নতুন সত্তা হয়েছে, তবে জেনে রাখ এটা অসম্ভব। কেননা আক্বল বলে এটা অসম্ভব যে, এক চিরন্তন ও অসীম সত্তা, নতুনত্বে ও সীমাবদ্ধতায় পরিবর্তীত হতে পারে।

যদি দ্বিতীয়টার ব্যাপারে বল, তাহলে বলবো ওটাও অসম্ভব। কেননা আক্বলের দৃষ্টিতে কোন সীমাবদ্ধ ও নতুন সত্তা চিরন্তণতায় ও অসীমতায় পরিবর্তীত হতে পারে না।

আর যদি তৃতীয়টার দিকে ইশারা কর অর্থাৎ ঈসা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মত নতুন সত্তা। কিন্তু এমন এক বান্দা যে, আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদ সম্পন্ন, তবে এক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে ঈসার একাকার বা সমান সমান হওয়ার ব্যাপারটি কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তারা ঃ যেহেতু আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈসাকে (আঃ) বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করেছেন এবং গায়েবী বিষয় ও মু'জিযাকে তার আয়ত্বে দিয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ্ তাকে ছেলের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আর

এই ছেলে হওয়াটা শুধুমাত্র তার মর্যাদা ও সম্মান স্বরূপ!

নবী (সাঃ) ঃ 'অনুরূপ বিষয়ে ইয়াহুদীদের সাথে আলোচনা করেছি এবং তোমরা তা শুনেছো যে, আল্লাহ্ যদি ঈসাকে যোগ্যতার কারণে

নিজের ছেলে বলে থাকেন তাহলে যার যোগ্যতা ঈসার থেকেও অনেক বেশী অথবা সমমানের অবশ্যই তাকে নিজের পিতা, শিক্ষক, চাচা বলবেন.........'।

তারা এই কথার বিপরীতে কোন উত্তর দিতে না পেরে, কোন উছিলায় উঠে যাওয়ার চেষ্টা করলো। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে কেউ বলল ঃ

আপনারা কি ইব্রাহীমকে ' (خليل الله) আল্লাহ্র বন্ধু' মনে করেন না?

নবী (সাঃ) ঃ হ্যাঁ, তাকে আমরা আল্লাহ্র বন্ধু মনে করি।

তারা ঃ আমরা এই দলিলের উপর ভিত্তি করে ঈসাকে 'আল্লাহ্র ছেলে' মনে করি। কেন আমাদের এ বিশ্বাসকে ভুল বলছেন?

নবী (সাঃ) ঃ এই দু'টি পদবীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। খালিল শব্দটি অভিধানে 'খাল্লাহ্', অনুরূপ 'যার্‌রাহ্'-এর গঠনে। অর্থাৎ দারিদ্র বা অভাবি। বলা যেতে পারে যে, হযরত ইব্রাহীম অধিক পরিমানে আল্লাহ্ তা'য়ার প্রতি জ্ঞান রাখতো এবং অন্যের থেকে

নিজেকে অমুখাপেক্ষী ও শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি দারিদ্র ও মুখাপেক্ষী মনে করতো। তাই আল্লাহ্ তাকে তাঁর 'খালিল' ভেবেছেন। তোমরা শুধুমাত্র ইব্রাহীমের আগুনে ফেলে দেয়ার ঘটনাটি স্মরণ কর।

যখন (নমরুদের নির্দেশে) তাকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের ধনুকে বেধে আগুনের কুণ্ডলির দিকে নিক্ষেপ করা হল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিব্রাঈল তার কাছে আসলো এবং শুণ্যেই তার সাথে দেখা করে তাকে বলল ঃ আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছি তোমাকে সাহায্য করার জন্য। তখন ইব্রাহীম তাকে বলল ঃ আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সাহায্য চাই না, তাঁর সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট। কেননা তিনিই হচ্ছেন উত্তম রক্ষক। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই কারণেই তাকে তাঁর 'খালিল' নামে ভূষিত করেছেন। খালিল অর্থাৎ দারিদ্র বা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী এবং অন্য সকল সৃষ্টির থেকে

অমুখাপেক্ষী।

আর যদি 'খালিল'-কে আভিধানিক 'খিল্লাহ্'-এর অনুরূপ 'পিল্লাহ্'-এর রূপে ধরি তাহলে খালালের মধ্যে গবেষণা অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যকার গোপন ও প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে গবেষণা বোঝাবে। এ দিক দিয়ে ইব্রাহীম খালিল, সৃষ্টির মধ্যকার গোপন ও প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

আর এরূপ অর্থ করাটা সৃষ্টিত বস্তুকে শ্রষ্টারূপে অনুমান করা হয় না। এ কারণে ইব্রহীম যদি আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষি না হত বা সৃষ্টির মধ্যকার গোপন ও প্রকৃত রহস্য সর্ম্পকে অবগত না থাকতো তাহলে খালিলও হতো না। কিন্তু জন্ম ও প্রজননের বিষয়ের ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সম্পর্ক বা বন্ধন হচ্ছে অস্তিত্বগত সত্তার কারণে। এমনকি পিতা যদি পুত্রকে নিজের কাছ থেকে বিতাড়িতও করে দেয় এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে তথাপিও সে তার পিতা বা পুত্র এবং তারা উভয়ই পিতা পুত্রের বন্ধনে আবদ্ধ।

এখনও যদি তোমাদের দলিল এটাই হয়ে থাকে যে, যেহেতু ইব্রাহীম আল্লাহ্‌র খালিল, সেহেতু ঈসা আল্লাহ্‌র ছেলে। তাহলে এটাও বল যে, মুসাও আল্লাহ্‌র ছেলে। বিষয়টি হচ্ছে, যেভাবে ইয়াহুদীদেরকে বলেছি, যদি মর্যাদার কারণে কারো এরূপ স্থান দিতে হয় তবে বল মুসা আল্লাহ্‌র পিতা, শিক্ষক, চাচা, পরিচালক বা মাওলা.......... কিন্তু কোন সময় তোমরা তা বলছো না।

কোন একজন খৃষ্টান বলল ঃ ইঞ্জিল কিতাবে (যা ঈসার (আঃ) উপর নাজিল হয়েছিল) হযরত ঈসার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে ঃ "আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতার দিকে প্রত্যাবর্তীত হবো"। সুতরাং এই বাক্যের মাধ্যমে ঈসা নিজেই নিজেকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছে!

নবী (সাঃ) ঃ যদি তুমি ইঞ্জিলকে গ্রহণ করে থাকো তবে ঈসার এই কথা অনুযায়ী

নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করছো। কেননা ঈসা বলেছে যে, "আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতার দিকে প্রত্যাবর্তীত হবো"। এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে আমিও আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তোমরাও।

এই বাক্যের মাধ্যমে তোমার আগের কথাটি (যেহেতু ঈসা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তাই আল্লাহ্‌ তাকে তাঁর নিজের পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন) প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা হযরত ঈসা এই কথার মাধ্যমে শুধুমাত্র নিজেকে নয় বরং সকলকেই আল্লাহ্‌র পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছে।

সুতরাং ঈসার (আঃ) পুত্র হওয়ার মানদণ্ড এটা নয় যে, সে বিশেষ

মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা যেহেতু অন্যান্য মানুষ এই বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় তারপরও ঈসা (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব, যে কোন মু'মিন এবং আল্লাহ্‌ উপাসককেই বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌র পুত্র। তোমরা ঈসার বক্তব্যকে বর্ণনা করছো কিন্তু তার বিপরীতে কথা বলছো।

কেন তোমরা এই 'পিতা ও পুত্রের' পরিভাষাকে যা ঈসার (আঃ) বক্তব্যে এসেছে, তা সাধারণ অর্থের বিপরীতে ব্যাখ্যা করছো? হয়তো ঈসার (আঃ) এ কথার উদ্দেশ্য "আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতার প্রতি প্রত্যার্বতন করবো" এটা ঐ সাধারণ অর্থেরই বহিঃপ্রকাশ করে যে, "আমি হযরত আদম ও নুহ্‌ যারা আমাদের সকলের পিতা তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবো এবং আল্লাহ্‌ আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবেন"। আদম ও নুহ্‌ আমাদের সকলের পিতা, সুতরাং কেন এই পরিস্কার ও প্রকৃত অর্থ থেকে দুরে সরে গিয়ে তার জন্য অন্য একটি অর্থ করবো?!

নবীর (সাঃ) দলিলের কাছে খৃষ্টানরা এমনভাবে লজ্জিত হল যে, তারা বলল ঃ আমরা আজ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখিনি যে, আমাদের সাথে এভাবে দক্ষতাসহকারে বিতর্ক করতে যা আপনি আমাদের সাথে করেছেন। আমাদেরকে এ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় দিন।

তিন ঃ নাস্তিকদের (খোদা অবিশ্বাসী) সাথে মুনাযিরা ঃ

মাদ্দিউন (দুনিয়া বিশ্বাসী) বা নাস্তিকদের পালা আসলো, নবী (সাঃ) তাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা বিশ্বাসী যে, বিষয় বা ঘটনাসমূহের কোন শুরু নেই এবং তা সবসময় ছিল, আছে ও থাকবে?

তারা ঃ হ্যাঁ, এটা আমাদের বিশ্বাস। কেননা আমরা বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রে কোন নতুনত্ব ও শুরু দেখিনি এবং ধ্বংস বা শেষের ব্যাপারেও আমাদের কাছে কোন কিছু পরিলক্ষীত হয়নি। এ কারণেই বলে

থাকি যে, পৃথিবীর বিষয় বা ঘটনাসমূহ সবসময় ছিল ও থাকবে।

নবী (সাঃ) ঃ এখন আমি তোমাদেরকে একটি প্রশ্ন করছি যে, তোমরা কি পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পন্ন কোনকিছুর অতীত ও চিরন্তণতাকে দেখছো?

যদি বল দেখেছি, তাহলে অবশ্যই দেহের এই আক্বল, চিন্তা ও শক্তি আদিকাল থেকে ও চিরন্তণ। আর যার কারণেই পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পন্ন বিষয়ের অনন্ত ও চিরন্ত নতাকে দেখছো। এরূপ দাবি করা অনুভূতি ও দৃষ্টমান প্রকৃত বিষয়ের বিপরীত এবং পৃথিবীর সকল আক্বল সম্পন্নরা তোমাদের এই দাবিকে সঠিক নয় বলে স্বীকৃতি দিবে।

তারা ঃ আমরা তেমন দাবি করছি না যে, পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পন্নদের অতীত ও চিরন্তনতাকে দেখেছি।

নবী (সাঃ) ঃ সুতরাং তোমরা একপক্ষ বিচার করো না, কেননা তোমরা তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী না পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পন্নদের অনন্ত ও চিরন্তনতাকে দেখছো, আর না তাদের ধ্বংস ও স্থায়ীত্বকে। তাহলে কিভাবে একপক্ষ বিচার করে তার ব্যাপারে কথা বলছো? যেহেতু পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পন্নদের নতুনত্ব ও ধ্বংস কোনটাই দেখনি তাই তারা অতীত ও চিরন্তন?

নবী (সাঃ) (এরপর তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্য তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন করলেন, যা প্রমাণ করে যে পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পন্ন যা কিছু সবই নতুন) বললেন ঃ তোমরা কি রাত ও দিনের পালাবদলের বিষয়টি লক্ষ্য করেছো যা পর্যায়ক্রমিকভাবে আসা-যাওয়া করে?

তারা ঃ হ্যাঁ।

নবী (সাঃ) ঃ তোমরা কি রাত ও দিনের ব্যাপারে এমন মনে কর যে, তা সব সময় ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে?

তারা ঃ হ্যাঁ।

নবী (সাঃ) ঃ তোমাদের দৃষ্টিতে কি এটা সম্ভব যে, রাত ও দিন একই সময়ে একসঙ্গে থাকবে বা তাদের পর্যায়ক্রমিকতা এলো-মেলো হয়ে যাবে?

তারা ঃ না।

নবী (সাঃ) ঃ তাহলে, তা একে অপরের থেকে আলাদা। যখন একটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন আকেরটির পালা শুরু হয়।

তারা ঃ হ্যাঁ, এমনটিই।

নবী (সাঃ) ঃ তোমরা তোমাদের এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নতুনত্বের প্রতি অর্থাৎ যা কিছু রাত ও দিনের পূর্বে সংঘটিত হয়, তা না দেখেই রায় প্রদান করেছো। সতুরাং আল্লাহ্র ক্ষমতার অস্বীকার করো না[১]। তারপর নবী (সাঃ) এরূপে আলোচনা চালিয়ে

---

[১]। রাত ও দিনের একে অপরের থেকে পৃথক হওয়া এবং তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট সময়ের শেষে পরবর্তী সময়ে যা কিছু আসে বা তার থেকে অগ্রবর্তী হয় তা নতুন (হাদেস)।

গেলেন ঃ

"তোমাদের দৃষ্টিতে রাত ও দিনের কোন সূচনা আছে না নেই, নাকি তা চিরন্তন? যদি বল শুরু আছে তাহলে আমরা যা হুদুস বা নতুন বলছি তারই প্রমাণ হল। আর যদি বল যে, কোন শুরু নেই তাহলে তোমাদের এ কথা থেকে এটাই বোঝা যাবে যে, যা কিছুর শেষ আছে তার সূচনার কোন প্রয়োজন নেই।

(যখন রাত ও দিন শেষ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টতা রয়েছে, সে অনুযায়ী বিবেক বা আক্বল বলে সূচনা বা শুরুর ক্ষেত্রেও তাহলে নির্দিষ্টতা আছে। এ উক্তির দলিল হচ্ছে যেহেতু রাত ও দিন একে অপরের থেকে পৃথক হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর রাতের পরে দিন ও দিনের পরে রাত এভাবে নতুন করে আসে)।

তারপর বললেন ঃ তোমরা বলে থাক যে, পৃথিবী পুরাতন বা কাদীম! তোমরা যা বলছো তা সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করেছো না করোনি?

তারা ঃ হ্যাঁ, আমরা জেনে-শুনেই বলছি।

নবী (সাঃ) ঃ তোমরা কি দেখেছো যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকুল একে অপরের সাথে বন্ধন যুক্ত। আর বেচে থাকার জন্য একে অপরের প্রয়োজন রাখে। অনুরূপ একটি ভবনের মতো দেখতে পাই, যেমন ঃ ঐ ভবনটি যা কিছু দিয়ে তৈরী হয়েছে (সিমেন্ট, বালি, ইট, পাথর, রড.........) একে অপরের সাথে বন্ধন যুক্ত এবং টিকে থাকার জন্যে একে অপরের প্রয়োজন রাখে।

যখন পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এরূপ, তখন কিভাবে বলতে পারি যে, সব কিছুই পুরাতন বা কাদীম বা চিরন্তন। সৃষ্টিকুলের সব কিছুই যেহেতু একে অপরের সাথে বন্ধন যুক্ততার ও সম্পর্কের প্রয়োজন রাখে, যদি সত্য সত্যই তারা পুরাতন বা কাদীম হয়ে থাকে, আর যদি তারা নতুন হয়ে যায় তবে কেমন হবে?

তারা এ প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ হলো এবং নতুন বা হুদুসের অর্থ বর্ণনা করতেও পারলো না। কেননা যা কিছু তারা নতুন বা হুদুসের অর্থের ক্ষেত্রে বলতে চাচ্ছিল তা ঐ যা তাদের চিন্তাধারায় পুরতান বা কাদীমের ক্ষেত্রে ছিল। এ কারণেই দারুণ সংকটাময় অবস্থায় পড়লো এবং বলল আমাদেরকে কিছু সময় দিন যাতে করে এই বিষয়ের প্রতি ভাবতে পারি[১]।

---

[১]। নবী (সাঃ) দুই উপাস্যে বিশ্বাসীদের সাথে মুনাযিরার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে, আস্তে আস্তে চালার পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদেরকে চারটি দলিলের ভিত্তিত্বে পর্যবর্শিত করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

চার ঃ দুই উপাস্যে বিশ্বাসীদের সাথে মুনাযিরা ঃ

এ পর্যায়ে দুই উপাস্যে বিশ্বাসীদের পালা এসে পৌছালো। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, এই পৃথিবীর দু'টি সূচনা এবং দু'টি পরিচালক রয়েছেন। যার একটি হচ্ছে "নূর" আর অপরটি হচ্ছে "অন্ধকার"।

নবী (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা দলিলের উপর ভিত্তি করে এমন বিশ্বাস স্থাপন করেছো?

তারা ঃ আমরা দেখছি যে, পৃথিবী দুই অংশের সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে যার একটি হচ্ছে ভাল বা উত্তম আর অপরটি হচ্ছে মন্দ বা খারাপ। আর এ দুটি একে অপরের বিপরীত। এ কারণেই আমরা বিশ্বাসী যে, এ দুটির স্রষ্টাও আলাদা আলাদা। কেননা একই স্রষ্টা কখনই দুটি এমন কাজ যা একটি আকেটির বিপরীত তা আঞ্জাম দেন না, যেমন ঃ এটা অসম্ভব যে, বরফ তাপের সৃষ্টি করতে পারবে তদ্রূপ এটাও অসম্ভব যে, আগুন ঠাণ্ডার সৃষ্টি করতে পারবে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রমাণ করেছি যে, এ পৃথিবীর দুটি পুরাতন স্রষ্টা রয়েছে যার একজন হচ্ছেন 'নূর' (ভাল বা উত্তমের স্রষ্টা) আর অপরজন হচ্ছেন 'অন্ধকার' (মন্দ বা খারাপের স্রষ্টা)।

নবী (সাঃ) ঃ তোমরা কী বিশ্বাস কর যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের রং যেমনঃ কাল, সাদা, লাল, হলুদ, সবুজ ও নিল রয়েছে যা একে অপরের বিপরীত, কেননা ঐগুলোর মধ্যে যে কোন দুটি রংয়ের কখনই একই স্থানে মিলন হতে পারে না। যেমনভাবে গরম আর ঠাণ্ডারও একই স্থানে মিলন হওয়া অসম্ভব।?

তারা ঃ হ্যাঁ, আমরা তা বিশ্বাস করি।

নবী (সাঃ) ঃ তাহলে কেন তোমরা প্রতিটি রংয়ের জন্য আলাদা আলাদা খোদায় বিশ্বাসী নও? তোমাদের চিন্তামতে প্রতিটি বিপরীতের জন্য আলাদা আলাদা সৃষ্টিকর্তা নেই? সুতরাং কেন যতগুলো বিপরীত বিষয় আছে তার জন্য বলছো না যে ঐ পরিমান সৃষ্টিকর্তা রয়েছে?

তারা এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কোন উত্তর দিতে না পেরে চিন্তায় মগ্ন হয়ে

১- প্রথমত (খুজে না পাওয়ার অর্থ, কোন দলিল না থাকাই নয়) হুদুস বা নতুনত্ব না দেখতে পাওয়ার দলিলই আদি বা অনন্ত নয়, যেমনভাবে ধ্বংশ হওয়াকে দেখতে না পাওয়ার দলিলই চিরন্তন বা চিরন্তনা নয়।

২- এটা হতে পারে যে, আমরা বর্তমান হুদুস বা নতুনত্বের মাধ্যমে এক শ্রেণীর বর্তমান

৩- হুদুস বা নতুনত্বেকে সিমাবদ্ধতায় রায় দেয়া- যদি তার সমষ্টি অধিক হয়েও থাকে।

৪- পৃথিবীর প্রতিটি জীবেরই বা অস্তিত্বেরই একে অপরের সাথে সম্পর্ক ও মিলনই হচ্ছে তাদের নতুনত্বের প্রমাণ, কেননা এটা অসম্ভব যে প্রাচীন বস্তুর কোন কিছুর প্রয়োজন হতে পারে।

পড়লো।

নবী (সাঃ) আরো বললেন ঃ তোমাদের দৃষ্টিতে এটা কেমন যে, আলো ও অন্ধকার একে অপরের হাতে হাত দিয়ে এই পৃথিবীকে পরিচালনা করছে। যা কিনা আলোর প্রকৃতি হচ্ছে উর্ধ্বগমন বা উর্ধ্বে আহোরণ করা এবং অন্ধকারের প্রকৃতি হচ্ছে অধঃপতন বা নিম্নগমন। যদি এ দু'য়ের মধ্যে একটি উত্তরে আর অপরটি দক্ষিণে যায়, তোমাদের দৃষ্টিতে কি এ দু'টিকে যারা শুরুর সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে এক স্থানে একত্রিত করা সম্ভব?

তারা ঃ না, তা কখনই সম্ভব নয়।

নবী (সাঃ) ঃ সুতরাং আলো ও অন্ধকার যা একে অপরের বিপরীত কিভাবে একে অপরের সাথে মিলিত হল বা এক সঙ্গে এই পৃথিবীর পরিচালনার চিন্তা করলো? এরূপ কিছু কি সম্ভব যে, এই পৃথিবী দুটি বিপরীত উপাদানের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে? অবশ্যই তেমন নয়। সুতরাং এ দুটি হচ্ছে মাখলুক ও হাদেস (নতুন), যা চিরন্তণ ও ক্ষমতাবান আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনার আওতাভূক্ত।

তারা নবীর (সাঃ) কথার কোন উত্তর না দিতে পেরে মাথা নিচু করে বলল ঃ এ ব্যাপারে ভেবে দেখার জন্য আমাদেরকে সময় দিন।

পাঁচ ঃ মূর্তি পুজারীদের সাথে মুনাযিরা ঃ

মূর্তি পুজারীদের পালা এসে পৌছালো, নবী (সাঃ) তাদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'তোমরা কেন খোদাকে উপসনা না করে এই মূর্তিগুলোকে পুজা কর'?

তারা ঃ আমরা এই মূর্তিগুলোর মাধ্যম দিয়ে খোদার নিকটবর্তী হতে চাই।

নবী (সাঃ) ঃ এই মূর্তিগুলো কি শুনতে পায়? এই মূর্তিগুলো কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে এবং তাঁর ইবাদতে ও উপাসনায় মত্ত থাকে? যার ফলে তোমরা এগুলোর পুজা করার মাধ্যমে খোদার নিকটবর্তী হতে চাও?

তারা ঃ মূর্তিগুলো শুনতেও পায় না এবং খোদার নির্দেশ মান্যও করে না বা তাঁর উপাসনাও করে না।

নবী (সাঃ) ঃ তোমরা কি তোমাদের নিজের হাতে এগুলোকে তৈরী করেছো?

তারা ঃ হ্যাঁ, এগুলোকে নিজেদের হাতে তৈরী করেছি।

নবী (সাঃ) ঃ সুতরাং এগুলোর তৈরী কারক হচ্ছো তোমরাই। তাহলে হিসেব অনুযায়ী উত্তম হচ্ছে এটাই যে, এগুলো তোমাদেরকে পুজা করবে। না তোমরা মূর্তিগুলোকে। তোমাদের কল্যান ও পরিণতিসমূহ সম্পর্কে এবং তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের ব্যাপারে যিনি অবগত তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন। তিনি তো তোমাদেরকে এই মূর্তিগুলো পুজা করার নির্দেশ প্রদান করেন নি।

যখন নবীর (সাঃ) আলোচনা এ পর্যন্ত পৌছালো, তখন তাদের নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হল।

তাদের কিছু সংখ্যক বলল ঃ আল্লাহ্‌র অবয়ব মানুষ রূপে এই মূর্তিগুলোর মতই ছিল। পরবর্তীতে তাঁর অবয়ব এই মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর এই মূর্তিগুলোর প্রতি আমাদের গুরুত্বের কারণ হচ্ছে, খোদর ঐ অবয়বকে সম্মান দেয়া।

তাদের অন্য কিছু সংখ্যক বলল ঃ এই মূর্তিগুলোকে পরহিযগার ও খোদার নির্দেশ মান্যকারীদের রূপে তৈরী করা হয়েছে। এদেরকে খোদার সম্মান ও আনুগত্য করার উদ্দেশ্যে পুজা করে থাকি।

তাদের অন্য কিছু সংখ্যক বলল ঃ যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা আদমকে সৃষ্টি করেছিল তখন তাকে সিজদাহ্ করার জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আমাদের (মানুষদের) উচিৎ হচ্ছে আদমকে সিজদাহ্ করা। যেহেতু ঐ জামানায় ছিলাম না বা তাকে সিজদাহ্ করতে পারি নি, তাই বর্তমানে তার অনুরূপ মূর্তি তৈরী করেছি এবং খোদার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তাকে সিজদাহ্ করি। যাতে করে অতীতের আঞ্জাম না দেয়া কাজের পূরণ হয়ে যায়। যেমনভাবে ফেরেশ্‌তারা আদমকে সিজদাহ্ করার মাধ্যমে খোদার নিকটবর্তীতা খুজেছিল।

যেভাবে আপনারা আপনাদের নিজদের হাতে মসজিদের মেহ্‌রাবগুলো তৈরী করেছেন এবং তা কা'বা মনে করে সেখানে সিজদাহ্

করছেন। আর মনে করছেন আল্লাহ্‌কে সিজদাহ্ দিচ্ছেন বা তাঁর সম্মানে এই ইবাদত করছেন। আমরাও তদ্রূপ এই মূর্তিগুলোর সামনে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সম্মান আদায়ের লক্ষ্যে সিজদা করে থাকি।

নবী (সাঃ) এই তিন ধরনের বক্তব্যদানকারী লোকদের দিকে ফিরে বললেনঃ তোমরা সকলেই ভুল পথকে অনুসরণ করছো এবং সত্য ও প্রকৃত বিষয় থেকে দুরে রয়েছো। তারপর তিনি ঐ ধরনের বক্তব্যদানকারী ব্যক্তিদের কথার উত্তর দেন, যা নিম্নরূপঃ

যারা প্রথমে বক্তব্য দিয়েছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ

তোমরা যা বলছো, আল্লাহ্‌র অবয়ব মানুষ রূপে এই মূর্তিগুলোর মতই ছিল, পরবর্তীতে তাঁর অবয়ব এই মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করেছে। সে কারণেই তোমরা এই মূর্তিগুলোকে ঐ অবয়বে তৈরী করেছো এবং তাকে পুজা-অর্চণা করছো। তোমাদের এই বয়ান অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ বর্ণনা করলে এবং তাঁকে সীমিত ও হাদেস (নতুন) মনে করলে। এমনটা কি সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীর কোন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবে আর ঐ বস্তু (যা সীমিত বা সীমাবদ্ধ) আল্লাহ্‌কে তার নিজের গহ্বরে স্থান দিবে? সুতরাং আল্লাহ্ ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কি পার্থক্য থাকলো যা একটি

অবয়বের মধ্যে প্রবেশ করে, যেমন ঃ রং, স্বাদ, গন্ধ, নরম, ঘনত্ব, ভারী ও হালকা। এ সব বিবেচনা করে কিভাবে বলছো যে, যে অবয়বের মধ্যে প্রবেশ করেছে সে অবয়বটি হচ্ছে হাদেস (নতুন) ও সীমিত বা সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে আল্লাহ্ তার মধ্যে প্রবেশ করেছে তিনি কাদীম (প্রাচীন) ও অসীম। বরং অবশ্যই তার বিপরীত হতে হবে অর্থাৎ স্থানদানকারী হবে কাদীম (প্রাচীন) আর স্থান গ্রহণকারী হবে হাদেস (নতুন)।

এখন এটা কিভাবে সম্ভব, যে আল্লাহ্ সবসময় পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুর আগে থেকেই স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ছিলেন এবং স্থানের আগেই যার অস্তিত্ব বিরাজমান, তাঁর এখন স্থানের প্রয়োজন পড়বে আর নিজেকে এই স্থানে অবস্থান দিবে।

তোমাদের এই দৃষ্টিকোণে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্র প্রবেশের বিষয়ে, আল্লাহ্কে সৃষ্ট বস্তুর বিশেষণে রূপান্তরীত করেছো যা হচ্ছে হাদেস (নতুন) ও সীমিত। এরূপ মনে করার ফলাফল হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ্র

অস্তিত্ব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব। কেননা সমস্ত বস্তুই যা হাদেস (নতুন) ও সীমিত তাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়ে থাকে।

আর যদি তোমরা বিশ্বাস করে থাকো যে, এই প্রবেশ করাটার কারণই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নয়। তাহলে তোমরা এসব বিষয়ে যেমন চলা-ফেরা, নিরব থাকা, বিভিন্ন রং (সাদা, কালো, লাল........) ইত্যাদির কারণকেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বলে মনে করছো না। তারপর বলছো এটা বৈধ যে, আল্লাহ্র অস্তিত্বের উপর যে কোন ধরনের অবস্থা ও পর্যায় চাপিয়ে দেয়া যায়। আর তার ফলাফল হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ্কে সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় সীমাবদ্ধ ও হাদেস (নতুন) হিসাবে বর্ণনা এবং অনুরূপ মাখলুকাতের মতই মনে কর।

যখন বিশাল অবয়বের মধ্যে আল্লাহ্র প্রবেশের আক্বীদা-বিশ্বাস অনর্থক ও ভিত্তিহীন হয়ে গেল, আর মূর্তি পুজারকরা যেহেতু এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল তখন বাস্ত বিক ভাবেই তা ভিত্তিহীন হয়ে যায়।

তারা তখন, নবীর (সাঃ) এরূপ দলিল ভিত্তিক আলোচনার সামনে মাথা নত করে বললঃ আমাদেরকে সময় দিন, যাতে আমরা এ বিষয়ের উপর আরো ভাবতে পারি।

নবী (সাঃ) দ্বিতীয় বক্তব্যদানকারীদের দিকে ফিরে বললেনঃ

তোমরা আমাকে বল দেখি, যখন তোমরা পরহিযগার বান্দাদের মূর্তিগুলোকে পুজা কর এবং তাদের সামনে নামায পড় ও সিজদায় লুটিয়ে পড়, আর এই মূর্তিগুলোর প্রতি সিজদা করার জন্য নিজেদের মুখমণ্ডল মাটির উপর স্থান দাও এবং যত পরিমান বিনয় তোমাদের মধ্যে আছে তার পুরটারই প্রকাশ ঘটাও, তাহলে আল্লাহ্র জন্য আর কি বিনয় তোমাদের মধ্যে বাকি রাখলে। (অর্থাৎ সব থেকে বড় বিনয় হচ্ছে সিজদা, আর তোমরা যে এই মূর্তিগুলোর সামনে সিজদা করছো তাহলে এর থেকে বড় বিনয়

তোমাদের কাছে আর কি থাকলো যা আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করবে)। যদি তোমরা বল, আল্লাহ্‌কেও সিজদা করি। তাহলে তো আল্লাহ্‌র সামনে বিনয় প্রকাশ ও তাঁর বান্দাগণের সামনে বিনয় প্রকাশ করা সমমানের হয়ে গেল। এখন বল এই মূর্তিগুলোর সামনে সিজদা দেয়া বা সম্মান দেখানোই কি আল্লাহ্‌র সামনে সিজদা করা ও সম্মান দেখানোর সমান? উদাহরণ স্বরূপ ঃ

যদি তোমরা এক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করার পর তার চাকরকেও ঐ মানের সম্মান প্রদর্শন কর, তাহলে কি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির সমমানের সম্মান প্রদানের কারণে ঐ বিশিষ্ট বা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অসম্মান করা হয় না?

তারা ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তা হবে।

নবী (সাঃ) ঃ সুতরাং তোমরা এই মূর্তিগুলোর উপাসনা করে (তোমাদের চিন্তামতে এরা আল্লাহ্‌র পরহিযগার বান্দা) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সম্মান ও মর্যাদার প্রতি অবমাননা করলে, এমনটাই নয় কি?

তারা নবীর (সাঃ) যুক্তিসঙ্গত কথার কোন উত্তর না দিতে পেরে বলল ঃ এ বিষয়ে ভেবে দেখার জন্য আমাদেরকে কিছু সময় দিন।

এরপর তৃতীয় বক্তব্যদানকারীদের পালা আসলো, তাদের দিকে নবী (সাঃ) ফিরে বললেন ঃ তোমরা উদাহরণের মাধ্যমে নিজেদেরকে মুসলমানদের সাথে তুলনা করেছো এভাবে যে, মূর্তিগুলোর সম্মুখে সিজদা করা হচ্ছে হযরত আদম ও কা'বার সম্মুখে সিজদা করার অনুরূপ। কিন্তু এ দুটি সম্পূর্ণরূপে একে অপরের সাথে আলাদা এবং তাদের মধ্যে তুলনা করাও সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যাঃ আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর উপাসনা ও আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা। ঠিক যেভাবে তিনি আমাদের থেকে আশা করেন বা যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আমরা ঠিক সেভাবেই তা আঞ্জাম দিব। তাঁর দেয়া নির্দেশের অবমাননা করে (কিয়াস বা তুলনার ভিত্তিতে) নিজেদের জন্য কোন দায়িত্বের সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তা সম্পূর্ণরূপে সীমালংঘন করা হবে। কেননা আমরা সকল বিষয়ের প্রতি জ্ঞাত নই। হয়তো আল্লাহ্ এটা চেয়েছেন আর ওটাকে চান নি এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর নির্দেশের বাইরে কোন কাজ আঞ্জাম দিতে নিষেধ করেছেন।

যেহেতু ইবাদতের সময় তিনি আমাদেরকে কা'বাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমরা তাঁরই নির্দেশের বাস্তবায়ন করি এবং তাঁর নির্দেশের পরিধিকে লঙ্ঘন করি না। তদ্রূপ তিনিই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কা'বার দূরবর্তী স্থানসমূহে ইবাদতের সময় কা'বার প্রতি মুখ করে তা আঞ্জাম দিতে। আমরাও তাঁর

দেয়া নির্দেশই পালন করে থাকি। আর হযরত আদমের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ফেরেশ্তারা আদমকে সিজদা করবে, না তার মূর্তিকে যা আদম থেকে ভিন্ন। সুতরাং আমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তার মূর্তি বা অনুরূপ কোন কিছুকে তার সাথে তুলনা করবো। কেননা হয়তো তোমরা জান না যে, তোমারা যা করছো তাতে আল্লাহ্ রাজি নন, কারণ তিনি তা আঞ্জাম দেয়ার নির্দেশ দেননি।

উদাহরণ স্বরূপঃ যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেয়, তার কোন একটি নির্দিষ্ট বাড়ীতে যাওয়ার জন্য, এখন তোমার জন্য কি বৈধ হবে ঐ দিন ব্যতীত তার বাড়ীতে যাওয়া অথবা ঐদিনে তার অন্য কোন বাড়ীতে যাওয়া?! অথবা কোন ব্যক্তি তার পোশাকের অথবা চাকরের অথবা পশুর মধ্যে থেকে তোমাকে একটি পোশাক অথবা একটি চাকর অথবা একটি পশু দান করে, এখন তুমি কি পারবে তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার অন্য কোন পোশাক অথবা চাকর অথবা পশু নিতে বা ব্যবহার করতে?

তারা ঃ না আমাদের জন্য বৈধ নয়। কেননা সে আমাদেরকে প্রথমটার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে, দ্বিতীয়টার জন্য নয়।

নবী (সাঃ) ঃ এখন তাহলে আমাকে বল, আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশকে মেনে চলা এবং তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর মালিকানায় হাত না দেয়া কি উত্তম নয়?!

তারা ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশকে মেনে চলা এবং তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর মালিকানায় হাত না দেয়াটাই উত্তম ।

নবী (সাঃ) ঃ তাহলে কেন তোমরা নিজেরা আল্লাহ্ তা'য়ালার বিনা অনুমতিতে এই মূর্তিগুলোকে সিজদা কর?!

তারা ঃ নবীর (সাঃ) এরূপ দলিলসহ আলোচনার কারণে চুপ হয়ে গেল এবং বলল আমাদেরকে সময় দিন এ ব্যাপারে ভেবে দেখবো।

হযরত ইমাম সাদিক (আঃ) নবীর (সাঃ) এই পাঁচ দলের সাথে মুনাযিরা বর্ণনা করে বলেন ঃ কসম সেই আল্লাহ্র যিনি নবীকে (সাঃ) নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিন দিন অতিবাহীত হতে না হতেই এই ২৫ ব্যক্তি যাদের সাথে নবী (সাঃ) মুনাযিরা করেছিলেন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হল এবং বলল ঃ

ما رَأَيْنا مِثْلَ حُجَّتِكَ يا مُحَمَّدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ

হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার মত কোন দলিল ভিত্তিক আলোচক দেখিনি, স্বীকারোক্তি দিচ্ছি এ মর্মে যে, আপনি রাসূল ও আল্লাহ্র প্রেরীত পুরুষ[১]।

---

[১]। ইহতিজাজ তাবরাসী, খণ্ড-১, পৃঃ- (১৬-২৪)।

২- কুরাইশদের সাথে নবীর (সাঃ) মুনাযিরা

এটি একটি আজব ধরনের মুনাযিরার ঘটনা যা নবী (সাঃ) ও কুরাইসদের মধ্যে হয়েছিল[১] তা নিম্নরূপ ঃ

একদিন নবী (সাঃ) একদল মুসলমানসহ কা'বা ঘরের পাশে বসে ছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী আহ্কাম ও কোরআনের আয়াত সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা দিচ্ছিলেন।

এ সময় কুরাইশদের কিছু মুরুব্বি লোক যারা সবাই মুশরিক ও মূর্তি পুজারক ছিল যেমন ওয়ালিদ ইবনে মুগাইরাহ্, আবুল বাখতারী, আবু জাহ্ল, আ'স ইবনে ওয়াইল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাইফাহ্, আব্দুল্লাহ্ মাখযুমী, আবু সুফিয়ান, উ'তবাহ্ ও সাইবাহ্ .... কিছুটা দুরে একত্রিত হল ও বলল ঃ দিনের পর দিন মুহাম্মদের (সাঃ) কাজের উন্নতি ও প্রসার হচ্ছে। উত্তম হল এটাই যে, তাঁর কাছে গিয়ে তাকে কিছু বাজে কথা বলে অপমান করে তার সাথে আলোচনায় বসবো এবং তার বন্ধু ও ছাত্রদের সামনে তার কথাগুলোকে যুক্তি ও দলিলহীন প্রমান করবো। যদি সে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং বিপথগামীতা থেকে ফিরে আসে তাহলে তো আমরা আমাদের ইচ্ছায় পৌছালাম, আর যদি তা না হয় তাহলে তলোয়ার দিয়ে তাকে হত্যা করবো।

আবু জেহেল বলল ঃ কে আমাদের মধ্যে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবে এবং মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে গিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা বা মুনাযিরায় বসবে?

আব্দুল্লাহ্ মাখযুমী বলল ঃ আমি তাঁর সাথে মুনাযিরা করতে উপস্থিত আছি। যদি আমাকে উপযুক্ত মনে কর তবে তো কোন কথাই নেই।

আবু জেহেল, তাকে নির্দিষ্ট করলো, তারপর সকলে মিলে উঠে দাড়ালো এবং সবাই নবীর (সাঃ) কাছে গেল।

আব্দুল্লাহ্ নিজের আলোচনা নবীর (সাঃ) দোষ-ক্রটি ধরার মধ্য দিয়ে শুরু

---

[১]। পবিত্র কোরআনে সূরা ফোরকান/৭, ইসরা/৯০-৯৫, যোখরাফ/৩১ নং আয়াতে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে।

করলো। যতবারই নবী (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তোমার কি আর কোন কথা আছে? ততবারই সে বলল ঃ হ্যাঁ। এভাবেই সে অব্যাহত দিল। শেষ পর্যায়ে এ পর্যন্তই যথেষ্ট বলে ক্ষ্যান্ত দিল। তারপর সে বলল ঃ যদি এ সকল ব্যাপারে তোমার কোন কথা থেকে থাকে তবে বল, আমরা তা শোনার জন্য তৈরী আছি।

তার আলোচনাতে দশ ধরনের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ ছিল যা নিম্নরূপ ঃ

১- তুমি তো অন্যান্য মানুষের মতই খাদ্য খাও, নবী তো অন্যদের মত খাদ্য খাবে না।

২- তুমি যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তবে তোমার কেন সম্পদ ও সম্পত্তি নেই। তোমার মত একজন বাদশার তো সম্পদ ও সম্পত্তি থাকা উচিৎ।

৩- তোমার সাথে ফেরেশ্‌তা থাকা দরকার, যাতে করে তোমাকে সবাই বিশ্বাস করে। আর আমরাও ঐ ফেরেশ্‌তাকে দেখতে চাই। আরো উত্তম হচ্ছে নবী অবশ্যই ফেরেশ্‌তা সত্তার হবে।

৪- তুমি একজন যাদুকর অথবা তাদের মতই।

৫- কেন কোরআন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন ওয়ালিদ ইবনে মুগাইরাহ্ মাক্কী অথবা উরুহ্ মাসুদ তাইফিরের কাছে নাজিল হয়নি?

৬- আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তুমি এই শুষ্ক মরুভূমিতে পানির কুয়ার ব্যবস্থা করবে৷ এবং খোরমা ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করবে। আর ঐ কুয়ার পানি সরবরাহের মাধ্যমে এই বাগানে ফল ফলাবে এবং সেই ফল খাচ্ছি৷

৭- আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্নের ন্যায় আমাদের মাথার উপর নিয়ে আসবে৷

৮- আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণকে আমাদের চোখের সামনে নিয়ে এসো যাতে তাদেরকে দেখতে পারি৷

৯- আমাদের ঘরগুলোকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ করে দাও।

১০- আসমানকে উপরে উঠিয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চিঠি আন। আর তা আমরা পড়বো (অর্থাৎ আল্লাহ্ মুশরিকদের কাছে চিঠি পাঠাবে এই মর্মে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আমার প্রেরীত নবী তাকে অনুসরণ কর)।

এই দশটি বিষয় তুমি আঞ্জাম দেয়ার পরও তোমাকে আমরা কথা দিতে পারবো না যে, তোমার নবী হওয়ার ব্যাপারে আমাদের অন্তরে বিশ্বাস এসেছে। কেননা এগুলো তুমি যাদুর মাধ্যমেও করতে পারো, যা এক পলকেই করা যায়।

মুশরিকদের উল্লিখিত বক্তব্য ও অন্যায় দাবীর প্রতিউত্তরে নবী (সাঃ)ঃ
তিনি আব্দুল্লাহ্ মাখযুমীর দিকে ফিরে বললেনঃ

১- খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই জেন রাখ যে, ভাল-মন্দ ও অধিকার আল্লাহ্‌রই হাতে। যেভাবে তিনি চান সেভাবেই কর্তৃত্ব করবেন। আর কারো জন্য উপযুক্ত নয় যে, সে ব্যাপারে কেউ আপত্তি করবে। তিনি কাউকে ফকির কাউকে ধনী আবার কাউকে প্রিয় ও সম্মানীয় করেন এবং কাউকে অসম্মানীয় ও লজ্জিত করেন, কাউকে সুস্থ আবার কাউকে অসুস্থ করেন (যদিও এর সবগুলো মানুষের কারণেই)। তথাপিও মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি এরূপ কোন আপত্তি বা অভিযোগ করতে পারে না।

আর যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আপত্তি করার জন্য নাড়াবে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বশালী। তিনি সকল বিষয়ের ভাল-মন্দের ব্যাপারে বিশেষভাবে জ্ঞাত। যা কিছু মানুষের জন্য উত্তম তা তাদেরকে দান করেন। তাই সকলে অবশ্যই তাঁর নির্দেশের অধীন থাকবে। যে ব্যক্তি তাঁর নির্দেশের আনুগত্য থাকবে, সে হচ্ছে মু'মিন আর এর বিপরীত ব্যক্তি হচ্ছে কাফের ও গোনাহ্‌গার এবং তার জন্য কঠিন সাজাও সে পাবে।

তারপর এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَيَّ انَّما اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ واحِدٌ

অর্থাৎ ঃ বল আমি অনুরূপ মানুষের মতই (খাদ্য খাই তোমাদেরই মত), কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাকে নবুওয়াতের ওহী দিয়েছেন, যিনি তোমাদের মা'বুদ তিনি এক ও অদ্বিতীয়[১]।

যদিও প্রতিটি মানুষকেই ভিন্ন ভিন্ন কাজে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমনভাবে তোমার ফকির, ধনী, সুস্থ, সুন্দর, ভদ্র, ও .... মানুষের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই এবং অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করবে, তদ্রূপ নবুওয়াত ও রিসালতের ব্যাপারেও তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করবে এবং কোনরূপ বাক-বিতণ্ডা করবে না।

২- তুমি তোমার বক্তব্যে বলেছো ঃ "আমার কেন সম্পদ ও সম্পত্তি নেই, যা কিনা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি অবশ্যই রোম ও ইরানের সুলতানদের মত সম্পদ, সম্পত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী থাকবে। অবশ্য আল্লাহ্‌ এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন"। এটা জেন রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আপত্তি করছো আর তোমাদের এ আপত্তি করা ভূল ও অর্থহীন। কেননা আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞাত ও বিজ্ঞ তাই তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে যেভাবে তিনি ভাল মনে করবেন আঞ্জাম দিবেন, অন্যের সম্মতি পাওয়ার আশায় নয়। তাই মানুষের সাথে তাঁকে তুলনা করা অবশ্যই উচিৎ নয়।

যেহেতু নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্‌র অনুসারী হওয়ার জন্যে দাওয়াত করা, তাই নবী অবশ্যই দিন ও রাত কঠিনভাবে মানুষকে হিদায়েত করার

---

[১]। সূরা ঃ কাহাফ/১০৯।

কাজে ব্যস্ত থাকবে। যদি নবী সম্পদশালী হয় (অনুরূপ অহঙ্কারীদের মত) তবে সাধারণ ও গরীব মানুষেরা সহজেই তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। কেননা অর্থশালীরা সবসময় তাদের প্রাসাদে আরাম-আয়েশে মত্ত থাকে এবং বড় বড় সব অট্টালিকা ও প্রাসাদের বিশাল সভা কক্ষসমূহ তার ও গরীব মানুষদের মধ্যে দুরত্বের সৃষ্টি করে আর মানুষ সহজেই তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না।

এমন হলে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। আর ঐ নবীর অন্যকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই ধরনের অনর্থক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে (সম্পদ ও ক্ষমতা) মানুষের উপর নুবওয়াতের আধ্যাত্মিক মর্যাদার কোন প্রভাব পড়বে না। হ্যাঁ, সুলতান বা রাজা যখন তার মানুষদের থেকে দুরে থাকে তখন দেশের আইন-কানুনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং অশিক্ষিত ও মূর্খ মানুষদের মধ্যে ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করে।

অন্য আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে সম্পদ ও সম্পত্তি দেই নি যাতে করে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদেরকে দেখাতে পারেন। সাথে সাথে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন এবং তাকে সকল শত্রু ও বিরোধীতাকারীদের থেকে বিজয়ী করবেন। আর এটাই হচ্ছে নবীর নবুওয়াতের পক্ষে উপযুক্ত দলিল। এটা আল্লাহ্র ক্ষমতার ও তোমাদের দুর্বলতার নির্দেশক (যে তাঁর নবীকে সম্পদ ও সম্পত্তি না দিয়েও তোমাদের রাজত্যের উপর কর্তৃত্বদান করেছেন)। খুব শিঘ্রই আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের উপর বিজয়ী করবেন। তোমরা আমার প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাড়াতে পারবে না। আর আমাকে হত্যাও করতে পারবে না। আমি অতিসত্তর তোমাদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করবো এবং তোমাদের শহরগুলো আমার ক্ষমতার অধীনে আসবে। আর সকল শত্রু ও বিরোধীতাকারী মু'মিনদের সম্মুখে আত্মসমর্পন করবে।

৩- আর এই যে তোমরা বলছো "আমার সাথে ফেরেশ্তা থাকবে এবং তোমারা যেন তাদেরকে দেখতে পাও, যার মাধ্যমে আমাকে বিশ্বাস করবে অথবা নবী অবশ্যই ফেরেশ্তা সত্তার হবে"-জেনে রাখ ফেরেশ্তাদের দেহ হচ্ছে অত্যান্ত নরম অনুরূপ বাতাসের মত যা চোখে দেখা যায় না। আর যদি ধরে নেই যে, তোমাদের চক্ষুদ্বয় তা দেখার শক্তিও অর্জন করে তবে তখন তোমরা বলবে এ তো ফেরেশ্তা নয়, এ তো মানুষ (অর্থাৎ মানুষের অনুরূপ দেখতে পাবে) যাতে করে তোমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কথা বলতে পারে। যাতে করে তাদের কথা ও উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারো। এ ছাড়া তোমরা কিভাবে বুঝবে যে, সে ফেরেশ্তা না মানুষ, আর তারা যা বলে তা সত্য।

আর আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বিভিন্ন মু'জিযার ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যা অন্যদের নেই এবং এটাই হচ্ছে নবীর নিদর্শন। কিন্তু যদি ফেরেশ্তাদের মাধ্যমে কোন

মু'জিযা রূপ পরিগ্রহ হয় তাহলে কিভাবে বুঝতে যে তা ফেরেশ্তা আঞ্জাম দিয়েছে? যদিও এমন কাজ করা ফেরেশ্তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়?! সুতরাং ফেরেশ্তাদের নিজেরদের নবুওয়াতের দাবী, তাদের মু'জিযা থাকা সত্ত্বেও তা সত্যায়ীত হয় না। কেননা ফেরেশ্তাদের মু'জিযা শুধুমাত্র পাখিদের মত উড়ে বেড়ানো, যা আঞ্জাম দিতে মানুষ অপারগ। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে মু'জিযা নেই। আর যদি মানুষ এমনভাবে পাখিদের মত উড়ে বেড়ায় তবেই তা মু'জিযা রূপে গণ্য।

এই বিষয়টিকে মাথা থেকে দূরে ফেলে দিওনা যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে তার নবী করেছেন। তিনি তাঁর নির্দেশসমূহকে তোমাদের কাছে সহজেই পাঠাতে চান। কেননা তোমরা যাতে তাঁর সাথে সহজেই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারো এবং তিনি নিজের দলিল-প্রমাণসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন। আর তোমরা তোমাদের আপত্তি ও অভিযোগের মাধ্যমে নিজেদের কাজকে কঠিন করে তুলছো, এতে করে তাঁর দলিল-প্রমাণের উপর গবেষক হতে পারবে না।

৪- আর তোমরা যে বলছো "আমি হচ্ছি যাদুকর" কিভাবে তা সত্য হতে পারে, যখন কিনা আমি এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞতা ও দক্ষতার দিক থেকে তোমাদের উপরে অবস্থান করছি। আমি তোমাদের মধ্যে অনেক দিন ধরে জীবন-যাপন করছি, সেই জন্ম থেকে এ অবধি চল্লিশ বছর হয়ে গেল তোমাদের মধ্যে আছি। এই সময়ের মধ্যে আমার কোন ক্ষুদ্রতম ভূল-ত্রুটি, মিথ্যা, খিয়ানত ও সত্য বলতে অপারগতা দেখনি, এই চল্লিশ বছর ধরে যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহ্র শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে আমানতদারীতা ও সত্যবাদীতার সাথে সঠিক পথে পথ চলেছে তার ব্যাপারে এরূপ অভিযোগ কি শোভা পায়?! এই কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের উত্তরে বলেছেন ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلاً

"এটার প্রতি দৃষ্টি রাখো যে, মুশরিকরা তোমার ব্যাপারে কিভাবে উক্তি করে, এরা ভূল পথের অনুসারী তাদের হিদায়েত হওয়ার কোন পথই খোলা নেই"[১]।

৫- আর তোমরা এটা বলেছো যে, "কোরআন কেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন ওয়ালিদ ইবনে মুগাইরাহ্ মাক্কী অথবা উরুহ্ ইবনে মাসুদ তায়েফির কাছে নাজিল হয়নি"-এটা অবশ্যই আমাদের জানা থাকা দরকার যে, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমতা, ঐশর্য্যতা ও দাপটের ক্ষুদ্রতম মূল্যও নেই। আর যদি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার নে'য়ামত ও সুখ-সমৃদ্ধিসমূহের সামান্যতম মূল্যও থাকতো তবে তার একটুও কাফির ও বিরোধীতাকারীদেরকে দান করতেন না।

---

[১]। সূরা ঃ ইসরা/৪৭।

আর ভাগ-বাটোয়ারা করার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ নিজেই। তাই কেউ এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করার অধিকার রাখে না। আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত নে'য়ামতসমূহকে নিজের ইচ্ছামত তাঁর বান্দাদের মধ্যে বন্টন করে থাকেন। যার ইচ্ছা তা মানবে। কারণ তিনি কারো ভয়ে বা নির্দেশে এ কাজ করেন না। এই তোমরাই শুধুমাত্র তোমাদের নিজেদের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করে থাক। আর তোমাদের কাজগুলো প্রকৃত ও সত্যের বিপরীতে ভয়, ইন্দ্রিয়ের প্রভাব যুক্ত ও বিভিন্ন ধরণের। কারো সম্মান দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল পথের পথিক হয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহ্র কাজসমূহ প্রকৃত ও সত্যের উপর দণ্ডায়মান তাই দুনিয়ার কোন সম্মান বা মর্যাদা তাঁর ইচ্ছা ও চাওয়ার উপর ক্ষুদ্রতম প্রভাব রাখে না। এই তোমরাই শুধুমাত্র তোমাদের গভীরতাহীন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ধনী ও মিথ্যা নামকরা ব্যক্তিকেই অন্যের থেকে নবী হওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত মনে করে থাক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা রিসালতকে নৈতিক বিষয়াবলী, রুহের উপযুক্ততা, আধ্যাত্মিকতা, সত্যতা, নির্দেশ মান্যতা ও খেদমত করার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট করেছেন।

এছাড়াও আগে যা বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নিজের কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এমনটা নয় যে, যদি তিনি নে'য়ামত স্বরূপ কাউকে দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদ দান করেন তার সাথে সাথে তাকে নবুওয়াতী দায়িত্বও দান করবেন। যেমন ধরঃ আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কাউকে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তাকে রূপ ও মিষ্টতা দেন নি এবং অন্য দিকে কাউকে রূপ ও মিষ্টতা দিয়েছেন কিন্তু তাকে অর্থ-সম্পদ

দেন নি। এখন এর কারণে কি আল্লাহ্র উপর আপত্তি করা যায়?।[১]

৬- আর তোমরা বলেছো যে, "আমরা ততক্ষণ ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই শুষ্ক এলাকাতে কুয়ার সৃষ্টি করবো যা থেকে পানি আসতে থাকবে..................."-এই ধরনের অনুরোধ তোমাদের অজ্ঞানতা ও বোকামির পরিচায়ক। কেননা মক্কা শহরে কুয়ার সৃষ্টি ও ফলের বাগান তৈরী করার সাথে নবুওয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন ধর ঃ তোমরা তায়েফ শহরে বসবাস করছো এবং সেখানে পানি ও বাগ-বাগিচায় সমৃদ্ধ তারপরেও কিন্তু নবুওয়াতের দাবি করবে না। অনুরূপভাবে তোমাদের এমন কেউ পরিচিত আছে যে, নিজেই প্রচুর কষ্ট করে পানির কুয়া ও বাগ-বাগিচার মালিক হয়েছে তারপরও কিন্তু সে নবুওয়াতের দাবি করছে না। সুতরাং এমন কাজসমূহ হচ্ছে অতি সাধারণ ব্যাপার এবং যদি আমি এরূপ করতাম

---

[১]। এখানে ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বলেছেন যে, নবীর (সাঃ) এই কথাটি সূরা যোখরোফ/ ৩২ নং আয়াতের তফসির।

তবে তা আমার রিসালতের দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হত না। তোমাদের চাওয়াটা এমনই যে, যা বলেছো ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপর ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি মানুষের মধ্যে হাটবে ও খাদ্য খাবে। আর যদি আমি আমার নবুওয়াতকে প্রমাণ করার জন্য এ সকল কাজের উপর নির্ভর করি তবে তা মানুষকে ধোকা দেয়ার অনুরূপ হবে এবং এমনটাই যে, তাদের অজান্তেই তাদের অজ্ঞানতা ও নির্বোধীতাকে ব্যবহার করবো। সাথে সাথে নবুওয়াতের বিষয়টি ভিত্তিহীন ও অনর্থক হিসেবে বিবেচিত করে তুলবো, যখন কিনা নবুওয়াতের বিষয়টি ধোকাবাজি, মিথ্যা ও চালাকির থেকে পবিত্র।

৭- আর তোমরা যে বলছো, "আসমানকে হালকা কালো মেঘের রূপে তোমাদের মাথার উপর নিয়ে আসবো" -অবশ্যই জেনে রাখ যে, আসমান নিচে নেমে আসার অর্থই হচ্ছে তোমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যখন কিনা নবী পাঠানোর অর্থই হচ্ছে মানুষকে সুখ-শান্তি ও পরকালে পরিত্রাণ দেয়া এবং তাঁর উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, দক্ষতা ও ব্যপকতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। আর এটা পরিস্কার যে, হুজ্জাত বা দলিলসমূহ আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে, তাতে অন্য কারো কোন অধিকার নেই। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, মানুষ তাদের ক্ষুদ্র ও ত্রুটিপূর্ণ চিন্তার

ফলশ্রুতিতে এমন কিছু দাবী করতে পারে যা বাস্তবে আনতে হলে নিয়ম-নীতি, অবকাঠামো ও উপযুক্ততার বিপরীত হবে। কেননা প্রতিটি ব্যাক্তিই তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী দাবী করে থাকে। আর এ থেকেই প্রমাণিত যে, তা বাস্তবে আনলে নিয়ম-নীতি, অবকাঠামো ভূলণ্ঠিত হবে। যার কারণে একটি অপরটি থেকে বিপরীত রূপ পরিগ্রহ করবে।

তোমরা কি এমন কোন ডাক্তারকে দেখেছো যে, রোগ চিকিৎসার সময় রোগীর পছন্দনুযায়ী প্রেসকিপসন লিখেছে? অথবা কেউ কোন ব্যাপারে দাবী করছে এবং তার দাবীর স্ব-পক্ষ্যে যে দলিল নিয়ে আসছে তা তার বিপরীত কিছু প্রমাণ করছে? এটা অবশ্যই যে, যদি ডাক্তার তার রোগীর কথা মত চলে তাহলে ঐ রোগী কখনই সুস্থ হয়ে উঠবে না। আর যদি দাবী জানানো ব্যক্তি তার স্ব-পক্ষ্যে দলিল আনতে গিয়ে বিপক্ষের দলিল নিয়ে আসে তবে কোন পক্ষরই অধিকার প্রমাণিত হবে না এবং অসহায় ও সত্যবাদী মানুষ জুলুম ও মিথ্যার ভারে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবে।

৮- তোমরা বলছো যে, "তোমাদের চোখের সামনে অবশ্যই আল্লাহ্‌ ও ফেরেশ্‌তাগণকে হাজির করবো এবং তোমরা তাদেরকে দেখবে"-এই কথাটি হিসাব-নিকাশ বহির্ভূত ও ভিত্তিহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অসম্ভাবী। কেননা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সৃষ্টিকৃত বস্তুর সকল প্রকার বিশেষণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ্‌ তা'য়ালাকে, তোমরা যে মূর্তিগুলোকে পুজা কর তার সাথে তুলনা করছো আবার এরূপ দাবীও করছো। হ্যাঁ, এই মূর্তিগুলো পরিপূর্ণতার দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত ও দুর্বল তাই এগুলোর কাছে এরূপ

দাবীর উপযুক্ততা আছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার পবিত্র সত্তার কাছে নয়।

তারপর নবী (সাঃ) একটি উদাহরণ আনলেন যা এই বিষয়কে সুন্দরভাবে পরিস্কার করে দেয়, তা হচ্ছে "যদিও আল্লাহ্কে দেখানো অসম্ভব না হয়ে থাকে তথাপিও তা বিবেক সম্মত নয়" উদাহরণটি নিম্নরূপ

যা নবী (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ মাখযুমীকে বলেন ঃ

তোমাদের কি মক্কায় ও তায়েফে বাগ-বাগিচা, জমিন ও সম্পত্তি আছে? সেগুলোকে দেখা-শোনার জন্য তোমাদের পক্ষ থেকে কাউকে কি প্রতিনিধি নিযুক্ত করছো?

আব্দুল্লাহ্ ঃ হ্যাঁ, বাগ-বাগিচা, জমিন ও সম্পত্তি আছে এবং তা দেখা-শোনার জন্য প্রতিনিধিও আছে।

নবী (সাঃ) ঃ তুমি কি নিজেই সরাসরি তোমার বাগ-বাগিচা ও সম্পত্তি দেখতে যাও, না কি তোমার প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে?

আব্দুল্লাহ্ ঃ প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে।

নবী (সাঃ) ঃ যদি তোমার প্রতিনিধি, জমি লিজ দেয় অথবা কোন জিনিষ বিক্রয় করে সেক্ষেত্রে অন্যের কি উচিৎ হবে তার প্রতি আপত্তি তোলার বা বলবে আমরা অবশ্যই সরাসরি মালিকের সাথে কথা বলবো বা আমরা তখনই তোমার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করবো যখন মালিক নিজেই তোমাকে স্বীকৃতি দিবে?

আব্দুল্লাহ্ ঃ অন্যরা এমন আপত্তি তুলবে বৈকি।

নবী (সাঃ) ঃ অবশ্য তোমার প্রতিনিধির কাছে এমন কোন প্রতীক থাকতে হবে যা প্রমাণ দেয় যে, সে সত্যই তোমার প্রতিনিধি। এখন বল, ঐ প্রতীক কি হওয়া উচিৎ যা তাকে তোমার প্রতিনিধি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবে। আর প্রতীকহীনতা তাকে তোমার প্রতিনিধি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবে না।

আব্দুল্লাহ্ ঃ অবশ্যই তাকে প্রতীক সম্বলিত হতে হবে।

নবী (সাঃ) ঃ যদি মানুষ তার প্রতীকটিকে সত্য বলে গ্রহণ না করে, তবে সেক্ষেত্রে কি তার অধিকার আছে যে, সে তার মালিককে তাদের সামনে হাজির করবে বা তার মালিকের কর্তব্য নির্ধারণ করে বলবে অবশ্যই সে যেন মানুষের সামনে হাজির হয়? একজন বিবেক সম্পন্ন প্রতিনিধি কি তার মালিকের জন্য এরূপ কর্তব্য নির্ধারণ করবে?

আব্দুল্লাহ্ ঃ না, সে অবশ্যই তার প্রদত্ত কর্তব্য পালন করবে। আর তার মালিককে নির্দেশ দেয়ার অধিকার সে রাখে না।

নবী (সাঃ) ঃ আমিও এই একই কথা বলছি। সুতরাং তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র রাসূলকে বলছো যে, সে তার মাওলাকে তোমাদের সামনে হাজির করবে? আমি রাসূল

এবং তাঁর প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কিছুই নই। তাহলে কিভাবে আমি এটা করতে পারি যে, আমার মাওলাকে নির্দেশ দিবো বা তাঁর কাজকে নির্ধারণ করবো যা রিসালতের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিপরীত। আর এ যুক্তির মাধ্যমেই তোমার সকল প্রশ্নের (আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণকে তোমাদের সামনে হাজির করার ব্যাপারে) সমাধান হয়ে যায়।

৯- আর এ বিষয়টি যা বলেছো, "ঘর ভর্তি স্বর্ণ থাকতে হবে"- তোমাদের এ কথাটিও অনর্থক। কেননা ধন-সম্পত্তি ও অর্থ-কড়ি রিসালতের দায়িত্বের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখে না। আচ্ছা মিশরের বাদশাহ্‌র কি ঘর ভর্তি স্বর্ণ আছে, যার দ্বারা সে নবুওয়াতের দাবী করতে পারে?!

আব্দুল্লাহ্ ঃ না, তার তা নেই।

নবী (সাঃ) ঃ তাহলে আমার স্বর্ণ থাকাটাও, আমার নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে দলিল হিসেবে কোন প্রমাণ রাখে না। আর আমি এ পথে মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতাকে ব্যবহার করতে পারি না, সাথে সাথে আমার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন হুজ্জাত থাকা সত্বেও এ ধরনের অনর্থক দলিলকেও ব্যবহার করতে পারি না।

১০- আর এই যে তোমরা বলেছো, "অবশ্যই আসমানের উপরে উঠে সেখান থেকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চিঠি নিয়ে আসবো"-এ কথা থেকে এটাই পরিস্কার হয় যে, তোমরা কোন ক্রমেই সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নও। কেননা বলছো যে, শুধুমাত্র আসমানের উপরে যাওয়াটাই যথেষ্ট নয় বরং আসমানের উপরে যাওয়া ছাড়াও অবশ্যই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের জন্য চিঠি নিয়ে আসতে হবে, যদি তাও করি তারপরও তোমরা তা বিশ্বাস করবে না। কেননা সাথে সাথে এটাও বলেছে যে, যদি এগুলোর সব কিছুর আঞ্জাম দেই তারপরও সম্ভাবণা আছে যে তোমরা আমার উপর ঈমান আনবে না। তবে এটা জেনে রাখ যে, এ সকল বাড়াবাড়ী ও অবাধ্যতার পরিণাম আযাব ও

মুসিবত নাজিল হওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আর এই সবের কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র গজবের উপযুক্ত হবে।

তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর এই বাক্যের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে যাবে যা আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ "আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আল্লাহ্‌র তাঁর নির্দেশসমূহকে তোমাদরে কাছে বয়ান করার লক্ষ্যেত তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত[১]। আমার ইশারা হচ্ছে এ (কোরআন ও মু'যিযাহ্) দিকেই, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে দান করেছেন। আর আমি আল্লাহ্‌কে নির্দেশ দিতে পারবো না এবং তাঁর কাছে এমন কিছুর আবেদনও জানাবো না যা সঠিক নয়।

---

[১]। কাহ্ফ/১১০, ফুস্‌সিলাত/৬।

আবু জেহেলের দাবী ঃ

আবু জেহেল বলল ঃ এমনটাই মনে করছো কি যে, যখন মুসার গোত্রের লোকেরা তার কাছে দাবী করেছিল আল্লাহ্কে তাদের সামনে উপস্থিত করানোর জন্য, আল্লাহ্ তা'য়ালা তখন তাদের উপর আজাব নাজিল করেছিল এবং বজ্রপাত ঘটিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন?

নবী (সাঃ) ঃ হ্যাঁ, এরূপটাই হয়েছিল।

আবু জেহেল ঃ আমরা মুসার গোত্রের লোকজনের থেকেও বড় কিছু তোমার কাছে দাবী করেছি। আমরা বলেছি যে, তোমার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের চোখের সামনে আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তাগণকে হাজির করবে। সুতরাং তোমার আল্লাহ্কে বল আমাদেরকে পুড়িয়ে দিতে বা ধ্বংস করে দিতে।

নবী (সাঃ) ঃ তোমরা তো হযরত ইব্রাহীমের ঘটনা শুনেছো যে, তিনি মাকামে মালাকুতে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তার দৃষ্টিতে বিশেষ শক্তি প্রদান করেন, যার কারণে তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের (প্রকাশ্য ও গোপন) আমলগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। এরূপ সময় এক পুরুষ ও মহিলাকে যেনা করা অবস্থায় দেখতে পান। তাদেরকে অভিশাপ করলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আরেক পুরুষ ও মহিলাকে অনুরূপ অবস্থায় দেখলেন এবং পূর্বের ন্যায় তাদেরকেও অভিশাপ করলেন, আর তারাও ধ্বংস হয়ে গেল। তৃতীয়বারে ঠিক অনুরূপ ঘটনাই পরিলক্ষিত হল এবং তিনি অভিশাপ দিলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাকে ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, অভিশাপ দিওনা এই পৃথিবীর অধিকারী শুধুমাত্র আমিই, না তুমি। গোনাগার বান্দারা তিন প্রকারের। এক প্রকার হচ্ছে তওবাকারী তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিব অথবা তাদের বংশে কোন মু'মিন সন্তান জন্ম নেবে, তাই তাদেরকে ঐ মু'মিন সন্তান জন্ম নেয়া পর্যন্ত সময় দেবো। তারপর আমার আজাব তাদের উপর নাজিল হবে। এই দুই প্রকার ব্যতীত যা কিছু তোমার অনুধাবন যোগ্য তার থেকেও অনেক বড় ধরনের আজাব তাদের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি...........

হে আবু জেহেল! এই হিসেব অনুযায়ী আল্লাহ্ তোমাকে সময় দিয়েছেন যে, তোমার বংশে "আকরামাহ্" নামে একজন মু'মিন সন্তান জন্ম নেবে.........[১]

---

[১]। এহতিজাজ -তাবারাসী, খণ্ড-১, পৃঃ-(২৬-৩৬)-এর বর্ণনামতে, আকরামাহ্ ইবনে আবু জাহাল নবীর (সাঃ) কঠিন শত্রু ছিল। মক্কা বিজয়ের পর সে প্রচুর ক্রন্দন করে এবং মদীনায় নবীর (সাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। তারপর সে এমন পদ-মর্যাদায় ভূষিত হয় যে, নবী (সাঃ) তাকে হাওয়াযিন কাবিলার বিশ্বাস অর্জনের প্রধান কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেন। অবশেষে সে আবু বকরের খেলাফতের শেষ দিকে 'আজনাদীন' অথবা 'ইয়ামুক' যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন (সাফিনাতুল বাহার, খণ্ড-২, পৃঃ-২১৬)।

(আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, যদিও নবীর (সাঃ) অপর পক্ষের লোকেরা হচ্ছে ইসলামের জাত শত্রু তবুও তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাদের কথাগুলোকে শ্রবণ করেছেন এবং হাসি মুখে তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আর দলিল ভিত্তিক ও পদ্ধতিগত আলোচনার মাধ্যমে তাদের সামনে হুজ্জাত পূরণ করেছেন। এটাই হচ্ছে ইসলামের নৈতিক ও যুক্তিক প্রথা)।

৩- ইয়াহুদী আলেম ও বিজ্ঞ লোকদের সাথে নবীর (সাঃ) মুনাযিরা

নবীর (সাঃ) হিজরাতের আগে থেকেই ইয়াহুদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁর নবুওয়াতের নমুনা ও আলামতসমূহের আলোচনা হত। এমনকি ইয়াহুদী আলেমরা তৌওরাতের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে তাঁর হিজরতের খবর দিয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এমন নবী আসার কথা বলতো। আর ঐ নমুনা ও আলামতসমূহকে নবীর (সাঃ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিখূতভাবে পর্যবেক্ষণ করতো।

ইয়াহুদী মাযহাবের উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা চিন্তা করেছিল যে, ইসলামের নবীকে (সাঃ) সাহায্য-সহযোগীতা করার মাধ্যমে তাদের দিকে টেনে নিয়ে আসবে। আর তাঁর মাধ্যমেই ধর্মীয় ক্ষমতাকে তাদের হাতে নিয়ে আসবে। কিন্তু যখন নবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন এবং ভীষণ গতিতে ইসলাম প্রকাশ পেল ও ইয়াহুদীদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের থেকেও অধিক পরিমান ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নবীর (সাঃ) হাতে চলে আসলো, কেননা ইসলামে যে পরিমান স্বাধীনতা ছিল এবং যেহেতু ইয়াহুদীদের পতাকার নিচে যেতে চায়নি, এ কারণেই তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নবীর (সাঃ) সাথে বিরোধীতা করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল।

তারা বিভিন্ন পথে চেয়েছিল ইসলামের ক্ষতি স্বাধন করতে। যা সূরা বাকারার ও সূরা নিসার আয়াতসমূহে তাদের বাড়াবাড়ী ও অবাধ্যতার বর্ণনা এসেছে। যেমন তাদের কাজসমূহের মধ্যে একটি এমন যে, আওয়াস ও খাযরাজের মধ্যকার ১২০ বছরের অসমঝোতাকে (মদীনার দুটি বড় গোত্র যা ইসলামের মাধ্যমে সমোঝতা পেয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদেরকে আনসার নামে ডাকা হত) পূনরায় উদ্বেলিত করে। আর এর মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। নবীর (সাঃ) বিচক্ষণতার কারণে মুসলমানরা ইয়াহুদীদের নকসাকে ভূলণ্ঠিত করে দেয় এবং পরবর্তীতে তাদের এ ধরনের আরো অনেক নকসাকে।

এমন একটি পথ, যার মাধ্যমে নবীকে (সাঃ) দমন করতে চেয়েছিল তা ছিল

মুনাযিরা বা স্বাধীন আলোচনা[১]। নবী (সাঃ) অত্যন্ত হাসি মুখেই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তারা চেয়েছিল কঠিন ও জটিল প্রশ্নের মাধ্যমে নবীকে (সাঃ) উত্তর দেয়া থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু এই আলোচনাতে তারাই ক্ষতির শিকার হয়। মানুষ নবীর (সাঃ) জ্ঞানের পরিধি ও গাইবী জ্ঞানের ব্যাপারে জেনে যায় এবং এর কারণেই ইয়াহুদী ও মূর্তিপূজা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

কিন্তু তারা আলোচনাতে পরাভূত হয়েও অবাধ্যতার চমর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে নবীকে (সাঃ) বলতো ঃ আমরা তোমার কথা থেকে কিছুই বুঝি না, قُلُوبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা পড়ে গেছে (বাকারা ঃ ৮৮)।

ইয়াহুদীদের মুনাযিরা ও আলোচনা অনেক আছে যা নবী (সাঃ) তাদের সাথে অত্যন্ত সদ্বয়ভাবে করেছে এবং পৃথিবীর মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে তা বিচার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখানে আপনাদেরকে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি ঃ

এক ঃ যখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইসলামের প্রতি ঈমান এনেছিল ঃ

তিনি একজন ইয়াহুদী বড় আলেম, এমন এক ব্যক্তি যার মাযহাবী জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শীতা ও দক্ষতা ছিল। সে ছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইয়াহুদীদের বনি কিনকা' গোত্রের[২] উচ্চ পর্যায়ের লোক। নবীর (সাঃ) মদীনায় হিজরতের পরে প্রথম বছরে আব্দুল্লাহ্ একদিন তাঁর মজলিসে হাজির হল এবং দেখলো যে, তিনি উপস্থিত লোকদের সামনে বক্তব্য করছেন আর বলছেনঃ

"হে মানব সকল! একে অপরকে সালাম করবে এবং একে অপরকে খোরাক দিবে। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, মধ্য রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন তোমরা জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করবে, যাতে করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পার।

আব্দুল্লাহ্ দেখলো নবীর (সাঃ) কথাগুলো মিথ্যা বা অনর্থক নয়। সে তাঁর মজলিসের প্রতি আকৃষ্ট হল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, এই মজলিসে সে প্রতিনিয়ত অংশ গ্রহণ করবে[৩]।

---

[১]। যদিও ইসলামী বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্য উৎঘাটনের লক্ষ্যে (স্বাধীন আলোচনা) অত্যন্ত ভাল, কিন্তু ইয়াহুদীরা তাদের গোপন ইচ্ছার মাধ্যমে চেয়েছিল নবীকে (সাঃ) ও ইসলামকে পরাজিত করতে এবং তাকে আটকাতে। তবে তাতে বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

[২]। তার নাম ছিল হুছাইন (حصين) অনুরূপ হুসাইন (حسين) এর মত। ইয়াহুদীরা তাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতো, যখন সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তখন নবী (সাঃ) তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ্।

[৩]। এখানে এটা পরিস্কার যে, আব্দুল্লাহ্ একজন গোড়ামী পন্থি এবং নফ্‌সের গোলাম ছিল না। বরং সত্য ও বাতিল পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত সতর্ক ব্যক্তি। আর এ কারণেই সে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানোর

একদিন আব্দুল্লাহ্ ইয়াহুদী গোত্রের ৪০ জন বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে সাথে নিয়ে চিন্তা করলো নবীর (সাঃ) কাছে যাবে এবং তার সাথে রিসালত ও নবুওয়াতের বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করবে। আর নিজের যোগ্যতাবলে নবীকে (সাঃ) পরাজিত করবে।

যখন সে এই পরিকল্পনা নিয়ে নবীর (সাঃ) কাছে আসলো, তিনি ঐ দলের নেতা অর্থাৎ 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম'-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন ঃ আমি আলোচনা ও পর্যালোচনা করার জন্য তৈরী আছি!

তারা প্রস্তাবটি গ্রহণ করলো এবং সাথে সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা শুরু হয়ে গেল। ইয়াহুদীরা আক্রমনাত্বক ভঙ্গিমায় আলোচনা শুরু করলো। তারা নবীকে (সাঃ) মুসলধারে বৃষ্টির ন্যায় কঠিন প্রশ্নের সম্মুখিন করলে তিনি ঐ সকল প্রশ্নের একেকটির জবাব দেন।

একদিন আব্দুল্লাহ্ একাকি নবীর (সাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ

আমি আপনার কাছে তিনটি প্রশ্ন করতে চাই যার উত্তর আল্লাহ্র নবীরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আপনার অনুমতি আছে কি তা বর্ণনা করার?

নবী (সাঃ) ঃ বর্ণনা কর।

আব্দুল্লাহ্ ঃ আমাকে বলুন কিয়ামত দিনের প্রথম আলামত কি? এবং বেহেশ্তের প্রথম খাদ্য কি হবে? আর সন্তান কখনো বাবার মত আবার কখনো মায়ের মত এর কারণই বা কি?

নবী (সাঃ) ঃ এখন জিব্রাঈল আল্লাহ্র কাছ থেকে এগুলোর জবাব নিয়ে আসবে এবং তোমাকে তা বলবো।

জিব্রাঈলের নাম আসার সাথে সাথে আব্দুল্লাহ্ বলল ঃ জিব্রাঈল ইয়াহুদীদের দুশমান, কেননা সে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সাথে দুশমানী করেছে। ভাগ্যলিপি তার শক্তির সাহায্যে আমাদের উপর বিজীত হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ....নবী (সাঃ) তার উত্তরে সূরা বাকারার ৯৭ ও ৯৮ নং আয়াত দুটি পড়লেন যার শানে নুজুল এরূপঃ

"যে জিব্রাঈলকে তুমি শত্রু মনে করছো, সে নিজে থেকে কোন কাজই করে না। সে পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় পয়গাম্বরের অন্তরে নাজিল করেছে। যে কোরআনে আল্লাহ্র রাসূলের (সাঃ) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন আগেও অন্যান্য কিতাবে

সুযোগ পায়। আর একজন বিচক্ষণ মানুষ হিসেবে আমাদের সকলের এই বিশেষণটি থাকা অত্যান্ত আবশ্যক যে, সব কিছুর ক্ষেত্রে সত্য ও বাতিল নির্ণয়ের লক্ষ্যে স্বাধীন চিন্তা-চেতনার বিশ্বাসী হওয়া এবং কোন প্রকার গোড়ামী, পক্ষপাতিত্ব, লোভ-লালসা .... ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা ও প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করা।

এসেছে তার মিল রয়েছে এবং সেগুলোকে সত্যায়িত করে। আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তাদের মধ্যে কোন দুরত্ব নেই। যদি কেউ তাদের মধ্যে এক পক্ষকে শত্রু মনে করে তবে তাদের সকলের সাথে এবং নবীদের সাথে ও আল্লাহ্র সাথে শত্রুতা করলো। কেননা ফেরেশ্তা ও নবীগণ এক অর্থে সবাই আল্লাহ্র হুকুম প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত। তাদের দায়িত্ব আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা আছে। তাদের দায়িত্বে কোন বিরোধ নেই। তাদের সাথে দুশমনি করা আল্লাহ্র সাথে দুশমনি করার শামিল[১]।

এরপর নবী (সাঃ) আব্দুল্লাহ্র উক্ত তিনটি প্রশ্নের জবাব দেন যা নিম্নরূপ ঃ

তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে ধোয়াযুক্ত আগুন, যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে ঠেলে নিয়ে আসবে। আর বেহেশ্তী খাবার হচ্ছে মাছের কলিজা এবং তার সাথে অনুরূপ খাদ্যের মিশ্রণ যা অধিক সুস্বাদু................

তৃতীয় প্রশ্নের জবাবের ক্ষেত্রে তিনি বলেন ঃ বীর্য ঘনিভূত হওয়ার সময় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যারই বীর্য একে অপরের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করবে সন্তান তার মতই দেখতে হবে। অর্থাৎ স্বামীর বীর্য যদি স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে তবে সন্তান বাবা ও বাবার বংশধরের ন্যায় দেখতে হবে। আর যদি স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে তবে সন্তান মা ও মায়ের বংশধরের মত দেখতে হবে।

আব্দুল্লাহ্ সালাম, তার প্রশ্নের উত্তরগুলোকে তৌরাত ও অতীত পয়গম্বারদের ঐশী গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখার পর যখন সত্যতায় উপনীত হল তখন সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং একক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিজের মুখে সাক্ষ্য দান করলো।

আব্দুল্লাহ্ নবীর (সাঃ) প্রতি অনুরোধ করে বলল ঃ আমি ইয়াহুদীদের মধ্যে সব থেকে বড় জ্ঞানী এবং তাদের বড় সন্তান। যদি তারা ইসলামের প্রতি আমার ঈমান আনায়নের ব্যাপারটি জেনে যায় তবে আমাকে ধিক্কার দিবে। আপাতত ইসলামের প্রতি আমার ঈমান আনায়নের ব্যাপারটি গোপন রাখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের ধারনা কি তা জানতে না পারছেন।

নবী (সাঃ) এটাকে এক ধরনের দলিল হিসেব করলেন এবং উম্মুক্ত আলোচনায় ইয়াহুদীদেরকে হারিয়ে দেয়ার জন্য এটাকে ব্যবহার করলেন। তিনি ইয়াহুদীদের সাথে মুনাযিরা করার জন্য মজলিসের ব্যবস্থা করেলেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালামকে ঐ মজলিসের নিকটেই রাখলেন। তিনি তাদের সাথে আলোচনার মধ্যে বললেন ঃ "আমি নবী। আল্লাহ্কে স্মরণ কর ও নফসের চাওয়া-পাওয়া থেকে সরে এসো এবং মুসলমান হয়ে

যাও!"

---

[১]। কিছু সংখ্যক মুফাস্সির এই আয়াতের শানে নুজুলের ক্ষেত্রে (আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাওয়ারিয়ার)-এর কথা উল্লেখ করেছেন তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালামও হতে পারে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

তারা প্রতি উত্তরে বলল ঃ 'আমরা সত্যের মান-দণ্ডে নিহিত ইসলাম নামে কোন ধর্ম আছে এ ব্যাপারে কোন খরবই জানি না!'

নবী (সাঃ) ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন ধরনের ব্যক্তি?

তারা ঃ সে আমাদের পথ-প্রদর্শক এবং পথ-প্রদর্শকদের বংশধর, আর আমাদের মধ্যে সব থেকে বড় জ্ঞানী।

নবী (সাঃ) ঃ যদি সে মুসলমান হয়ে যায় তবে কি তোমরা তাকে অনুসরণ করবে?

তারা ঃ সে কখনই মুসলমান হবে না।

নবী (সাঃ) আব্দুল্লাহ্কে ডাকলেন, আব্দুল্লাহ্ বেরিয়ে এলো এবং ঐ মজলিসে সবার সম্মুখে বলল ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، । হে ইয়াহুদী গোত্রের অধিবাসী আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নবীর (সাঃ) প্রতি ঈমান আন, যদিও তোমরা জান যে তিনি আল্লাহ্র নবী, তা সত্ত্বেও কেন তাঁর প্রতি ঈমান আনছো না?!

যেহেতু তারা এর কিছু সময় আগেও আব্দুল্লাহ্র বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃঢ় ছিল, তার প্রতি এখন রাগান্বিত হয়ে বলল ঃ 'সে আমাদের মধ্যে অধিক খারাপ লোক, আমাদের মধ্যে সব থেকে খারাপ লোকের সন্তান সে, সে এবং তার পিতামহ হচ্ছে আমাদের মধ্যে সব থেকে অধম লোক।'

নবীর (সাঃ) এরূপ গঠনমুলক আলোচনা ও মুনাযিরা আমাদের জন্য বিশেষ শিক্ষানীয়। যদিও ইয়াহুদীরা বাহ্যিকভাবে পরাজয় স্বীকার করেনি তবে প্রকৃতপক্ষে তারাই পরাস্ত হল। আর স্ব-হৃদয় গবেষকদের সামনে তাদের অহেতুক বাড়াবাড়ী ও লম্ফ-ঝম্ফকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ সত্যই আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দার রূপ লাভ করেছিল। যখন সত্যকে বুঝতে পরেছিল তখন সে দিকেই ছুটে গিয়েছিল, যদিও তার জন্যে তা ছিল দুস্যহ ব্যাপার। আর এ কারণেই নবী (সাঃ) তার নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্ (আল্লাহ্র বান্দা)। তার ঈমান অন্যাদের ঈমান

আনার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই (মুখাইরিক) নামে ইয়াহুদীদের আরেকটি বিদ্যান ব্যক্তি এবং আরো কিছু সংখ্যক তার সাথে একত্রিত হল[১]।

---

[১]। ইশতিবাস, নাসিখুত তাওয়ারিখ হিজরাত, খণ্ড-১, পৃঃ-৩৯, সিরাহ্ ইবনে হিশাম, খণ্ড-১, পৃঃ- ৫১৬ এবং ইহতিজাজ তাবরাসী, খণ্ড-১।

৪- কিবলা পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারে নবীর (সাঃ) সাথে ইয়াহুদীদের মুনাযিরা

আমরা জানি যে, নবী (সাঃ) মক্কায় বাইতুল মুকাদ্দাসের (ইয়াহুদীদের কিবলা) দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন। তদ্রূপ মদীনাতেও হিজরাতের পরে ষোল মাস ঐ দিকে ফিরেই নামায আদায় করেছিলেন।

মুসলমানদের শত্রু ইয়াহুদীরা এই বিষয়কে একটি বাহানা হিসেবে ধরে ইসলামকে পরাস্ত করতে চাইলো এবং বলল ঃ "মুহাম্মদ (সাঃ) দাবী করছে যে, সে আলাদা একটি শরীয়ত ও নিয়ম-কানুন এনেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কিবলা সেই ইয়াহুদীদের কিবলাই রয়েছে।"

এই ধরনের আপত্তিমুলক কথা-বার্তা নবীর (সাঃ) অন্ত্যরে ব্যাথার উদ্রেক হল। তিনি রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং ওহীর অপেক্ষায় আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এমতবস্থায় সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াত নাজিল হল এবং তাতে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কিবলা পরিবর্তন করে কা'বাকে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করার নির্দেশ আসলো।

রজব মাসের মধ্যবর্তী সময়ের দিকে হিজরতের পরে ষোল মাস পূর্ণ হয়েছিল, নবী (সাঃ) 'বনী সালামহ্' (আহ্যাব মসজিদের এক কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত) নামক মসজিদে জামা'তের সাথে যোহরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় দুই রাকা'ত নামায আদায় শেষে

জিব্রাঈল (আঃ) সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতটি নিয়ে নাজিল হলেন[১]। নবী (সাঃ) ঐ অবস্থাতেই কা'বার দিকে ঘুরে যান যারা তাঁর পিছনে নামায পড়ছিল তারাও ঘুরে গেল। আর এভাবেই যোহরের নামাজের পরবর্তী দুই রাকা'তকে কা'বার দিকে ফিরে আদায় করে শেষ করলেন। সে জন্যেই এই মসজিদ পরবর্তীতে 'মসজিদে যু-কিবলাতাইন' অর্থাৎ দুই কিবলা বিশিষ্ট মসজিদ নামে বিশেষ পরিচিত পায়।

এই ঘটনার পরে ইয়াহুদীরা বিভিন্ন দিক দিয়ে উক্ত কিবলা পরিবর্তনের আইনের উপর অপত্তি ও অভিযোগ তুলতে শুরু করলো। সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী তবলিগের

---

[১] । قدنرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك فبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر................

কাজেও তৎপর হয়ে উঠলো।

এই পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হল যে, একটি উম্মুক্ত আলোচনায় উক্ত বিষয়ের ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করা হবে।

ইয়াহুদীরা এই সভায় অংশ গ্রহণ করলো এবং সভা শুরু হলে তারা সেখানে কথা বলতে আরম্ভ করলো। প্রশ্ন উত্থাপন করে তারা বলল ঃ

"তুমি এক বছরের বেশী সময় মদীনায় এসেছো এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়েছো। কিন্তু বর্তমানে তা থেকে দূরে সরে গেছ এবং কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করছো। এখন দয়াকরে বল, যে নামাযগুলো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে পড়েছো তা ঠিক ছিল না ভূল?

যদি ঠিক থেকে থাকে তবে অবশ্যই তোমার দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে বাতিল এবং যদি বাতিল হয়ে থাকে তবে আমরা কিভাবে তোমার অন্যান্য আমলসমূহের প্রতি (যা কিনা সকল সময় পরিবর্তন হচ্ছে) নিশ্চয়তা অর্জন করবো, কেননা তোমার বর্তমান কিবলাও বাতিল হতে পারে?!

নবী (সাঃ) ঃ দুটি কিবলার প্রতিটিই নিজেদের স্থানে ঠিক ছিল। এই কয়েক মাস যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়েছি তা ঠিক ছিল। আমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, এখন থেকে কা'বাকে নিজেদের কিবলা হিসেবে স্থান দিব।

و لله المشرق و المغرب فاينما تولوا فثم وجه الله انّ الله واسع عليم

> "পূর্ব থেকে পশ্চিম এই বিস্তীর্ণ ভূমির সবই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাই যে দিকেই তাকাবে আল্লাহ্ সে দিকেই রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী ও বিজ্ঞ (বাকারা/১১৫)।"

তারা ঃ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ কি 'بداء' 'বাদা' অর্জন করেছেন (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় যা আগে আল্লাহ্র কাছে পরিস্কার ছিল না বা গোপন ছিল বর্তমানে তা তাঁর কাছে পরিস্কার হয়েছে বা বুঝতে পেরেছেন, তাই পূর্বের নির্দেশের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় নতুন নির্দেশ দিয়েছেন)।

এই কারণেই নতুন কিবলা নির্ধারণ করেছে? যদি এমন বল তবে আল্লাহ্কে একজন মূর্খ ও অনুশোচনাগ্রস্ত মানুষের ন্যায় মনে করলে?!

নবী (সাঃ)ঃ 'বাদা' তোমরা যে অর্থে বলছো তা আল্লাহ্র জন্য নয়। আল্লাহ্ সব কিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত ও ক্ষমতাবান। তাঁর পক্ষ থেকে কোন ভূল হয় না যে, তার কারণে পরবর্তীতে অনুশোচনাগ্রস্ত হবে বা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কোন কিছুই তাঁর পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে না যে, তার কারণে সময়কে পরিবর্তন বা স্থানান্তরিত করবেন।

তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি ঃ "অসুস্থ ব্যক্তি কি সুস্থ হয় না? অথবা সুস্থ ব্যক্তি কি অসুস্থ হয় না? জীবিত ব্যক্তি কি মৃত্যুবরণ করে না? অথবা শীতকাল পেরিয়ে কি গরমকাল আসে না? এখন বল দেখি আল্লাহ্ তা'য়ালা যে এই সকল কিছুর পরিবর্তন ঘটান সেক্ষেত্রে কি তাঁর 'বাদা' অর্জন করতে হয়?!"

তারা ঃ না, এ সকল বিষয়ে 'বাদা' নেই।

নবী (সাঃ) ঃ কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টিও এই প্রকৃতির। আল্লাহ্ তা'য়ালা সব সময় তাঁর বান্দার যা কিছুতে মঙ্গল সে সকল বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দেন, তবে শুধুমাত্র যারা তাকে মেনে চলবে তারাই পুরস্কৃত হবে। আর এ ব্যতীত অন্যরা সাজা প্রাপ্ত হবে। তাই খোদায়ই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে কোন আপত্তি ও অভিযোগ করা উচিৎ হবে না[১]।

তোমাদের কাছে আমার অন্য আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে ঃ "তোমরা কি শনিবারে তোমাদের সমস্ত প্রকার কাজকে বন্ধ কর না? তোমরা কি শনিবারের পরের দিনে পুনরায় কাজে লেগে যাও না? এখন বল এ দুটির মধ্যে কোনটি হক্ব? প্রথমটি হক্ব আর দ্বিতীয়টি বাতিল অথবা এর বিপরীত যে, প্রথমটি বাতিল আর দ্বিতীয়টি হক্ব অথবা এ দুটিই হক্ব অথবা এ দুটিই বাতিল?!"

তারা ঃ এ দুটির প্রতিটিই হক্ব!

নবী (সাঃ)ঃ আমিও বলছি যে, এ দুটির প্রতিটিই হক্ব। সুতরাং আগের বছর, মাস ও দিনগুলোতে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্ধারণ করা হক্ব ছিল আর এখন কা'বাকে কিবলা নির্ধারণ করাটাও হচ্ছে হক্ব।

তোমরা অনুরূপ অসুস্থ মানুষের মত। আল্লাহ্ তা'য়ালা হচ্ছেন দক্ষ চিকিৎসক। আর একজন অসুস্থ ব্যক্তির এটাই উচিৎ যে, দক্ষ চিকিৎসকের অনুসরণ করা, তার নির্দেশগুলোকে নফ্সের চাওয়া-পাওয়ার উর্দ্ধে স্থান দেয়া।

(উল্লেখ্য যে, এক ব্যক্তি ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) কাছে এই মুনাযিরা সম্পর্কে জানতে চাইলো ঃ কেন প্রথম থেকেই মুসলমানদের কিবলা কা'বা হয়নি?)

১। কিবলাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে ফিরিয়ে কা'বাকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মঙ্গল দিক ছিল বিশেষ করে ঃ

ক) আরব গোত্রের লোকেদের কা'বার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, এরপর থেকে তাঁরা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে।

খ) কা'বা আল্লাহ্র নির্দেশে ইব্রাহীম খালিলুল্লাহ্র হাতে তৈরী হয়েছিল। সাথে সাথে ইব্রাহীম (আঃ) বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাই এর মাধ্যমে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা এটা বুঝতে পারবে যে, ইসলাম কা'বার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রর্দশন করছে।

গ) যেহেতু ইয়াহুদীরা বলতো যে, 'আমাদের কিবলাই হচ্ছে মুসলমানদের কিবলা বা এখনো পর্যন্ত তাদের কোন নিজস্ব কিবলা নেই' এর মাধ্যমে মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র কিবলার অধিকারী হল।

ঘ) মক্কা নগরী মুসলমানদের জন্য নিকটবর্তী ছিল। কা'বা মক্কায় অবস্থিত হওয়াতে মুসলমানদেরকে এটা বুঝিয়ে দেয়া যে, কা'বাকে মূর্তি মুক্ত করে তাকে ইসলামের আওতায় আনতে হবে।

ঙ) যেহেতু মক্কা হচ্ছে নবীর (সাঃ) জন্মভূমি তাই এর মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো।

চ) মু'মিন ও অমু'মিনদের পরীক্ষা নেয়া এবং লোক চেনার ব্যাপারে এটা আল্লাহ্র একটি হিকমত হতে পারে।

ইমাম এই প্রশ্নের জবাবে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যার ব্যাখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

উদ্দেশ্য এটাই যে, মু'মিনগণকে মুশরিকদের থেকে আলাদা করা এবং তাদের অবস্থানকে একে অপর থেকে পৃথক করা। কেননা কা'বা তখনও পর্যন্ত মুশরিকদের মূর্তিতে পূর্ণ ছিল। আর সেগুলোর সম্মূখে তারা সিজদা দিত। সুতরাং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, মুসলমানগণ সাময়িকভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে নামায আদায় করবে। যাতে করে নিজেদের অবস্থানকে মুশরিকদের থেকে আলাদা করবে[১]। কিন্তু যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং একটি স্বতন্ত্র জাতি ও সরকার গঠিত হল ও অন্যদের থেকে তাদের অবস্থান নিশ্চিত হল। তখন এ অবস্থাকে অব্যাহত দেয়ার প্রয়োজন থাকলো না। সুতরাং মুসলমানগণ কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করতে লাগলো। এটা সত্য যে, সেদিন যারা নব মুসলামন হয়েছিল, যাদের মধ্যে তখনো শির্ক করার প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়নি, তাদের পক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করাটা খুব সহজ কাজ ছিল না। এই নির্দেশের মাধ্যমে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিল, যাতে করে অভ্যাসের পরিবর্তন ও জাহেলিয়াতের সাথে সর্ম্পকের বিচ্ছিন্নতা ঘটায়। আর এটা তো পরিস্কার যে, যারা বাতিল অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারে না তারা কখনোই পরিপূর্ণভাবে হকের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করাটা এইটি আধ্যাত্মিক ও চিন্তাগত দিক ছিল। আর ইসলাম এর মাধ্যমে বাতিল সামাজিক প্রথাকে ধ্বংস করেছিল (কিন্তু মদীনায় এরূপ অবস্থা ছিল না অথবা কা'বার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন বেশী ছিল)[২]।

---

[১]। বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্দিষ্ট করার কারণে হয়তো ইয়াহুদীরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হত, যেমনভাবে ইয়াহুদীরা মানসাফকে আকৃষ্ট করেছিল।

[২]। ইকতিবাস বিহারুল আনোয়ারের উদ্ধৃতিতে খণ্ড-৯, পৃঃ-৩০৩ (নতুন), তফসিরে নমুনা, খণ্ড-১, পৃঃ-২৫৬, নাসিখুত তাওয়ারিখ হিজরাত, খণ্ড-১, পৃঃ-৯২, ইহতিজাজ তাবরাসী, খণ্ড-১, পৃঃ-৪৪। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন মুসলমানদের জন্যও একটি পরীক্ষা স্বরূপ ছিল, যাতে করে পরিস্কার হয়ে যায় যে, সকল মুসলমান ইসলামী আইন-কানুনের বশবর্তী কি না? কেননা মুনাফিকরা বিভিন্ন ভাবে এই ধরনের বিষয়ে অনর্থক বক্তব্য পেশ করে নিজেদেরকে পরিচয় দিত আর প্রকৃত মু'মিনগণ তাদের এ ধরনের অনর্থক বক্তব্যকে ধ্বংস করে দিত।

৫- কোরআনের প্রতি আপত্তি ও তার উত্তর

একদিন কিছু সংখ্যক লোক নবীর (সাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমাদের কোরআনের প্রতি আপত্তি আছে। সে ব্যাপারে মুনাযিরা করতে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তোমাদের আপত্তিটা কোথায়?

তারা বলল ঃ তুমি কি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরীত?

নবী (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ।

তারা ঃ তোমার কোরআনের প্রতি আমাদের আপত্তি হচ্ছে এটাই যে, সূরা আম্বিয়ার ৯৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ

انكم و ما تعبدون من دون الله حصت جهنم

(তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যা কিছুকে (মা'বুদ মনে করে) পূজা করছো উভয়ই হচ্ছো দোজখের আগুন প্রজ্জলিত করার উপকরণ)।

এই কথার ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই যে, 'তাহলে হযরত ঈসা মাসিহ্‌ও অবশ্যই দোজখবাসী, কেননা একদল তাকে পূজা করে?!

নবী (সাঃ) কোমলতার সাথে তাদের কথা শুনলেন এবং বললেন ঃ

কোরআন আরবী ব্যাকারণ ও সাহিত্যের রূপরেখা অনুযায়ী নাজিল হয়েছে। সে দিক দিয়ে আরবী ভাষায় 'مَنْ' 'মান' শব্দটি সাধারণত যাওয়াল উকুলের (যারা আক্বল সম্পন্ন অর্থাৎ মানুষ) ক্ষেত্রে ব্যবহারিত হয়ে থাকে আর 'ما' 'মা' শব্দটি সাধারণত যাওয়াল উকুলহীনের (যারা আক্বল সম্পন্ন নয় অর্থাৎ পশু, গাছ ইত্যাদি..) ক্ষেত্রে ব্যবহারিত হয়ে থাকে। কিন্তু 'اَلَّذِى' 'আল্লাযি' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারিত হয়ে থাকে। এই আয়াতে তোমাদের অপত্তিটা হচ্ছে 'মা' শব্দের ক্ষেত্রে। এখানে ঐ সমস্ত মা'বুদদের কথা বলছে যাদের আক্বল নেই যেমন মূর্তিগুলো পাথর, কাঠ, মাটি ও ....তৈরী। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের অর্থ এমন হবে ঃ 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপসনাকারীরা ও সে সকল মা'বুদদের (মূর্তিসমূহ) স্থান হবে দোজখে'। এই ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট হল এবং নবীর (সাঃ) নবুওয়াতকে সত্য বলে ঘোষনা দিয়ে বিদায় নিল[১]।

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, নতুন প্রিন্ট, খণ্ড-৯, পৃঃ-২৮২।

৬- ২৪জন মুনাফিকের ষড়যন্ত্র এবং তাদের সাথে নবীর (সাঃ) মুনাযিরা

সব সময়ের জন্যে মুনাফিকদের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণ হচ্ছে "ক্ষমতার লোভ"। তারা সব সময় এটাই চেষ্টা করে যে, ছদ্মবেশে মানুষের পছন্দনিয় আইন-কানুনের পক্ষে কথা বলে সমাজের বিশ্বস্ততাকে হস্তগত করা এবং এর মাধ্যমে ঐ সমাজের পরিচালনার দায়িত্বভার হাতে নেয়া। তাই এই পরিচালকের বিষয়ে তারা বিশেষ স্পর্শকাতর এবং কঠিন দৃষ্টি রাখে।

নবীর (সাঃ) যমানায় বিভিন্ন সময় আলোচনাতে আলীর (আঃ) প্রতিনিধিত্বের কথা উঠতো। মুনাফিকরা চেষ্টায় ছিল আলীকে (আঃ) এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ং নবীকেও (সাঃ) ক্ষতির সম্মুখিন করবে। আর ইসলামের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য

কারো হাতে অর্পন করবে।

জাঙ্গে তাবুকে মুনাফিকরা এমনই একটি ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা একটি গোপন নকসার মাধ্যমে চেয়েছিল আলীকে (আঃ) এবং এমনকি নবীকেও (সাঃ) হত্যা করবে। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

২৪ জন মুনাফিক গোপন সভায় সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল মদীনায় আলীকে (আঃ) হত্যার জন্য থেকে যাবে আর একদল নবীর (সাঃ) সাথে তাবুকের দিকে রওনা হবে, যাতে করে যুদ্ধের কঠিন পর্যায়ে যখন মুসলমানরা যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে মশগুল থাকবে তখন সুযোগ মত নবীকেও (সাঃ) হত্যা করতে পারে। তাদের দশজন মদীনায় থেকে গেল এবং বাকি চৌদ্দজন নবীর (সাঃ) সাথে তাবুকের যুদ্ধে শরিক হল।

ইসলামী সৈনিকরা দশ হাজার ঘোড়ার পিঠে এবং বিশ হাজার পদযোগে নবীর (সাঃ) নেতৃত্বে মদীনা থেকে তাবুক অভিমুখে রওনা হল। আগেই খবর পৌছে ছিল যে, রোমের সৈন্যদের (ঘোড়ার পিঠে ও পদযোগে) মোট সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। তারা পরিপূর্ণ যুদ্ধের সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে শাম ও মদীনার সিমান্তে একত্রিত হয়েছিল এবং মুসলমানদের

উপর অতর্কিত হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

যদিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এই যুদ্ধটি যেমন ঃ মদীনা থেকে অনেক দূরে, গরমের মৌসুম, ফসল উঠার সময়, সমর সজ্জায় সজ্জিত শত্রুপক্ষ ও সংখ্যায় অধিক, খাদ্য-পানির কমতি........ এসব মিলিয়ে বেশ কঠিন ছিল। যার কারণে এই যুদ্ধকে جيش'

'العسرة' 'জাইসুল উ'সরাতি' অর্থাৎ এমন এক সৈনিক দল যারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন ছিল বলা হয়েছে। কিন্তু ঈমান, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, দৃঢ় চিত্ততা ও নবীর (সাঃ) নেতৃত্ব তাদেরকে এক বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। তারা মদীনা থেকে তাবুক এই বিস্তর ব্যবধান পাড়ি দিয়ে ৯ম হিজরীর শা'বান মাসের ১লা তারিখে সেখানে এসে পৌছায়। এই অবস্থা দেখে রোমের সৈন্যবাহিনী ভয় পেয়ে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়। অবশেষে যুদ্ধের অবসান ঘটে।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে, ক্ষমতালোভি মুনাফিকরা নবী (সাঃ) ও আলীর (আঃ) হত্যার কুমতলবে ছিল। নবী (সাঃ) যেহেতু অত্যান্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তাই আলীকে (আঃ) তাবুকের যুদ্ধে নিজের সাথে নিয়ে যাননি। বরং তাকে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন যাতে করে তিনি সেখানে না থাকা অবস্থায় দুশমন ও মুনাফিকদের হাত থেকে মদীনাকে রক্ষা করতে পারেন।

যেহেতু আলী (আঃ) মদীনায় ছিলেন তাই মুনাফিকরা তাদের কুমতলবকে ত্রিশ হাজার মুসলমানের অবর্তমানে আঞ্জাম দিতে পারছিল না। (কেননা মদীনায় কোন হামলাও হয়নি বা সেখানকার মুসলমানরা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাই এমতাবস্থায় যদি আলী (আঃ) হত্যা হয় তবে তা কে করলো) তাই তারা গুজব রটনার মাধ্যমে তাদের আসল উদ্দেশ্যে পৌছাতে চেষ্টা করলো। যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

'তারা এভাবে বলতে লাগলো যে, আলী ও নবীর (সাঃ) মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। নবী (সাঃ) তাঁর সহযোগী ও সহচরের প্রতি নারাজ হয়েছেন, যার কারণেই তাকে এবারে যুদ্ধে সাথে নিয়ে যান নি...... তারা এটা প্রচারের মাধ্যমে চেয়েছিল আলীর (আঃ) প্রতিনিধিত্বের উপর আঘাত হানবে। আলী (আঃ) তাদের কথা-বার্তায় এবং গুজব সৃষ্টির কারণে ক্ষুব্ধ হলেন এবং সাথে সাথে মদীনা থেকে তাবুকের দিকে রওনা হলেন। তিনি নিজেকে রাসূলের (সাঃ) নিকট পৌছালেন এবং উক্ত ঘটনার বর্ণনা দিলেন। নবী (সাঃ) সব কিছু শোনার পর বললেন ঃ

اما ترضى ان تكون منّي بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي

"তুমি কি এটাতে রাজি হবে না যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ঐরূপ যেমন হারুনের সাথে মু'সার সম্পর্ক ছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।"

আলীর (আঃ) অন্তর প্রশান্তিতে ভরে গেল এবং তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। মুনাফিকরা যেহেতু তাঁর প্রতিনিধিত্বের উপর আঘাত হানতে চেয়েছিল তাই এর মাধ্যমে তাদের কুমতলব শুধু ধ্বংসই হল না বরং নবী (সাঃ) নিজের প্রতিনিধি হিসেবে আলীকে (আঃ) উপরোক্ত উক্তির দ্বারা আরো দৃঢ় ও মজবুত করে দিলেন।

মুনাফিকরা তাদের গোপন সভায় আলীর (আঃ) হত্যার পরিকল্পনা করলো

এভাবেঃ আলী (আঃ) যে পথে ফিরে আসবেন সেখানে একটি গভীর গর্ত করে তা কিছু দিয়ে ঢেকে রাখবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন তার মধ্যে পড়ে যাবেন এবং মৃত্যুবরণ করবেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে গর্তের মধ্যে পড়া থেকে রক্ষা করলেন এবং তিনি সুস্থ শরীরে মদীনায় ফিরে এলেন। অবশেষে মদীনায় অবস্থানরাত দশজন মুনাফিক তাদের কু-উদ্দেশ্যে পৌছাতে পারলো না।

কিন্তু যে চৌদ্দজন মুনাফিক মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করছিল[১] তারা গোপন আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিল যে, তাবুক থেকে ফিরে আসার সময় নবীর (সাঃ) উট যখন উচু পাহাড়ের প্যাচানো রাস্তার মধ্য দিয়ে আসবে তখন পাহাড়ের উচে আবর্তনশীল স্থানে তাদের কয়েকজন লুকিয়ে থেকে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করবে। আর এ প্রক্রিয়ায় কেউ পাথর নিক্ষেপকারীদের ব্যাপারে অবগত হবে না বা

তাদেরকে কেউ দেখতেও পাবে না।

যখন নবী (সাঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যে পাহাড়ের উচে আবর্তনশীল স্থান ছিল তার নিকটে পৌছালেন তখন জিব্রাঈল (আঃ) নবীকে (সাঃ) মুনাফিকদের কু-মতলব সম্পর্কে অবগত করলেন।

নবী (সাঃ) অকর্ষাৎভাবে মুসলমানদের সামনে আলীর (আঃ) ব্যাপারে মুনাফিকদের গ্রহণীয় কু-মতলবের বর্ণনা দিলেন এবং সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বললেন।

ঐ চৌদ্দজন মুনাফিক মনে করলো, তারাই যে এই কু-মতলবের হোতা এবং তাদের কু-মতল চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই শুধুমাত্র নবীর (সাঃ) বন্ধু হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় করিয়েছে তা কেউ জানে না বা বুঝতেও পারেনি। তারা রাসূলের (সাঃ) সামনে বসলো এবং আলীর (আঃ) ব্যাপারে (প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে) বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করলো। অর্থাৎ তারা তাদের এ কাজের মাধ্যমে এটা বুঝাতে চাইলো যে, তারা ধীশক্তি সম্পন্ন ও উম্মুক্ত আলোচনার পক্ষপাতি। যদি মুনাযিরার উম্মুক্ত আলোচনাতে তাদেরকে হারিয়ে দেয়া হয় তবে তারা আত্মসম্পর্ণ করবে। নবী (সাঃ) হুজ্জাত পূর্ণ করার জন্য তাদের এই প্রস্তাবকে স্বাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন।

মুনাফিকদের প্রশ্নের ধরনঃ তারা এভাবে আলোচনা শুরু করলো, আমাদেরকে

---

[১]। অনেকেই মুনাফিকদের সংখ্যাকে বারজন উল্ল্যেখ করেছেন, যাদের আটজন হচ্ছে কোরাইস গোত্রের এবং অন্যরা হচ্ছে মদীনাবাসী।

বলুনঃ আলী (আঃ) উত্তম না ফেরেশ্‌তাগণ?

নবী (সাঃ) ঃ ফেরেশ্‌তাগণের শান ও মর্যাদা এটার কারণেই যে, তারা মুহাম্মদ (সাঃ) ও আলী (আঃ) এবং এলাহী প্রতিনিধিদেরকে ভালবাসেন ও তাদের প্রতিনিধিত্বকে গ্রহণ করেছেন। আর যে মানুষই ইখলাসের সাথে পবিত্র অন্তর দিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্বকে মেনে নিবে এবং তাদেরকে ভালবাসবে তারা ফেরেশ্‌তাগণের থেকেও উচ্চ মর্যাদাশীল। আপনারা জানেন কি, আদমের (আঃ) প্রতি ফেরেশ্‌তাদের সিজদা করার কারণ হচ্ছে তারা নিজেদেরকে সব কিছুর থেকে অনেক বড় মনে করতো। আল্লাহ্ তাই মানুষের জ্ঞানের মর্যাদাকে তাদের সামনে তুলে ধরলেন। তারা তখন নিজেদেরকে আদমের (আঃ) থেকে শান ও মর্যাদার দিক থেকে ছোট মনে করলো এবং ততক্ষণাৎ তাকে সিজদা করলো। আর সে দিন থেকেই পবিত্র ও খোদায়ই রংয়ে রঙ্গিন ব্যক্তিদের বিশেষ করে নবী (সাঃ), আলী (আঃ) এবং তাঁর পরের ইমামগণের মত ব্যক্তিদের প্রতি সিজদা করা আদমের (আঃ) প্রতি সিজদার অনুরূপ। ফেরেশ্‌তাগণ এরূপেই আদমের (আঃ) প্রতি সিজদা করেছিল। বাহ্যিকভাবে যদিও ঐ সিজদাটা তারা আদমের (আঃ) জন্য দিয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষ্যে তা ছিল আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই। আর এখানে আদম (আঃ) ছিলেন কিবলার (কা'বার) মর্যাদায়।

কিন্তু ইবলিস নিজের অহংকার ও অহমিকার কারণে আদমকে (আঃ) সিজদা করলো না। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবার থেকে ছিটকে পড়লো............

হযরত আদমের (আঃ) মত মুনাফিকদের ভূল কাজ, গোনাহ্ বা তারকে আউলা করার সম্ভাবণা ছিল। নবী (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ হযরত আদম (আঃ) বেহেশ্‌তের ঐ গাছের ফল খাওয়ার ঘটনায় পতিত হয়েছিল। যা খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছিল। এটা তিনি তারকে আউলা করেছিলেন। আর এটা করার পিছনে কোন অহংকার বা অহমিকা ছিল না। সে কারণেই তিনি দ্রুত নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর তওবাকে গ্রহণ করেণ[১]।

---

[১]। নবী (সাঃ) এই মুনাযিরাহ্‌তেও যেহেতু ক্ষমতা লোভী মুনাফিকরা প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অপত্তি করেছিল এবং তাদের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া এটাই ছিল যে, প্রতিনিধিত্ব ও ইমামতের বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি করবে। তিনি এমন দৃঢ়তার সাথে কথা বললেন, এমনকি ফেরেশ্‌তাদের সিজদাহ্ দেয়ার বিষয়টিকেও উপযুক্ত ব্যক্তিদের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ করলেন। আর এর মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বিলায়ত বা ইসলামের পরিচালক নির্ণয়কে একটি খেলার সমতুল্য মনে করে মানুষের বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না।

যেভাবে মুনাফিকদের কু-মতলব ধ্বংস হলঃ

নবীর (সাঃ) এতসব বক্তব্য ও উপদেশ মুনাফিকদের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো না। তারা তাদের সেই কু-মতলবের উপর দৃঢ় সংকল্প থাকলো যে, পাহাড়ের প্যাচানো রাস্তা দিয়ে তিনি যখন উপরে উঠবেন তখন মোড় ঘোরার সময় পাথর নিক্ষেপ করে উপর থেকে উট সহ তাঁকে ফেলে দেবে।

নবী (সাঃ) মুসলমানদের মধ্যে (হুযাইফাহ্) নামে একজনকে বললেন ঐ পাহাড়ের রাস্তার কিনারায় যেখান থেকে রাস্তা শুরু হয়েছে সেখানে দাড়াতে এবং দুর থেকে সকলের উপর নজর রাখতে। আর কেউ যেন তাঁর আগে পাহাড়ের উপরে না যায়। সকলের উদ্দেশ্যে এটা বলা হল যে, তারা যেন নবীর (সাঃ) পিছনে দলবদ্ধ হয়ে চলা শুরু করে এবং কেউ যেন তাঁর পূর্বে এক পাও না বাড়ায়।

হুযাইফাহ্ রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ মোতাবেক নিজেকে পাহাড়ের নিচে অবস্থিত পাথরের পিছনে লুকিয়ে রেখে সকল দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখলো যে, কেউ যেন নবীর (সাঃ) আগে পাহাড়ের উপরে না যায়।

কিন্তু সে দেখতে পেল যে, ঐ চৌদ্দজন মুনাফিক নবী (সাঃ) যাওয়ার আগেই পাহাড়ের উঁচে সেই আবর্তনশীল স্থানে পৌছালো এবং বড় বড় পাথরের পিছনে গিয়ে লুকালো। হুযাইফাহ্ তাদের সকলকে দেখতে পেল। এমনকি তাদের কথা-বার্তাও শুনতে পেল। সে অতি দ্রুত নবীর (সাঃ) কাছে পৌছে এই বিষয়টিকে বর্ণনা করলো।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাদের কু-মতলব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও উটের পিঠে উঠলেন। হুযাইফাহ্, সালমান ফার্সী ও আ'ম্মার ইয়াসির হযরতের চারপাশে অবস্থান নিল এবং তাঁর পাহারায় থাকলো। পাহাড়ের উপরে উঠতে থাকলেন। যখন সেই প্যাচের মাথায় এসে পৌছালেন, মুনাফিকরা উপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে ছেড়ে দিল যাতে করে উট সহ নবী (সাঃ) উপর থেকে নিচে পড়ে যান।

কিন্তু পাথরগুলো পাহাড়ের খাদে পড়ে গেল এবং নবী (সাঃ) সহ তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সুস্থ শরীরে পাহাড় থেকে নিচে পৌছে গেলেন। তাদের গায়ে কোন প্রকার আচড় পর্যন্তও লাগলো না। তিনি আ'ম্মার ইয়াসিরকে বললেন ঃ "পাহাড়ের উপরে যাও এবং তোমার হাতের লাঠি দিয়ে তাদের গোপন আস্তানাগুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দাও, আর তাদেরকে সেখান থেকে ফেলে দাও"।

নবীর (সাঃ) নির্দেশ মত আ'ম্মার সেখানে গিয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করলো এবং তাদের গোপন আস্তানাগুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যেই তাদের অনেকেই ততক্ষণে তাদের সেই গোপন আস্তানা থেকে ছিটকে পড়ে হাত-পা ভেঙ্গেছে[১]।

---

[১]। ইকতিবাস- ইহ্তিজাজ তাবরাসী, খণ্ড-১, পৃঃ-৯৫ এবং সিরাহ্ ইবনে হিশাম, খণ্ড-৩, পৃঃ- ৫২৭।

এগুলো হচ্ছে ইসলামের অতি সূক্ষ্ম শিক্ষা যাতে করে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে মুনাফিকদেরকে চিনতে পারি এবং তাদের কু-মতলগুলো যা বিভিন্ন আকৃতিতে ভাল মানুষের বেশে রূপ পরিগ্রহ করে থাকে সেগুলোকে যেন চিহ্নিত করতে পারি। আর উপযুক্ত সময় যেন তাদের নীল নকসাকে ধ্বংস করতে পারি। আশ্চার্যের বিষয় হচ্ছে যে, মুনাফিকরা তাদের এই চক্রান্তটি রাতের অন্ধকারে আঞ্জাম দিয়েছিল। আর এটাই হচ্ছে উপযুক্ত দলিল যে, তারা চেয়েছিল তাদের চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রটি গোপন থাকুক কিন্তু বিচক্ষণ মুসলমানগণ তাদের হাতের মুষ্ঠিকে খুলে ফেলেন এবং উপযুক্ত সময় তাদের চক্রান্তকে ধ্বংস করেন। নবী (সাঃ), আলী (আঃ) ও হুযাইফার ব্যাপারে নিম্নোক্ত বাক্যে এভাবে বর্ণনা দেন ঃ

তিনি বললেন ঃ "আলী ও হুযাইফা মুনাফিকদের ব্যাপারে অন্যদের থেকে বেশী অবগত"। আমরাও মুনাফিকদের কাজের ব্যাপারে আলী ও হুযাইফার মত অবগত ও হুসিয়ার থাকবো!"।

ফলাফল এটাই যে ঃ নবী (সাঃ) এমনকি যারা মুনাফিক ছিল তাদের মুনাফিকি প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে মুনাযিরা করেছিলেন। আর তিনি এটাই চেয়েছিলেন যে, তারা পারস্পরিক সমঝোতা, আলোচনা-পর্যালোচনা ও যুক্তির মাধ্যমে সামনে আসুক। কিন্তু যখন তাদের বাড়াবাড়ী ও চক্রান্ত প্রকাশ পেল তখন তাদেরকে বিতাড়িত করলেন।

৭- নবীর (সাঃ) সাথে নাজরানের প্রতিনিধিদের মুনাযিরা

'নাজরান' হচ্ছে একটি শহর যা মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। প্রায় ৭৩ টি গ্রাম এই শহরের অধীনে ছিল। ইসলামের প্রাথমীক পর্যায়ে এই শহরের প্রতিষ্ঠিত মাযহাব ছিল মাসীহী (খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী)। সে সময় মাসীহী ধর্মের বড় বড় আলেম বা পোপ এই শহরেই জীবন-যাপন করতো। সে দিনের সেই নাজরান শহরটি বর্তমানে ভ্যাটিক্যান দেশ হিসেবে পরিচিত।

নাজরানের প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল আ'কাব নামে এক ব্যক্তি এবং আবু হারিছাহ্ ছিল সেখানকার মাযহাবী বা ধর্মীয় নেতা। আর জনসাধারণের কাছে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সম্মানিয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিল আইহাম নামে এক ব্যক্তি।

যখন ইসলামের বাণী সমগ্র বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল, আর তৌরাত ও ইঞ্জিলে নবী (সাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষ্য উল্লেখিত থাকার কারণে খৃষ্টান আলেমগণ এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ উদগ্রীব ছিল -তাই এই খবরের ব্যাপারে গবেষণা শুরু করলো।

নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায় তিনবার, প্রতিবারে বিশেষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে দল তৈরী করে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরকে নবীর (সাঃ) নিকট পাঠিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে দলগুলো প্রেরীত হয়েছিল যে, তারা যেন নিকট থেকে নবীর (সাঃ) নবুওয়াতের সত্যতা অনুধাবন করতে পারে। প্রথমবার তারা হিজরতের পূর্বে মক্কায় নবীর (সাঃ) কাছে আসে এবং মুনাযিরা করে। আর দুইবার হিজরতের পর মদীনাতে। আমরা এখানে সংক্ষেপে এই তিনবারের মুনাযিরাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবোঃ

এক ঃ নাজরানের প্রতিনিধিদের প্রথম মুনাযিরা ঃ

নাজরানের খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে এক দল প্রতিনিধি মক্কায় আসে এই উদ্দেশ্যে যে, নবীকে (সাঃ) কাছ থেকে দেখবে এবং তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে যাচাই করবে। তারা কা'বা ঘরের কিনারায় নবীর (সাঃ) সাক্ষাতে উপস্থিত হল এবং মুনাযিরা করার প্রস্তাব রাখলো। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাদের কথা-বার্তাগুলো শুনলেন এবং তার উত্তরও দিলেন। সর্বশেষে তিনি পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ৮৩নং আয়াতটি পাঠ

করলেন ঃ

وَ اذا سَمِعُوا ما اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ اَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاً عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فاَكْتُبْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ.

তারা এই আয়াত শুনে কোরআনের গভীরতার প্রতি অধিক পরিমানে আকর্ষিত হয়ে পড়ে। তাই যখন তারা কোনআনের ঐ আয়াত শুনছিল তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের চোখগুলো কান্নায় ভরে গিয়েছিল। ঐ আয়াতকে গবেষণা করলো এবং নিজেদের গৃহীত সিদ্ধান্তকে তৌওরাত ও ইঞ্জিলের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখলো যার মাধ্যমে ফলাফলে পৌছালো অবশেষে তারা মুসলমান হয়ে গেল।

মুশরিকরা, বিশেষ করে আবু জাহ্‌ল এই মুনাযিহ্‌রার কারণে অনেক রাগান্বিত হল। নাজরানের প্রতিনিধিগণ মুনাযিরার শেষে যখন চলে যাচ্ছিলো তখন আবু জেহেল কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তাদের পথ রোধ করে দাড়ালো এবং তাদের নিয়ে অনেক অপমান সূচক ও কটুকথা উচ্চারণ করে তাদেরকে বলল ঃ আমরা তোমাদের থেকে অধিক পাগল লোক আর কোথাও দেখিনি। কেননা তোমরা খৃষ্টান জাতির প্রতি খিয়ানত করেছো এবং নিজেদের দ্বীন থেকে বেরিয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছো। তারা নরম সুরে প্রতি উত্তরে বলল ঃ আমাদের নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। যে দায়িত্ব আমরা ঘাড়ে তুলে নিয়েছি তা আমাদের উপরই ন্যস্ত[১]।

দুই ঃ খৃষ্টান প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় মুনাযিরা ঃ

নাজরানের খৃষ্টান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় মুনাযিরাটি মদীনায় হিজরী ৯ম সালে অনুষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীতে 'মুবাহিলাহ্‌' নামক ঘটনার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে। মুনাযিরাটি নিম্নরূপ ঃ

নবী (সাঃ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তদ্রূপ নাজরানের পোপ আবু হারিছার উদ্দেশ্যেও পাঠিয়েছিলেন। উক্ত চিঠিতে তিনি তাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত করেছিলেন। নবীর (সাঃ) চারজন সাহাবা মদীনা থেকে নাজরানে যায় এবং তাঁর চিঠিটি পোপের কাছে হস্তান্তর করে। পোপ চিঠিটি পড়ার পরে খুব রাগান্বিত হয়ে রাসূলের (সাঃ) প্রতি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন না করেই ঐ চিঠিটি ছিড়ে ফেলে। সে সিদ্ধান্ত নিল যে, নাজরানের বড় বড় ব্যক্তিত্বদের সাথে ঐ চিঠির ব্যাপারে আলোচনা করবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে সে শারাহ্‌বিল, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে শারাহ্‌বিল, জাব্বার ইবনে ফাইযের সাথে আলোচনা করলে তারা বলল ঃ যেহেতু এই বিষয়টি নবুওয়াত সংক্রান্ত সেহেতু আমরা এ ব্যাপারে কোন

---

[১]। সিরাহ্‌-এ-হালাবী, খণ্ড-১, পৃঃ-৩৮৩।

সিদ্ধান্তই দিতে পারবো না।

সে এই বিষয়টিকে জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা করলে সবাই এভাবে বললঃ এটা উত্তম যে, আমাদের এখান থেকে একদল জ্ঞানী প্রতিনিধি মদীনায় মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে পাঠানো হোক এবং তারা তাঁর সাথে সত্য উদঘাটন করার জন্য মুনাযিরা ও আলোচনা করুক।

তারা এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা করলো[১]। অবশেষে এভাবে বিষয়টি আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল যে, নাজরানের ৬০ জন ব্যক্তি যাদের মধ্যে আ'কাবা, আব্দুল মাসীহ্, আবু হারিছাহ্ ও আইহাম সহ ১৪ জন আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি থাকবে। এরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হল নবীর (সাঃ) সাথে মুনাযিরা করার জন্য।

উন্মুক্ত আলোচনা কখনোই ফলাফল বিহীন নয়। আর তা হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত এবং উত্তম পন্থা। তবে যদি কেউ চায় যে, তা অশুভ ফন্দি-ফিকিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিতে অবশ্যই তার পথ রোধ করা আবশ্যক।

নাজরানের প্রতিনিধিরা ইচ্ছকৃতভাবে অত্যন্ত সুন্দর ও চাকচিক্য পোশাক এবং অলংকারও পরে এসেছিল যাতে করে মদীনায় প্রবেশের সময় সেখানকার সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর এ পদ্ধতিতে মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি হয়[২]।

নবী (সাঃ) এই গোপন চক্রান্তকে ধ্বংস করার জন্য সব দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং হুসিয়ার ছিলেন (যা উন্মুক্ত আলোচনাতেও তা পরিলক্ষিত হয়)। মোকাবিলা করতে চক্রান্তের আশ্রয় নেয়ার প্রক্রিয়াকে এভাবে পথ রোধ করলেন যখন ঃ নাজরানের প্রতিনিধিরা ঝলমলে উচ্চ মূল্যের পোশাক-আশাক পরে তাঁর কাছে পৌছালো, তিনি তখন তাদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না এবং তাদের সাথে কথা পর্যন্তও বললেন না। তারা তিন দিন মদীনায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে যেহেতু উসমান ও আব্দুর রহমানের সাথে তাদের আগেই পরিচয় ছিল, তাই তারা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে এরূপ আচরণের কারণ জানতে চাইলে উসমান

---

[১]। এই আলোচনাসমূহ বিস্তারীতভাবে বিহারুল আনোয়ারের ২১ নং খণ্ডে, ২৭৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

[২]। যদিও নবী (সাঃ) এই অশুভ ফন্দি-ফিকিরকে আটকিয়ে ছিলেন তথাপিও তাদের ঐ সব ঝলমলে পোশাক-আশাক কিছু সংখ্যক মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা আফসোস করছিল এই বলে যে, তাদেরও যদি এমন পোশাক-আশাক থাকতো। এ ব্যাপারে কোরআনে আলে ইমরানের ১৫ নং আয়াতে এরূপ নাজিল হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আমার নবী! বল তোমাদেরকে কী এমন কিছুর ব্যাপারে অবহীত করবো যা এই দুনিয়াবী অর্থ-বিত্তের থেকে উত্তম? যারা পরহেযগার তারা তাদের প্রভুর নিকট অন্য এক দুনিয়ায় যেখানে গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে ঝর্ণা বয়ে যাবে সেখানে সে স্থান পাবে এবং তাকে পবিত্র স্ত্রী দান করা হবে, আর আল্লাহ্র ভালবাসা। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সব কিছুর উপরেই দৃষ্টিমান।

তাদেরকে আলীর (আঃ) কাছে নিয়ে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা দেয়। আলী (আঃ) তাদের প্রতি বললেনঃ

"তোমরা তোমাদের এই ঝলমলে ও উচ্চ মূল্যের পোশাককে শরীর থেকে খুলে ফেল এবং সাধারণ মানুষের মত নবীর (সাঃ) কাছে উপস্থিত হও। অবশ্যই তোমরা তাতে সফল হবে"। তারা আলীর (আঃ) পরামর্শ মতই আঞ্জাম দিল এবং সফলও হল।

এই মুনাযিরার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে স্বাধীন আলোচনা করার ব্যবস্থা এবং চাপের মধ্যে না রাখা। নবী (সাঃ) পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই মসজিদে জামায়া'তের সাথে পড়তেন এবং মুসলিম জনগণ ঐ জামায়া'তে অংশগ্রহণ করতেন। খৃষ্টান প্রতিনিধিরা মুসলমানগণের এই জামায়া'ত দেখে অতিশয় আশ্চার্য হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদের আক্বীদা বিশ্বাস মোতাবেক মসজিদের এক কোণে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতি ফিরে নামায পড়লো। কোন কোন মুসলমান তাদের এই কাজের বিরোধীতা করতে চেয়েছিল, কিন্তু নবী (সাঃ) তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। এই কারণেই ইতিহাসে বলা হয়ে থাকে যে, তারা মদীনায় বিশেষ স্বাধীনতায় ছিল এবং কোন প্রকার চাপের মধ্যে ছিল না।

অবশেষে তিন দিন পরে জামায়া'তের নামায শেষে মসজিদে মুনাযিরার অনুষ্ঠান শুরু হয়। নাজরানের ৬০ জন ব্যক্তি নবীর (সাঃ) পাশে

বসলো, মুসলমানরাও একটু দুরে বসলেন। অনেকেই এই আলোচনা বা মুনাযিরা শোনার জন্য বসলো। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মুনাযিরা শোনার জন্য ইয়াহুদীদের কিছু সংখ্যকও সেখানে উপস্থিত হলো।

আলোচনার প্রারম্ভে নবী (সাঃ) কথা শুরু করলেন। ভালবাসাপূর্ণ আলাপের মাধ্যমে নাজরানের প্রতিনিধিদেরকে শুভ আগমণ জানালেন এবং তাদেরকে ইসলাম ও একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত করে বললেনঃ

এসো আমরা সবাই এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে সবাই এক সারিতে অবস্থান করি এবং তাঁর নির্দেশের ছত্র ছায়ায় একত্রিত হই। তারপর পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

পোপ ঃ যদি ইসলামের উদ্দেশ্য, খোদার উপর ঈমান আনায়ন ও তাঁর নির্দেশসমূহের প্রতি আমল করা হয়ে থাকে তবে আমরা তোমাদের থেকে অনেক আগেই মুসলমান ছিলাম।

নবী (সাঃ) ঃ প্রকৃত ইসলামের কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন রয়েছে। তিনটি দলিল রয়েছে যা তোমাদেরকে অইসলামী প্রমাণ করে। প্রথমটি হচ্ছে তোমরা সালিবকে (ক্রুশ) পুজা-অর্চণা কর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে শুকরের মাংস খাওয়াকে হালাল মনে কর। তৃতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তান আছে এটার উপর বিশ্বাস রাখ।

নাজরানের প্রতিনিধিরা ঃ আমাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস এটাই যে, হযরত মাসীহ্ই (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্। কেননা তিনি মৃত মানুষকে জীবিত

করতেন এবং অসুস্থ মানুষ যাদের কোন চিকিৎসা ছিল না তাদেরকে সুস্থ করে দিতেন। আর মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে তাতে জীবন দিতেন এবং তা উঠে যেত .... এ সকল কাজই হচ্ছে তাঁর খোদা হওয়ার নিদর্শন।

নবী (সাঃ) ঃ না, এ সকল কাজ কোন ক্রমেই খোদা হওয়ার দলিল হতে পারে না। বরং তিনি আল্লাহ্র এক নেক বান্দা বৈ অন্য কিছুই নয়। আল্লাহ্ তাকে হযরত মারিয়ামের (সালাঃ) গর্ভে দিয়েছিলেন এবং

পরবর্তীতে এ ধরণে মু'জিযাসমূহ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষমতা দান করেছিলেন। তিনি চামড়া, মাংস, শিরা-উপশিরা এবং স্নায়ু......... সমম্বয়ে গঠিত এক মানুষ ছিলেন। খাদ্য খেতেন এবং পানি পান করতেন। এমন কেউ অবশ্যই আল্লাহ্ হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্র কোন শরিক নেই।

ঐ প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে একজন বলল ঃ হযরত মাসীহ্ (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্র সন্তান এ দলিলের ভিত্তিতে যে, কেউ হযরত মারিয়ামের (সালাঃ) সাথে বিয়ে করেনি কিন্তু মারিয়াম তাকে দুনিয়ায় এনেছেন। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত দলিল যে আল্লাহ্ তাঁর পিতা আর তিনি আল্লাহ্র সন্তান।

নবী (সাঃ) (সূরা আলে ইমরানের ৬১ নং এলাহী ওহী থেকে) বললেন ঃ হযরত ঈসার (আঃ) দৃষ্টান্ত অনুরূপ হযরত আদমের (আঃ) মতই। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে পিতা-মাতা ব্যতীত মাটি থেকে সৃষ্টি করেন। যদি পিতা না থাকার কারণে ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র সন্তান হয়ে থাকে তবে আদমের (আঃ) তো পিতা-মাতা কেউই ছিল না সুতরাং তাকে তো অবশ্যই বলতে হয় যে, সে আল্লাহ্র সন্তান।

নাজরানের প্রতিনিধিরা দেখলো যতই জিজ্ঞাসা করছে তিনি ততই বলছেন। এত সব শুনতে শুনতে তারা যেন মুসলমান না হয়ে যায় তাই তারা মুনাযিরা বন্ধ করে বলল ঃ এ সকল কিছু আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। তাই আমরা মুবাহিলাহ্ করতে প্রস্তুত। অর্থাৎ একটি স্থানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করতে শুরু করবো এবং মিথ্যাবাদীদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ধিক্কার দিব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস না করছেন।

নবীর (সাঃ) প্রতি সূরা আলে ইমরানের ৬১ নং আয়াত নাজিল হওয়ার কারণে তিনি মুবাহিলার প্রস্তাবকে স্বাদরে গ্রহণ করলেন। সকল মুসলমান এই বিষয়ের প্রতি অবগত হলেন। তাই তারা একে অপরের সাথে বলতে শুরু করলো এই মুবাহিলায় কি ঘটবে?!

সকলেই অধির আগ্রহে মুবাহিলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। নির্দিষ্ট দিন

পৌঁছালো (৯ম হিজরীর ২৪শে যিলহাজ্জ)। নাজরানের প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব সভায় একটি মনোবিজ্ঞানীক বিষয় ব্যবহার করেছিল। তারা তাদের সকলকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছিল যে, যদি মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক লোকজনসহ হৈ চৈ করে মুবাহিলা করতে আসেন তাহলে তাঁর সাথে মুবাহিলা করবে এবং ভয় পাবে না। কেননা তাঁর কাজে কোন সত্যতা নেই, কারণ তিনি হৈ চৈ করে জিততে চান। আর যদি তিনি নিজের বিশেষ সন্তান-সন্তোতি ও আত্মীয়-স্বজনদের অল্প কয়েকজনকে নিয়ে মুবাহিলায় অংশ গ্রহণ করেন তবে তাঁর সাথে মুবাহিলা করবে না। কেননা তা হবে আমাদের জন্য ক্ষতিকর ও ভয়ানক।

নাজরানের প্রতিনিধিরা মুবাহিলার নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে তৌওরাত ও ইঞ্জিল পড়ে খোদা তা'য়ালার ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত হল এবং সেখানে নবীর (সাঃ) আসার অপেক্ষায় থাকলো। হটাৎ তারা দেখলো যে, নবী (সাঃ) চারজনকে সাথে নিয়ে আসছেন। যার একজন হচ্ছেন নিজের কন্যা হযরত ফাতিমা (সালাঃ), অপরজন হচ্ছেন তাঁর জামাই হযরত আলী (আঃ) এবং অন্যরা হচ্ছেন হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীর (আঃ) দুটি শিশু সন্তান ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আঃ)।

শারজীল, (যে ছিল নাজরান প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি) তার সঙ্গী-সাথীদেরকে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন কয়েকজনকে দেখছি যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র কাছে পাহাড়ের নিজের স্থান পরিবর্তন করার আবেদন করে তবে অবশ্যই তাই ঘটবে। তাদেরকে ভয় পাও এবং মুবাহিলাহ্‌ করো না।

যদি মুহাম্মদের (সাঃ) মুবাহিলাহ্‌ কর তবে আমাদের একজনও

অবশিষ্ট থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস কর। অন্ত্যতপক্ষে এবারের জন্য হলেও আমার কথা শোন।

শারজীলের পীড়াপীড়ি নাজরানের প্রতিনিধিদের উপর প্রভাব বিস্তার করলো। বিশেষ ধরনের অস্থিরতা তাদেরকে ঘিরে ধরলো। দ্রুত তাদের একজনকে নবীর (সাঃ) সাক্ষাতে প্রেরণ করলো এবং মুবাহিলাহ্‌ বন্ধ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালো এবং শান্তি চুক্তির পরামর্শ দিল।

নবী (সাঃ) তাদের উপর অনুগ্রহ করলেন এবং সহজ শর্তস্বাপেক্ষে

তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই শান্তি চুক্তি চারটি ধারায় সম্পাদিত হয় যা নিম্নরূপঃ

১- নাজরানের জনগণ (ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে নিরাপত্তা সংরক্ষণের সাথে সাথে) প্রতি বছরে দুই হাজার আলখেল্লা পোশাক দুই কিস্তিতে দিতে বাধ্য থাকবে।

২- নবীর (সাঃ) প্রেরীত ব্যক্তি নাজরান শহরে একমাস ও তার অধীক সময়

সেখানে থাকার অধিকার প্রাপ্ত হবেন।

৩- যখনই ইয়ামানে ইসলামের বিরুদ্ধে শোরগোল হবে তখনই নাজরানের জনগণ ত্রিশটি যুদ্ধের পোশাক (যেরেহ্) ও ত্রিশটি উট ফেরত যোগ্য ঋন হিসেবে ইসলামী সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে।

৪- এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে সুদ খাওয়ার পদ্ধতি নাজরানের জনগণের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হল।

হ্যাঁ নাজরানের প্রতিনিধিরা এরূপ বাধ্য-বাদকতাসহ আত্মসমর্পীত হল। যেহেতু তারা উম্মুক্ত আলোচনায় হেরে গিয়েছিল তাই নাজরানের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হল[১]।

আর এই আয়াতটি (সূরা আলে্ ইমরানের ৬১ নং আয়াতটি) নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতের (আঃ) পবিত্রতা এবং বিশিষ্টতার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

তিন ঃ নাজরান প্রতিনিধিদের তৃতীয় দলের সাথে নবীর (সাঃ) মুনাযিরা ঃ

নাজরান খৃষ্টানদের তৃতীয় দল যারা ছিল বনী হারিছ কাবিলার, তারাও সেখানে থেকেই গবেষণা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং তাদের কিছু সংখ্যক খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সাথে মদীনায় আসে। নবীর (সাঃ) সম্মুখে ইসলামকে স্বীকার করে বলেন ঃ 'আমরা খোদাকে কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে হিদায়েত দান করেছেন'।

নবী (সাঃ) তাদেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমরা কোন দলিলের ভিত্তিতে তোমাদের শত্রুদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছো?"

তারা বলল ঃ 'আমরা আমাদের মধ্যে কখনই বিভক্ত ছিলাম না এবং প্রথম থেকেই আমরা কারো উপর জুলুম করিনি'।

নবী (সাঃ) বললেন ঃ صَدَقْتُمْ (সত্য বলেছো)[২]।

ফলাফল ঃ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম ও তৃতীয় দলটি ইসলামের সত্যতাকে উপলব্ধি করে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি যারা মুবাহিলাহ্ করতে চেয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা বন্ধের অনুরোধও জানিয়েছিল, তারাও ইসলামের সত্যতাকে অনুধাবণ করতে পেরেছিল কিন্তু কয়েকটি দলিলের ভিত্তিতে ইসলামকে বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করেনি যা নিম্নরূপঃ

১- পোপ নবীর (সাঃ) দেয়া চিঠিকে ছিড়ে ফেলেছিল। এই ক্ষমতার

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ২১, পৃঃ- ৩১৯ থেকে ৩২৪ পর্যন্ত। সিরাহ্ ইবনে হিশাম, খণ্ড-২, পৃঃ- ১৭৫। ফুতুহুল বিলাদান, পৃঃ- ৭৬। আকবালে সাইয়্যেদ ইবনে তাউউস, ৪৯৬ পৃষ্ঠার পর থেকে।

[২]। আল্ বিদায়াহ্, খণ্ড-৫, পৃঃ- ৯৮।

লোভ ও গোড়ামীতাই সত্যকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

২- তারা মুবাহিলাহ্ করতে প্রস্তুত হয়নি। যদি তারা ইসলাম ও নবীর (সাঃ) সত্যতাকে অনুধাবন নাই করতে পারতো তাহলে কেন মুবাহিলাহ্ বন্ধের অনুরোধ করেছিল? আর এটাই হচ্ছে উপযুক্ত দলিল যে, তারা নবী (সাঃ) ও ইসলামের সত্যতাকে বুঝতে পেরেছিল।

৩- ইতিহাসে এসেছে যে, নাজরানের প্রতিনিধিরা সেখানে ফিরে যাওয়ার সময় রাস্তায় তাদের মধ্যে একজন নবীর (সাঃ) ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করলে পোপ (আবু হারিছাহ্) ঐ ব্যক্তির উপর ভীষণ রেগে গেল এবং বলল কেন মুহাম্মদের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলছো? তার এই উক্তির কারণে ঐ ব্যক্তি মদীনায় ফিরে আসে এবং নবীর (সাঃ) সাক্ষাতে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে।

(ইতিহাসের এ ঘটনাটিও এই কথারই বহিঃপ্রকাশ যে, নাজরানের প্রতিনিধিরা নবীর (সাঃ) নবুওয়াতের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিল)।

৪- যখন নাজারানের প্রতিনিধিরা সেখানে ফিরে গেল এবং নিজেদের ঘটনাকে মানুষের সামনে বর্ণনা করলো তখন সেখানকার একজন সন্ন্যাসী এ সকল শুনে দারুণভাবে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে চিৎকার দিয়ে বলে ঃ "হে মানব সকল! আমাকে এই আশ্রমের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে যাও, তা না হলে আমি নিজেই লাফিয়ে পড়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিব"।

জনগণ তাকে আশ্রমের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এলো। তারপর সে সরাসরি মদীনায় চলে আসে এবং কিছু দিন নবীর (সাঃ) সংস্পর্শে থাকে। তাঁর সাথে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে জ্ঞানগত আলোচনা করে তা সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে পুনরায় নাজরানে ফিরে যায়। নবীর (সাঃ) কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় সে তাকে কথা দেয় যে, মদীনায় ফিরে আসবে এবং মুসলমান হবে, কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি........[১]

---

[১]। আল্ বিদায়াহ্, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৫৫।

৮- মুয়া'বিয়ার সাথে ইমাম আলীর (আঃ) লিখিত মুনাযিরা

মুয়া'বিয়া ইবনে আবুসুফিয়ান, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত করার পর ইমাম আলীর (আঃ) খেলাফতের শেষের দিকে তাঁর কাছে চিঠি দেয়। চিঠির বিষয়বস্তুতে নিম্নের চারটি দিক বর্ণিত ছিল ঃ

১- শামের এই বিস্তৃর্ণ সবুজ ভুমিকে আমার হাতে অর্পন কর, যাতে করে এই এলাকার প্রশাসক হিসেবে আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারি।

২- সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের কারণে অনেক রক্তপাত হয়েছে এবং আরো হবে তাই তা অব্যাহত দেয়া থেকে বিরত হও।

৩- আমরা দুই পক্ষই যুদ্ধের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং উভয় পক্ষই আমরা মুসলমান। আর দুই পক্ষেই ইসলামী ব্যক্তিত্বরা অবস্থান করছে।

৪- আমরা দুইজনই আবদে মানাফের (নবীর (সাঃ) বংশের তৃতীয় পুরুষ) বংশধর। সে কারণেই কেউ আমরা একে অপরের থেকে উচ্চে নই। সুতরাং এখনো এটা সম্ভব যে অতীতের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের ভবিষৎকে ত্রুটি মুক্ত করি[১]।

ইমাম আলী (আঃ) মুয়া'বিয়ার চিঠির প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে জবাব দেন যা নিম্নরূপ ঃ

১- শাম শহরকে তোমার হাতে অর্পণ করবো না। জেনে রাখ যে, আমি যে জিনিষ কাল তোমাকে দেইনি আজ তা দান করবো না। (আল্লাহ্‌র শাসন ব্যবস্থায় আজ ও কালের কোন পার্থক্য নেই আর তা দুস্কৃতিকারীদের হাতে পৌছাবে না)।

২- তুমি লিখেছো যে, যুদ্ধ আরবদের ধ্বংসের কারণ হবে, তবে জেনে রাখ যারা যুদ্ধে মারা যাবে তারা যদি সত্যের

পক্ষে থেকে থাকে তাহলে তাদের স্থান হবে বেহেশ্‌তে। আর যদি তারা বাতিলের পক্ষে থেকে থাকে তবে তাদের স্থান হবে আগুনের মধ্যে।

৩- তুমি দাবি জানিয়েছো যে, যুদ্ধে আমি এবং তুমি সমান সমান এমনটি নয়, কেননা তুমি অনিশ্চয়তার মধ্যে আছো আমার পর্যায়ে ইয়াকীন বা বিশ্বাসে পৌছাওনি। আর ইরাকের অধিবাসীদের থেকে শামের অধিবাসীরা আখেরাতের প্রতি অধিক লোভী নয়।

৪- আর তুমি যে বলেছো, 'আমরা সবাই আবদে মানাফের সন্তান' হ্যাঁ এটা

---

[১]। ইকতিবাস, আস্‌সিফ্‌ফিন ইবনে মাযাহিম কিতাব থেকে, পৃঃ-৪৬৮-৪৭১।

ঠিক কিন্তু উমাইয়্যা (তোমার পূর্ব পুরুষ) অনুরূপ (তার ভাই) হাশিমের (আমার পূর্ব পুরুষ) মত নয়। আর হারব (তোমার পূর্ব পুরুষ) অনুরূপ আব্দুল মুত্তালিবের (আমার পূর্ব পুরুষ) মত নয়। তদ্রুপ আবু সুফিয়ান (তোমার পিতা) অনুরূপ আবু তালিবের (আমার পিতা) মত নয়। আর কখনই মুহাজিররা ফাত্‌হে মক্কায় আটককৃত কাফের যাদেরকে রাসূল (সাঃ) পরবর্তীতে মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাদের মত নয়। সঠিক বংশধারী আর সত্যের অনুসারীগণ অনুরূপ বাতিলের অনুসারী এবং মু'মিন অনুরূপ খারাপ ব্যক্তির ন্যায় হবে না। আর এটা কতই না লজ্জাষ্কর ব্যাপার তাদের জন্য যারা এমন পূর্ব পুরুষের অনুগত্য করে, যাদের অবস্থান হচ্ছে জাহান্নামের আগুনে।

এ ক্ষেত্রে নবুওয়াতের সম্মান, গৌরব বা যশ আমাদের অধিকারে। যার কারণেই প্রিয়জনকে অপদস্থ আর অপদস্থদেরকে সম্মানিত করেছি। যখন মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং সত্যকে আকড়ে ধরার ক্ষেত্রে একে অপরের মধ্যে প্রতিযোগীতা করেছিল তাদের সকলের পরে, তোমরা হয় দুনিয়া পাওয়ার জন্য অথবা ভয়ে ইসলামের ছত্র ছায়ায় এসেছিলে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে কোন প্রকার ফযিলত তোমাদের নেই। অতএব সজাগ থেকো শয়তান যেন তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে[১]।

---

[১]। ইকতিবাস নাহ্‌জুল বালাঘা থেকে, চিঠি-১৭।

৯- ইমাম আলী (আঃ) নিজের অধিকারকে রক্ষার লক্ষ্যে যেসকল মুনাযিরা করেছিলেন তার কয়েকটি নমুনা

জনাব উসমানের খেলাফতের শেষ দিকে মুহাজির ও আনসারদের একটি দল যা ছিল প্রায় দু'শ জনের মত, মসজিদে নব্বীতে একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে দলে দলে আলোচনা বা মুনাযিরা করছিল। তাদের মধ্যে একটি দল জ্ঞান ও তাকওয়ার শান-মর্যাদা নিয়ে কথা বলল এবং কুরাইশদের উত্তম ও উজ্জ্বল অতীত ইতিহাস এবং তাদের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিলেন তা তুলে ধরলো। সাথে সাথে আরো উল্লেখ করলো যে, রাসূল (সাঃ) নাকি তাদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

أَلأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ (ইমামগণ সকলেই কুরাইশ থেকে)।

অথবা বলেছেন ঃ

اَلنَّاسُ تَبَع لِقُرَيشٍ، وَ قُرِيش اَئمَّةُ الْعَرَبِ (মানুষ কুরাইশদেরকে আনুগত্য করবে এবং কুরাইশ হচ্ছেন আরবের নেতৃত্ব দানকরী)।

এরূপভাবে সব দলই তাদের নিজেদের ব্যাপারে ঐতিহ্যসমূহকে একের পর এক তুলে ধরছিল। মুহাজিরদের মধ্যে যে ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন যথাক্রমেঃ আলী (আঃ), সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ, তালহা, যুবাইর, মিকদাদ, হাশিম ইবনে উ'তবাহ্, আব্দুল্লা ইবনে উ'মর, হাসান ও হুসাইন (আঃ), ইবনে আব্বাস, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর।

আর আনসারদের মধ্যে যে ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন যথাক্রমে ঃ উবাই ইবনে কা'য়াব, যাইদ ইবনে ছাবিত আবি আইয়ুব আনসারী, কাইস ইবনে সা'দ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী এবং আনাস ইবনে মালিক ও আরো অনেকেই...............

তাদের মধ্যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মুনাযিরা চললো। এ সময় উসমান তার বাড়ীতে অবস্থান করছিল এবং আলী (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা আলোচনায় অংশ না নিয়ে চুপ করে ছিলেন।

এমতাবস্থায় উপস্থিত সবাই ইমাম আলীর (আঃ) দিকে ফিরে বলল ঃ 'আপনি কেন কোন কথা বলছেন না?'

তিনি বললেন ঃ তোমাদের দুটি দলই (মুহাজির ও আনসার) নিজেদের মর্যাদা,

সম্মান এবং প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা সম্পর্কে কথা বলেছো। তাই আমি তোমাদের দুই দলের কাছেই জানতে চাই যে ঃ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা কি কারণে তোমাদেরকে এই মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন?"

উভয় দলই বলল ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহ্লে বাইতের অস্তিত্বের কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে এই পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

ইমাম আলী (আঃ) ঃ সত্য বলছো, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাত পাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের এই নবুওয়াতী বংশের কারণেই? আমার চাচাত ভাই মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি ও আমার খানদান হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর আগে আল্লাহ্ দরবারে নূর অবস্থায় ছিলাম, তারপর আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ নূরকে সর্বদা বংশ পরম্পরায় পবিত্র গর্ভে স্থান দিয়েছেন। যা কখনই কোন অপবিত্রতা এই নূরকে স্পর্শ করতে পারবে না বা স্পর্শ করার কোন পথও খোলা নেই। অতঃপর আলী (আঃ) নিজের ফযিলত সম্পর্কে কিছু বর্ণনা তুলে ধরলেন এবং উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন আমি যা বলছি তা কি সত্য, না সত্য নয়? উপস্থিত সকলেই একযোগে সাক্ষ্য দিলো যে, এর সবগুলোই সত্য এবং রাসূলে খোদা (সাঃ)

তাঁর ব্যাপারে এসব ফযিলত উল্লেখ করেছিলেন।

তিনি আরো বললেন ঃ "তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি যারাই তোমাদের মধ্যে আমার খেলাফতের ব্যাপারে রাসূলের (সাঃ) নিকট থেকে যা শুনেছো তারা উঠে দাড়াও এবং সাক্ষ্য দাও"।

এ সময় কয়েকজন যেমন ঃ আবুযার, সালমান, মিকাদাদ, আ'ম্মার, যাইদ ইবনে আরকাম, বোরা' ইবনে আ'যেব উঠে দাড়িয়ে বললেন ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ ব্যাপারে রাসূলে খোদার (সাঃ) বক্তব্যকে স্মরণে রেখেছি এভাবে; যখন তিনি মিম্বারের উপরে ছিলেন এবং আপনি তাঁর পাশে ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদের ইমাম ও আমার প্রতিনিধি ও ওয়াসি এবং আমার পরে আমার কাজের দায়িত্ব গ্রহণকারীকে (যার নির্দেশ মেনে চলাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ওয়াজিব (ফরজ) করেছেন) নিয়োগ করবো.........হে মানব সকল! আমার পরে তোমাদের ইমাম, মাওলা ও পথ নির্দেশক হবে আমার ভাই আলী (আঃ)।

وَ هُوَ فِيْكُمْ بِمَنْزِلَتِي فِيْكُمْ فَقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ وَ اَطِيعُوهُ فِي جَمِيعِ اُمُورِكُمْ......

"আর তোমাদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা অনুরূপ আমার মর্যাদার সমতুল্য। নিজের দ্বীনের জন্য তাঁর আনুগত্য করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর

নির্দেশ মেনে চলবে"[১]।

এরূপে ইমাম আলী (আঃ) ঐ মুনাযিরাতে উপস্থিত সকলের মধ্যে নিজের ইমামত ও উপযুক্ততার ব্যাপারে দলিল উপস্থাপন করেন এবং তাদের উপর নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেন।

---

[১]। ইশতিবাস ও আল্ গাদীর থেকে সংকলন, খণ্ড-১, পৃঃ-১৬৩ থেকে ১৬৬ পর্যন্ত। ফারাইদুস সিমতাইন, ৭৮ অধ্যায়ের প্রথম দিকে।

১০- মুয়া'বিয়ার রাজনৈতিক চক্রান্তের জবাব

'আম্মার ইয়াসির' নবীর (সাঃ) একজন উচ্চ মানের সাহাবা ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবীর (সাঃ) পরে আলীকে (সাঃ)

অনুসরণের মাধ্যমেই পথ চলেছেন। আর এরূপে পথ চলতে চলতে সিফ্ফিনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

নবী (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ (একদল অত্যাচারী জালিম তোমাকে হত্যা করবে)।

এই কথাটি মুসলমানগণ শুনেছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছিল যে, নবী (সাঃ) আম্মারের শান বা মর্যাদায় এরূপ বলেছেন।

এ ঘটনার অনেক বছর পরে আলীর (আঃ) খেলাফতের সময় তাঁর সৈন্য দলের সাথে মুয়া'বিয়ার সৈন্য দলের যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধটি সিফ্ফিনের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এই যুদ্ধে 'আম্মার ইয়াসির' আলীর (আঃ) সৈন্য দলের মধ্যে ছিলেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অনেক হতাহতির পর মুয়া'বিয়ার সৈন্য দলের হাতে তিনি শহীদ হন।

যারা সেদিন সন্দেহের মধ্যে ছিল যে, এই দুই দলের মধ্যে কে সত্যের পথে আলী না মুয়া'বিয়া, তারা 'আম্মার ইয়াসিরের' শাহাদতের ঘটনা থেকে নবীর (সাঃ) বক্তব্য অনুসারে বুঝতে পেরেছিল যে মুয়া'বিয়ার সৈন্য দল হচ্ছে অত্যাচারী জালিম। কেননা 'আম্মারকে' হত্যা করেছে। সুতরাং স্বয়ং মুয়া'বিয়াও হচ্ছে অত্যাচারী, জালিম ও বাতিল।

এমতাবস্থায় মুয়া'বিয়া দেখলো যে, এই ঘটনা তার সৈন্য দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এবং এর ফলে সৈন্য দল দুর্বল হয়ে যেতে পারে, তাই সে ততক্ষণাৎ তার কাজের একটি ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মধ্যে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করতে চাইলো এভাবে ঃ 'আমি আম্মারকে হত্যা করিনি তাকে আলী হত্যা করেছে। কেননা আলী যদি তাকে আমার সাথে যুদ্ধ করতে না পাঠাতো তবে সে নিহত হত না!!' এই ভুল ব্যাখ্যাটিকে অন্যরা বুঝতে না পেরে বিশ্বাস করে নিল।

ইমাম আলী (আঃ) এই ভুল ব্যাখ্যার বিপরীতে একটি উপযুক্ত জবাব পেশ করলেন ঃ "যদি মুয়া'বিয়ার কথা ঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় যে, হযরত হামযা ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের হাতে কতল হননি, তাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কতল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ্) কেননা তিনিই তো তাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন"।

আমরু আ'সের ছেলে আব্দুল্লাহ্ এই জবাবটিকে মুয়া'বিয়ার নিকট পৌছালে সে

এতই রাগান্বিত হয়েছেলি যে, আমরু আ'সকে ডেকে বলল 'তোর অপদার্থ ছেলেকে এই স্থান থেকে বের করে দে!' (এটাও ছিল এক ধরনের মুনাযিরা যাতে শত্রুর নাক কাটা গিয়েছিল)[১]।

---

[১]। আ'ইয়্যানুশ শিয়া, খণ্ড-৪২, পৃঃ-২১৫।

১১- এক বৃদ্ধের সাথে ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) মুনাযিরা এবং তাকে নাজাত দান

কারবালার সেই হৃদয় বিদারক ঘটনার পরে যখন ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করে দামেস্কে আনা হল তখন শামের অধিবাসী এক বৃদ্ধ ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বলল ঃ 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই জন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং তোমাদের শহরের জনগণকে তোমাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, সাথে সাথে আমিরুল মু'মিন ইয়াযিদকে তোমাদের উপর কর্তৃত্বশালী করেছেন'।

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এই বৃদ্ধকে (যে ছিল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ) এরূপ বললেনঃ

তিনি ঃ হে বয়োবৃদ্ধ কোরআন পড়েছো কি?

বয়োবৃদ্ধ ঃ পড়েছি।ইমাম ঃ এই আয়াতের অর্থটি কি খুব ভালভাবে বুঝেছো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন ঃ

(قُل لاَ اَسئَلُكُم عَلَيهِ اَجراً اِلاّ المَوَدَّةَ فِي القُربَى)

(বল হে আমার রাসূল, তোমাদের কাছে আমার পরিবারের ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন পারিশ্রমিক চাইনা) [১]।

বয়োবৃদ্ধ ঃ হ্যা,পড়েছি।

ইমাম ঃ এই আয়াতে উল্লেখিত রাসূলের (সাঃ) পরিবার আমরাই ।

হে বয়োবৃদ্ধ এই আয়াতটি পড়েছ কি যেখানে বলা হচ্ছে ঃ

(اتِ ذا القُربَى حَقَّهُ)

(পরিবারবর্গের যে অধিকার আছে তাদেরকে তা দাও) [২]।

বয়োবৃদ্ধ ঃ হ্যা পড়েছি।

ইমাম ঃ আমরাই সেই পরিবার, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নবীকে যাদের অধিকার দিতে বলেছেন। তুমি খোমছের আয়াতটি পড়েছ কী?

(وَ اعلَمُوا اَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُربَى)

(মনে রেখ! যাকিছু উপার্জন করবে তার পাচের এক অংশ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র নবী এবং তাঁর পরিবারের)[৩]।

---

[১]। সুরা শুরা, আয়াত - ২৩।

[২]। সুরা ইসরা, আয়াত - ২৬।

[৩]। সুরা আনফাল, আয়াত - ৪০ ।

বয়োবৃদ্ধ ঃ হ্যা পড়েছি।

ইমাম ঃ তাত্হীরের এই আয়াতটি পড়েছ কি?

(اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذهِبَ عَنكُم الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطَهِّرَكُم تَطهِيراً)

(আল্লাহ্ শুধুমাত্র এটাই চান যে, হে আহ্লে বাইত তোমাদেরকে গোনাহ্ থেকে দূরে রাখতে ও সম্পূর্ণভাবে পাক পবিত্র করতে)[১]।

বয়োবৃদ্ধ লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল এবং সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরে অতীত ব্যবহারের জন্য লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল। কিছু সময় চুপ করে থেকে ইমামের কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে, 'সত্য সত্যই কি তোমরা তারা'?

ইমাম ঃ "আল্লাহ্ এবং আমার পূর্বপুরুষ রাসূলে খোদার (সাঃ) কসম যে, আমরাই সেই পরিবার"।

বয়োবৃদ্ধ লোকটি তার হাত দু'টি আকাশের দিকে উচু করে তিনবার বলল ঃ হে আল্লাহ্ তওবা করছি। তোমার নবী ও তাঁর পরিবারের সাথে শত্রুতার জন্য তওবা করছি। আর তাদের কতল করাতে আমি অসন্তুষ্ট। আমি এর আগেও কোরআন পড়েছিলাম কিন্তু এই সত্যকে জানতাম না[২]।

বয়োবৃদ্ধের তওবা করার এই ঘটনাটি ইযাযিদের কানে পৌছালে সে এই ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি সত্যকে জেনে শাহাদত বরণ করলো[৩]।

---

[১]। সুরা আহযাব, আয়াত - ৩৩ ।

[২]। ইহতিজাজে তাবরাসী, পৃঃ - ১৬৭ ।

[৩]। লোহুফ সাইয়্যেদ ইবনে তাউউস, পৃঃ-১৭৭-১৭৮।

১২- ইমাম সাদিকের (আঃ) সাথে মুনাযিরার পরে একজন নাস্তিক (খোদা অবিশ্বাসী) মুসলমান হয়

আব্দুল মালেক নামে এক ব্যক্তি মিশরে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার ছেলের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। (তাই তাকে আবু আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্র পিতাও বলা হতো)। আল্লাহ্র উপর তার কোন বিশ্বাস ছিল না এবং সে বলতো এই পৃথিবী নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। সে জানতে পেরেছিল যে, শিয়াদের নেতা হযরত ইমাম সাদিক (আঃ) মদীনায় জীবন-যাপন করেন। সে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো এই লক্ষ্যে যে, আল্লাহ্ পরিচিতি ও তাঁর সম্পর্কে ইমামের সাথে মুনাযিরা করবে। মদীনায় এসে সে ইমামের খোজ করলো। কেউ তাকে বলল ঃ 'তিনি হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গিয়েছেন'। সে এই কথা শুনে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হল। মক্কায় পৌছে কা'বার অতি নিকটে ইমামকে তাওয়াফ করতে দেখলো। সে তাওয়াফকারীদের সারীর মধ্যে প্রবেশ করলো। তাওয়াফ করতে করতে সে ইমামকে (অবমাননা সুলভ আচরণ করে) ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দেয়। ইমাম অত্যন্ত শান্তভাবে তাকে বললেন ঃ তোমার নাম কি?

সে ঃ আব্দুল মালেক (সুলতানের বান্দা)।

ইমাম ঃ ডাক নাম কি?

সে ঃ আবু আব্দুল্লাহ্ (খোদার বান্দার পিতা)।

ইমাম ঃ " তুমি যে মালিকের (বাদশাহ্) বান্দা (যা তোমার নাম থেকে বুঝা যাচ্ছে) সে কি যমিনে বাদশাহ্ না আসমানের? আর তোমার (ডাক নাম অনুসারে) ছেলে তো খোদার বান্দা, তাহলে বল দেখি সে কি আসমানী খোদার বান্দা না যমিনের? যে উত্তরই তুমি দিবে তাতেই তুমি পরাজিত হবে"।

আব্দুল মালেক কিছু বলল না। হিশাম ইবনে হাকাম ইমামের এক বিজ্ঞ ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল, সে আব্দুল মালেককে বলল ঃ 'ইমামের কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন'?

আব্দুল মালেক হিশামের কথায় চৈতন্য ফিরে পেল। তার চেহারার রং পাল্টে গিয়েছিল।

ইমাম অত্যন্ত নরমভাবে তাকে বললেন ঃ অপেক্ষা কর আমার তাওয়াফ শেষ হোক। তাওয়াফ শেষে আমার কাছে আসবে আমরা দু'জন আলোচনা করবো। যখন ইমাম তওয়াফ শেষ করলেন, সে ইমামের কাছে আসলো এবং তাঁর সম্মুখে বসলো। ইমামের একদল ছাত্রও সেখানে উপস্থিত হলো। তারপর ইমাম ও তার মধ্যে আলোচনা শুরু হল এরূপে ঃ

ইমাম ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এই পৃথিবীর, এই যমিনের উপর-নিচে, বাহ্যিকতা ও আভ্যন্তরিণতা আছে?

সে ঃ হ্যাঁ।

ইমাম ঃ তুমি কি কখনো যমিনের নিচে গিয়েছো?

সে ঃ না।

ইমাম ঃ তাহলে কিভাবে যমিনের নিচের খবর সম্পর্কে জান?

সে ঃ যমিনের নিচের বিষয়ে কোন খবর জানি না। তবে মনে করছি সেখানে কোন কিছুই নেই।

ইমাম ঃ সন্দেহ ও ধারনা হচ্ছে একধনের বিপথগামীতা। যখন তুমি কোন কিছুর উপর ইয়াকিন (বিশ্বাস) স্থাপন করতে পার না তখন সন্দেহ বা ধারনার বশবর্তী হয়ে কিছু বলবে না। এরপর ইমাম বললেন ঃ তুমি কি আসমানের উপরে গিয়েছো?

সে ঃ না।

ইমাম ঃ তুমি কি আসমানের বিষয়ে কিছু জান বা জান কি সেখানে কি আছে?

সে ঃ না।

ইমাম ঃ বিস্ময় সূচক শব্দ ব্যবহার করে বললেন, তুমি না পশ্চিমে গিয়েছো না পূর্বে, আর না যমিনের নিচে গিয়েছো না আসমানের উপরে, আর না আসমান ভেদ করেছো যে জানবে সেখানে কি আছে। এতসব বিষয়ে অজ্ঞ থাকা সত্বেও তুমি খোদার প্রতি অবিশ্বাসী (তুমি তো উপর ও নিচের অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং তাদের পরিচালনকারী যে খোদা সে সম্পর্কেও অজ্ঞ, তাহলে কিভাবে তাঁর অবিশ্বাসী হলে?) বিবেকবান কোন ব্যক্তি যে বিষয়ে জ্ঞাত নয় সে বিষয়কে কি অস্বীকার করে?"

সে ঃ এ পর্যন্ত আমার সাথে কেউ এরূপে কথা বলে নি এবং কেউ আমাকে এরূপে চিন্তা করার পরিস্থিতিও সৃষ্টি করে নি।

ইমাম ঃ সুতরাং তোমার এ সকল বিষয়ের প্রতি সন্দেহ রয়েছে যে, এমন কিছু আসমানের উপরে এবং যমিনের নিচে আছে না নেই?

সে ঃ হ্যাঁ, হয়তো এমনই। (এরূপে সে অবিশ্বাসের পর্যায় থেকে সন্দেহের পর্যায় নেমে আসে)।

ইমাম ঃ যে ব্যক্তি কিছুই জানে না সে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপর কোন দলিল ও

যুক্তি আনতে পারে না।

হে মিশরী ভাই! আমার কাছ থেকে শুনে শিক্ষা অর্জন কর। আমরা কখনই আল্লাহ্ অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ করি না। তুমি কি সূর্য, চন্দ্র, রাত ও দিনকে দেখ না যে, সূর্য উদয় হয় এবং বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট পথে ঘুরতে থাকে বা পুনরায় ফিরে আসে। আর তারা তাদের চলার পথে বাধ্য। এখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি ঃ যদি সূর্য ও চন্দ্রের চলে যাওয়ার শক্তি থাকতো (ইচ্ছাকৃতভাবে), তাহলে কেন ফিরে আসে? আর যদি নিজেদের চলার পথে বাধ্য না থাকে তবে কেন রাত দিন হয়ে যায় না এবং দিনই বা কেন রাত হয়ে যায় না?

ভাই আমার! আল্লাহ্র কসম, তারা তাদের চলার পথে বাধ্য। আর যিনি তাদেরকে তাদের চলার পথে বাধ্য করেছেন তিনি তাদের নির্দেশক ও পরিচালনকারী।

সে ঃ সত্য বলছেন।

ইমাম ঃ বল দেখি, যার উপর তুমি বিশ্বাসী বা যার (দাহ্র অর্থাৎ যমনা বা কালের) উপর ধারনা করছো যে, সে এই কিছুর পরিচালক এবং মানুষকে নিয়ে যায়; তাহলে কেন সে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয় না আর যদি ফিরিয়ে দেয় তাহলে কেন নিয়ে যায় না?

হে মিশরের অধিবাসী! সব কিছুই তাদের নিজ নিজ কাজে বাধ্য এবং তা থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। কেন আসমান ঐ উপরে এবং কেন যমিন এই নিচে অবস্থিত? কেন আসমান যমিনের উপর ভেঙ্গে পড়ছে না? আর কেনই বা এই পৃথিবীর সব কিছুই এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে না?!

(যখন ইমামের উপযুক্ত দলিল ভিত্তিক আলোচনা এ পর্যায়ে পৌছালো, আব্দুল মালেক তখন নিজেকে সন্দেহের অবস্থান থেকে সরিয়ে ঈমানের পর্যায় অবস্থান করলো)।

ইমামের উপস্থিতিতে ঈমান আনলো এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র প্রতি সাক্ষ্য দিলো। সাথে সাথে স্পষ্ট করে বলল ঃ 'তিনিই হচ্ছেন খোদা বা পারওয়ারদিগার যিনি আসমান ও যমিনের সব কিছুরই নির্দেশক এবং তাদেরকে টিকিয়ে রেখেছেন'।

'হুমরান' নামে ইমামের অন্য আরেক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল, সে ইমামের দিকে ফিরে বলল ঃ "আপনার তরে আমার জীবন উৎসর্গীত, আজ যেমনভাবে এই খোদা অবিশ্বাসী লোকটি আপনার হাতে ঈমান আনলো বা মুসলমান হল, সেদিন অনুরূপভাবেই কাফেররাও আপনার পিতা রাসূলে খোদার (সাঃ) হাতে ঈমান এনেছিল"।

নব মুসলমান আব্দুল মালেক ইমামের কাছে নিবেদন জানালো যে, "আপনি আমাকে আপনার ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করুন"!

ইমাম সাদিক (আঃ) হিশাম ইবনে হাকামকে বললেন ঃ "আব্দুল মালেককে তোমার নিজের কাছে নিয়ে যাও এবং ইসলামী আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দাও"।

হিশাম, সে ছিল একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি আগে থেকেই শাম ও মিশরের লোকদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করতো, আব্দুল মালেককেও তার পাঠশালায় নিয়ে গেল। উসূল, আক্বায়েদ (আক্বীদাগত বিষয়) এবং ইসলামী আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দান করলো যাতে করে সে পরিশুদ্ধ আক্বীদা ভিত্তিক হতে পারে। আর হিশাম তাকে এমনভাবে শিক্ষা দান করলো যে, ইমাম তাতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন[১]।

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-৭২, ৭৩।



১৩- উপায়হীন ইবনে আবিল আ'উযা

আব্দুল কারিম, সে 'ইবনে আবিল আ'উযা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। একদিন ইমাম সাদিকের (আঃ) সাথে মুনাযিরা করার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলো একদল লোক সেখানে উপস্থিত। তাই ইমামের নিকটবর্তী স্থানে চুপ করে বসে থাকলো।

ইমাম ঃ "তোমার এখানে আসার কারণ হচ্ছে যে, যে বিষয়সমূহ তোমার ও আমার মধ্যে আলোচিত হচ্ছিল তা অব্যাহত দেয়া এমনটাই নয় কি?

সে ঃ হ্যাঁ, আমি এই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি হে নবীর (সাঃ) সন্তান।

ইমাম ঃ তোমার কথায় আমি আশ্চার্য হই একারণে যে, তুমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর না কিন্তু আবার সাক্ষ্য দিচ্ছ যে আমি রাসূলের (সাঃ) পুত্র এবং বলছো হে নবীর (সাঃ) সন্তান।

সে ঃ অভ্যাস আমাকে এমনভাবে বলতে শিখিয়েছে।

ইমাম ঃ তাহলে কেন চুপ করে বসে আছ?

সে ঃ আপনার শান ও মর্যাদা আমাকে আপনার সম্মুখে কথা বলতে বাধা দেয়। কেননা আমি তো ঐ পর্যায়ের নই। আমি অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখেছি এবং তাদের সাথে কথাও বলেছি কিন্তু যে শান ও মর্যাদা আপনার ভিতর পরিলক্ষিত হয় তা অন্য কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

ইমাম ঃ যেহেতু তুমি কিছু বলছো না, তাই আমিই শুরু করলাম। তিনি তাকে বললেন ঃ "তুমি কি তৈরীকৃত না তৈরীকৃত নও?"

সে ঃ না, আমি তৈরীকৃত নই।

ইমাম ঃ বল দেখি, যদি তৈরীকৃত হতে তাহলে কেমন হতে?

সে বেশ কিছু সময় চুপ করে থাকলো এবং তার পাশে কাঠের যে অংশটি পড়ে ছিল তা হাতে নিয়ে কয়েকবার নাড়া-চাড়া দিয়ে তৈরীকৃত বস্তুর বিশেষণসমূহকে বর্ণনা করলো ঃ লম্বা, চওড়া, গভীর, খাট, নড়া-চড়া করে, নড়া-চড়াহীন ও .... এগুলো সবই হচ্ছে তৈরীকৃত বস্তুর বিশেষত্ব।

ইমাম ঃ যেহেতু এগুলো ব্যতীত তৈরীকৃত বস্তুর অন্য কোন বিশেষণ সম্পর্কে অবগত নও সেহেতু জেনে রাখ যে, তুমি নিজেও তৈরীকৃত এবং নিজেকে অবশ্যই তৈরীকৃত ভাববে। কেননা এ সকল বিশেষণ তোমার মধ্যে প্রতিনিয়ত নতুনরূপে দেখতে পাবে।

সে ঃ আপনি আমার কাছে এমন একটি প্রশ্ন করেছেন যা আগে কেউ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ করবে না।

ইমাম ঃ ধরে নিচ্ছি যে, আগে তোমার কাছে এমন প্রশ্ন কেউ করেনি কিন্তু কিভাবে জানলে যে ভবিষ্যতেও কেউ এ ধরনের প্রশ্ন তোমার কাছে করবে না? আর এ কথা বলাতে তুমি ত্রুটি করছো। কেননা তুমি বিশ্বাস কর যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কিছুই সমান। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে কোন কিছুকে প্রথম এবং কোন কিছুকে শেষ মনে করছো আর কথা বলার সময় অতীত ও ভবিষ্যৎ শব্দ ব্যবহার করছো কিভাবে?

হে আব্দুল কারিম! আরো ব্যাখ্যা দিলে বলবো, তোমার যদি একটি হামীয়া'ন (লম্বা ফিতাযুক্ত টাকার থলি যা কোমরে বাঁধা হয়) পূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রায় ভর্তি থাকে আর কেউ যদি বলে যে, ঐ হামীয়া'নের মধ্যে কি স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে? সেক্ষেত্রে তুমি কি বলবে যে, না এর মধ্যে কিছুই নেই। সে যদি তোমাকে স্বর্ণ মুদ্রা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে বলে, আর তোমার যদি স্বর্ণ মুদ্রার ব্যাখ্যা জানা না থাকে তবে এই ব্যাখ্যা জানা না থাকার করণে কি তুমি বলতে পার যে, এর মধ্যে কিছুই নেই?

সে ঃ না, ব্যাখ্যা জানা না থাকার করণে বলতে পারবো না যে এর মধ্যে কিছুই নেই।

ইমাম ঃ পৃথিবীর ব্যাপকতা একটি হামীয়া'নের থেকে অনেক অনেক গুনে বেশী। এই যে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি এই পৃথিবীতে আশ্রয় নিয়েছো তৈরীকৃত বস্তু হিসেবে। কারণ তুমি তৈরীকৃত বস্তু এবং অতৈরীকৃত বস্তুর মধ্যের বিশেষণ সম্পর্কে অবগত নও।

যখন আলোচনা এ পর্যায়ে পৌছাল তখন সে দারুণভাবে উপায়হীন হয়ে পড়লো এবং চুপ হয়ে গেল। তার পাশে বসে থাকা অনেকেই এই আলোচনার পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং অনেকেই পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ কাফের অবস্থায় রয়ে গেল[১]।

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-৭৬, ৭৭।

১৪- ইবনে আবিল আ'উযার সাথে তৃতীয় দিনের মুনাযিরা

উল্লেখিত আলোচনার তৃতীয় দিনে ইবনে আবিল আ'উযা সিদ্ধান্ত নিল যে, ইমাম সাদিকের (আঃ) সাথে নিজেই মুনাযিরা শুরু করবে এবং তা অব্যাহত দিবে। সে ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'আজ আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই'।

ইমাম ঃ "যা কিছু জানতে চাও জিজ্ঞাসা কর"।

সে ঃ কোন দলিলের ভিত্তিতে এই পৃথিবী নতুন, অর্থাৎ আগে এর অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে কিভাবে অস্তিত্বে আসলো?

ইমাম ঃ যে কোন ছোট এবং বড় জিনিষকে কল্পনা কর, যদি তার সাথে অনুরূপ কোন জিনিষ একত্র কর তাহলে তা পূর্বের তুলনায় বৃহত হয়ে যাবে। আর এটাই হচ্ছে কোন জিনিষের প্রথম অবস্থা (ছোট অবস্থা) থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় (বৃহত অবস্থায়) পরিবর্তন হওয়া এবং নতুন হওয়ার অর্থও হচ্ছে এটাই। যদি ঐ জিনিষ কাদিম (পুরাতন বা অন্তিম বা আদিকাল থেকে) হয় (অর্থাৎ প্রথম থেকেই ছিল এমন) তাহলে অন্য রূপ পরিগ্রহ করবে না। কেননা যে সকল জিনিষ নিঃশেষ হয়ে যায় অথবা রূপ পবির্তন করে তারা পুনরায় অস্তিত্ব পাওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং সাথে সাথে ধ্বংস হওয়ারও। সুতরাং ধ্বংস অথবা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তা হাদিস (নতুন) হতে শুরু করে। যদি তা শুধুমাত্র কাদিম (পুরাতন বা অন্তিম বা আদিকাল থেকে) হত তাহলে তা বড় হওয়ার জন্য পবিবর্তন হত বা নতুন হত (এটাই হচ্ছে কোন জিনিষের পুরাতন হওয়ার ব্যাখ্যা)। আর একটি জিনিষ কখনই একই সঙ্গে নতুন ও পুরাতন এবং
চিরন্তণ ও অস্তিত্বহীন হতে পারে না।

সে ঃ যদি ধরেও নেই যে, অতীতে ও ভবিষ্যতে ছোট ও বড় হওয়াটা এরূপই যা আপনি বয়ান করেছেন (এ পৃথিবীর নতুন হওয়াটা)। কিন্তু যদি সমস্ত কিছুই ছোট অবস্থায় থেকে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে সেগুলো নতুন হওয়ার ব্যাপারে আপনার দলিল কি?

ইমাম ঃ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এই পৃথিবীতেই রয়েছে (যা প্রতিনিয়ত রূপ পবিবর্তন করছে)। এখন যদি এই পৃথিবীর স্থানে অন্য এক পৃথিবীর কথা চিন্তা করি এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্থির করি, তাহলে সেক্ষেত্রেও একটি পৃথিবী ধ্বংস

হয়ে এক নতুন পৃথিবী তার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর এটাই হচ্ছে নতুন হওয়ার অর্থ। আর যখন তুমি এরূপ মনে করছো যে (প্রতিটি জিনিষ যদি ছোট অবস্থায় থেকে যায়) তার উত্তর হচ্ছে এরূপ ঃ যদি ধরেও নেই যে, প্রতিটি ছোট জিনিষ তার নিজের স্থানে ছোট থেকেই যাচ্ছে; তবে তো এই ধরে নেয়া ও মনে করার জগতে এটাই সঠিক যে, প্রতিটি ছোট জিনিষের সাথে অনুরূপ কোন ছোট জিনিষকে একত্রিত করা সম্ভব। আর এই দুটি ছোট জিনিষকে একত্রিত করার ফলে তা বড় রূপ ধারন করবে। আর এই যে তা বড় রূপ ধারন করেছে এরূপ কল্পনা করাও সঠিক। আর এই যে তা বড় রূপ ধারন করেছে এরূপ কল্পনা করাটাই হচ্ছে এক রূপের পরিবর্তীত রূপ যা নতুন হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণ করে। হে আব্দুল কারিম! এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তোমার আর কোন যুক্তি থাকার কথা নয়[১]।

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-৭৭।

১৫- ইবনে আবিল আ'উযার হটাৎ মৃত্যু

ইমাম সাদিকের (আঃ) সাথে উল্লেখিত মুনাযিরার এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরের বছরে সে পুনরায় কা'বার পাশে ইমামের নিকটবর্তী হলে ইমামের একজন ভক্ত তাঁকে বলল ঃ 'হে ইমাম! ইবনে আবিল আ'উযা কি মুসলমান হয়েছে'?

ইমাম ঃ তার অন্তর ইসলামের ব্যাপারে অন্ধ। সে মুসলমান হবে না।

ইমামের নূরানী চেহারা তার দৃষ্টিগোচর হতেই সে বলল ঃ 'এই যে আপনি, আমার মাওলা!'

ইমাম ঃ কেন এখানে এসেছো?

সে ঃ দেশের রছম-রেওয়াজ ও আইন-কানুন এবং নিজের ইচ্ছায় যাতে করে মানুষের পাগলামো, ন্যাড়া হওয়া ও পাথর ছোড়াকে (যা হাজ্জ মৌসুমে পালন করে থাকে) দেখবো।

ইমাম ঃ তুমি এখনো সেই ভুল পথেই বিদ্যমান রয়েছো?

সে কথা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম তাকে বললেন ঃ হজ্জ মৌসুমে মুনাযিরা এবং উগ্রো হওয়াটা জায়েয নয়। ইমাম তাঁর গায়ের আ'বাটি ঝেড়ে বললেন ঃ যদি সত্য এটাই হয়ে থাকে যার উপর আমরা বিশ্বাসী -যদিও এটা ছাড়া কোন সত্যই নেই এবং একমাত্র সত্য এটাই-সেক্ষেত্রে আমরাই হচ্ছি পুরস্কৃত না তুমি। আর যদি সত্য তোমার পক্ষে থাকে -যদিও এমনটি নয় বা তোমার সাথে নেই- তবুও আমরা এবং তুমি উভয়ই পুরস্কৃত হব। সুতরাং যে কোন দিক দিয়েই আমরা পুরস্কৃত। কিন্তু তুমি এ দুটি পথের মধ্যে একটিতে। আর যদি তা সত্য না হয় তবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এ পর্যায়ে তার অন্তর নাজুক অবস্থায় পতীত হলে আশে পাশের সকলের দিকে ফিরে বলল ঃ আমার অন্তর ব্যাথা করছে, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যখন তাকে ফিরিয়ে আনা হলো তখন দেখা গেল যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন[১]।

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-৭৮।

১৬- হিশামের সাথে মুনাযিরার ফলশ্রুতিতে আব্দুল্লাহ্ দাইছানির ইসলাম ধর্ম গ্রহণঃ

হিশাম, ইমাম সাদিকের (আঃ) একনিষ্ট ও অভিজ্ঞ ছাত্র ছিল। একদিন আব্দুল্লাহ্ দাইছানির সাথে -যে ছিল খোদা অবিশ্বাসী- হিশামের

দেখা হলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তোমার কি খোদা আছে?

হিশাম ঃ হ্যাঁ।

সে ঃ তোমার খোদা কি শক্তিমান?

হিশাম ঃ হ্যাঁ, তিনি শাক্তিমান এবং সকল কিছুর উপর কর্তৃত্ব রাখেন।

সে ঃ এ বিশাল পৃথিবীকে একটি মুরগীর ডিমের মধ্যে আনার ক্ষমতা কি তোমার খোদার আছে তবে পৃথিবীও ছোট হবে না আর মুরগীর ডিম বড় হবে না?

হিশাম ঃ এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমাকে সময় দাও।

সে ঃ এক বছর সময় তোমাকে দিলাম।

হিশাম ইমাম সাদিকের (আঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'হে রাসূলে খোদার (সাঃ) সন্তান! আব্দুল্লাহ্ দাইছানি আমার কাছে এসে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে যার উত্তর দেয়ার জন্য আল্লাহ্ ও আপনি ব্যতীত অন্য কেউ আমার অবলম্বন নেই'।

ইমাম ঃ সে কি প্রশ্ন করেছে?

হিশাম ঃ সে বলেছে, এ বিশাল পৃথিবীকে একটি মুরগীর ডিমের মধ্যে আনার ক্ষমতা কি তোমার খোদার আছে তবে পৃথিবীও ছোট হবে না আর মুরগীর ডিম বড় হবে না?

ইমাম ঃ হে হিশাম! তুমি কয়টি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট?

হিশাম ঃ আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট (দৃষ্টিগত, কর্ণগত, জিহ্বাগত, স্পর্শগত ও নাসিকাগত)।

ইমাম ঃ কোনটি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছোট?

হিশাম ঃ দৃষ্টিগত।

ইমাম ঃ চোখের মনির পরিমাপ কতটুকু?

হিশাম ঃ একটি মুগ ডালের পরিমানে।

ইমাম ঃ হে হিশাম! তোমার মাথার উপরে ও সামনে লক্ষ্য কর এবং আমাকে বল কি দেখতে পাচ্ছ?

হিশাম এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল ঃ 'আসমান, যমিন, বাড়ী, প্রাসাদ, মরুভূমি, পাহাড় ও নদী দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম ঃ যে ক্ষমতাবান আল্লাহ্ ঐ সমস্ত কিছুকে তাদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া সত্বেও তোমার মুগ ডালের পরিমানে এক চোখের মনির মধ্যে স্থান দিয়েছেন, সে আল্লাহ্ অবশ্যই এই পৃথিবীকে একটি মুরগীর ডিমের মধ্যে স্থান দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে না পৃথিবী ছোট হয়ে যাবে আর না মুরগীর ডিমের আয়াতন বৃদ্ধি পাবে।

এমন উত্তর শোনার পর হিশাম নিচু হয়ে ইমামের পায়ে চুম্বন দিয়ে বলল ঃ 'হে রাসূলে খোদার (সাঃ) সন্তান! এই উত্তরটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট'।[১]

হিশাম নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। পরের দিন আব্দুল্লাহ্ তার কাছে এসে বলল ঃ আমি শুধুমাত্র তোমাকে সালাম জানাতে এসেছি, ঐ প্রশ্নের উত্তর নেয়ার জন্য নয়।

হিশাম বলল ঃ যদি তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর জানতে চাও তবে

এই হচ্ছে তার জবাব (ইমামের দেয়া উত্তরটাই তাকে দিল)।

আব্দুল্লাহ্ দাইছানি এই উত্তর শোনার পরে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে নিজেই ইমাম সাদিকের (আঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করবে। সে ইমামের বাড়ীর দিকে রওনা হল। সেখানে পৌছে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। সে ভিতরে প্রবেশ করে ইমামের সামনে বসে বলল ঃ 'হে জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ! আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে নির্দেশনা দিন।

ইমাম ঃ তোমার নাম কি?

সে কিছু না বলেই উঠে বাইরে চলে গেল। তার বন্ধুরা ঘটনাটি জানার পর তাকে বলল ঃ কেন তুমি তোমার নাম বললে না?

সে বলল ঃ যদি আমি বলতাম যে আমার নাম আব্দুল্লাহ্ (আল্লাহ্র বান্দা) নিঃসন্দেহে তিনি বলতেন, সে কে তুমি তার গোলাম বা বান্দা?

তার বন্ধুরা তাকে বলল ঃ ইমামের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে আল্লাহ্র ব্যাপারে প্রমাণ দিতে বল এবং তাকে বল তিনি যেন তোমার নাম জিজ্ঞাসা না করেন।

---

[১]। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র ক্ষমতা কোন কিছু অসম্ভব বিষয়ের ক্ষেত্রে সম্পর্কহীন। কিন্তু ইমাম এই জবাবে এমনটা বলেছেন যাতে করে সাধারণ মানুষ বুঝে যায়। যেমন, কেউ বলল ঃ আচ্ছা মানুষ কি হাওয়ায় উড়তে পারে? এর জবাবে বলতে হয় যে, হ্যাঁ মানুষ উড়জাহাজ তৈরী করতে পারে এবং তাতে করে হাওয়ায় উড়তে পারে। ইমাম চোখের মনির উদাহরণ দিয়ে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যদি আল্লাহ্র ক্ষমতাকে দেখতে চাও তবে এ সবের মাধ্যমে দেখে নাও। আরও তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এরূপ অহেতুক প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে না। তিনি আল্লাহ্র ক্ষমতা প্রমাণের লক্ষ্যে বলেছেন যে, পৃথিবীকে মুরগীর ডিমের মধ্যে স্থান দেয়া আল্লাহ্র কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তবে তিনি বলেননি যে, আল্লাহ্ এমনটি করবেন। কেননা আল্লাহ্ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি জিনিষেরই নিজ নিজ অবস্থান বিদ্যমান রয়েছে তা কখনই পরিবর্তীত হবে না। কেননা যে বস্তুটি যেখানে প্রযোজ্য তিনি তাদেরকে সেখানেই স্থাপিত করেছেন। যেমন বলা যেতে পারে আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাই বলে কি তিনি ২+২ = ৫ করে দিবেন? এরূপ প্রশ্ন করাও অনর্থক।

দাইছানি ফিরে এলো এবং ইমামের কাছে বলল ঃ আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে বলুন আর দয়া করে আমার নাম জানতে চেয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না।

ইমাম ইশারা করে একটি স্থানে তাকে বসতে বললেন।

আব্দুল্লাহ্ সেখানে বসলো। এমন সময় ইমামের কনিষ্ঠ সন্তানের হাতে একটি মুরগীর ডিম ছিল যা নিয়ে সে খেলা করছিল এবং সেখানে উপস্থিত হল। ইমাম মুরগীর ডিমটি তার কাছ থেকে নিয়ে বললেন ঃ ওহে দাইছানি! এই মুরগীর ডিমের দিকে লক্ষ্য কর, যার কয়েকটি স্তর রয়েছে যেমন ঃ

১- ডিমের এই আবরণটি চারিদিক দিয়ে মজবুতভাবে আটকানো আছে।

২- এই মজবুত বা শক্ত আবরণটির নিচে একটি পাতলা আবরণ রয়েছে।

৩- ঐ পাতলা আবরণের নিচে স্বর্ণালী রংয়ের তরল পদার্থ ও রূপালী রংয়ের গলিত পদার্থ এক সংগে আছে যা

একে অপরের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে না।

৪- আর তা এই অবস্থায় অবশিষ্ট থাকছে এবং এমন কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসছে না যে তার ভাল থাকার খবর দিচ্ছে আর না তার খারাপ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। সাথে সাথে এটার ভিতর পুং না স্ত্রী লিঙ্গ আছে তাও আমরা জানি না। কিন্তু কিছু দিন পর এর ভিতর থেকে যখন বাচ্চা বেরিয়ে আসবে তা হবে বিভিন্ন রংয়ের। তুমি কি এতসব বিস্ময়কর বিষয়ের জন্য কোন পরিচালক বা সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে বলে মনে কর না?

দাইছানি চিন্তার গভীরে পৌছে কিছু সময় নিরব থাকলো। অবশেষে চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বলল ঃ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ তাঁর প্রেরীত রাসূল ও বান্দা। সাথে সাথে আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে ইমাম ও তাঁর প্রতিনিধি। আর আমি আমার অতীতের জন্য অনুতপ্ত ও উদ্বিগ্ন[১]।

---

[১]। উছুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৭৯, ৮০, হাদিস নং- ৪।

১৭- দ্বীত্ববাদে বিশ্বাসীদের প্রতি ইমামের জবাব

(দুই উপাস্যে বিশ্বাসীরা ইমাম সাদিকের (আঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি যুক্তি-দলিল পেশ করতে লাগলো। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস হচ্ছে এরূপ যে, এই পৃথিবীর দু'টি সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। তাদের একজন হচ্ছে ভাল কাজের এবং অন্যজন হচ্ছে খারাপ কাজের........)।

ইমাম তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দু'টি সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে এরূপ বললেনঃ এই যে তোমরা বলছো দু'টি সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর বাইরে অন্য কিছু ভাবা যায় না, যা নিম্নরূপঃ

১- হয় তারা উভয়ই ক্ষমতাবান এবং অনন্ত বা চিরন্তন।

২ -অথবা তারা উভয়ই ক্ষমতাহীন।

৩- তাদের একজন ক্ষমতাবান এবং অন্যজন ক্ষমতাহীন।

প্রথম দৃষ্টিকোণে ঃ যদি তাই হয়, তবে কেন তাদের একজন অন্যজনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে সরিয়ে দিচ্ছে না। যাতে একাই এই পৃথিবীকে পরিচালনা করতে পারে? (পৃথিবীর প্রচলিত নিয়ম-কানুন এটারই প্রমাণ যে, এই পৃথিবীর একটি মাত্র পরিচালক রয়েছে, সুতরাং আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণে ঃ যদি তাই হয়, তবে এটা এক ও অদ্বিতীয় খোদার প্রমাণই দিচ্ছে বা আমাদের কথাকেই যুক্তি সঙ্গত সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই হচ্ছেন খোদা, আর অন্য কোন খোদার অস্তিত্ব নেই, কারণ হচ্ছে ক্ষমতাহীনতা।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণে ঃ যদি তাই হয়, তবে দু'টি খোদাই হচ্ছে ক্ষমতাহীণ। এক্ষেত্রে

তারা কোন একক্ষেত্রে সম্মিলিত এবং অন্য একক্ষেত্রে বিরোধী[১]। আর সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে, তাদের দু'জনের মধ্যে একজন যে বিষয়ের ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে অন্যজন সে বিষয়ের ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে না এবং আরো প্রয়োজন হচ্ছে যে, তাদের দু'জনের অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে একজন আদি ও অন্তের প্রয়োজন যিনি প্রথম থেকেই এই দুই খোদার সাথে থেকেছে। এই হিসেবে একজন তৃতীয় খোদার অস্তিত্ব নেবে আর এরূপভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ খোদা বরং তারও বেশী হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অধিক খোদায় বিশ্বাসী হতে হবে।

হিশাম বলে ঃ তাদের একটি প্রশ্ন ছিল এরূপ যে, যা তারা ইমাম সাদিককে (আঃ) বলেছিল ঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে আপনার দলিল কি?

ইমাম ঃ সৃষ্টিত বস্তুর সব কিছুই এক বাক্যে বলছে তাদের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। যেমনভাবে যখন তুমি একটি বিশাল অট্টালিকা দেখ যে, স্থিরভাবে দৃঢ় চিত্তে দাড়িয়ে রয়েছে তখন তোমার কি মনে হয় না যে এই অট্টালিকার অবশ্যই একজন প্রস্তুতকারক আছে, যদি তুমি সেই প্রস্তুককারককে না দেখেও থাক?

তারা ঃ খোদা কী?

ইমাম ঃ খোদা এমন এক অস্তিত্ব যা অন্য সব অস্তিত্ব থেকে আলাদা। যার কোন শরীর ও অবয়ব নেই, ইন্দ্রিয়ের কোন একটি দিয়েও তাকে অনুভব করা যায় না, কোন কল্পনাতেই তাকে আনা যায় না, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে নেয়া যায় না এবং তার পরিবর্তন সাধন করে না[২]।

---

[১]। কেননা ঐ দু'য়ের মধ্যে বিরোধীতার বিষয়ে ধারনা করা যে কোন দিক দিয়েই ভুল। কেননা দু'টি জিনিষ যদি তারা একই ধারার হয়ে থাকে যেমন অস্তিত্ব থাকা ও বর্তমান থাকা এ দু'টি নিজেদের মধ্যে ঐক্যতা রাখে।

[২]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-৮০, ৮১, হাদীস নং-৫।

১৮- মানছুরের উপস্থিতিতে আবু হানিফার সাথে ইমাম সাদিকের (আঃ) মুনাযিরা

ইবনে শাহ্‌রে আশুব মুসনাদে আবু হানিফা থেকে রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলছেন যে, হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন ঃ আবু হানিফার (হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বা ইমাম) কাছে প্রশ্ন করা হল এ মর্মে যে ঃ 'ফীকাহ্ শাস্ত্রে সব থেকে বিজ্ঞ এমন কোন ব্যক্তিকে এখনো পর্যন্ত দেখছো, যদি দেখে থাকো তবে সে কে'?

আবু হানিফা এই প্রশ্নের উত্তরে বলল ঃ 'ফীকাহ্ শাস্ত্রে সব থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তি হচ্ছেন জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ (ইমাম সাদিক আলাইহি স্‌সালাম)। যখন মানছুর দাওয়ানিকি (দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা) জা'ফার ইবনে মুহাম্মদকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল তখন মানছুর আমার কাছে এমন একটি নির্দেশ পাঠিয়েছিল ঃ

'হে আবু হানিফা! জনগণ অধিক পরিমানে জা'ফার ইবনে মুহাম্মদের মাযহাবের অন্তরভূক্ত হয়ে যাচ্ছে। এমন কোন কঠিন বিষয়

নির্ধারণ কর এবং তার সাথে মুনাযিরা কর যার উত্তর দিতে সে ব্যর্থ হয়, যাতে করে তার মর্যাদায় আঘাত হানে।

আমি চল্লিশটি বিষয় নির্ধারণ করলাম। মানছুর যেহেতু ঐ সময় হিরেহ্ শহরে (কুফা এবং বসরার মধ্যবর্তী স্থান) অবস্থান করছিল তাই সে আমাকে সেখানে ডেকে পাঠালো। আমি তার সম্মুখে উপস্থিত হলাম। দেখলাম ইমাম সাদিক (আঃ) মানছুরের ডান পার্শ্বে বসে আছেন। আমার দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়তেই তাঁর জন্য অন্তরে এমন সম্মান প্রদর্শনের অভিপ্রায় জাগ্রত হল যা মানছুরকে দেখে তেমন হয়নি। মানছুরকে সালাম জানালাম। সে আমাকে ইশারায় বসতে বলল। তারপর ইমামের দিকে ফিরে বলল ঃ 'ইয়া আবা আব্দিল্লাহ্! উপস্থিত এই লোকটি হচ্ছে আবু হানিফা'।

ইমাম বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমি তাকে জানি"।

তারপর মানছুর আমার দিকে ফিরে বলল ঃ 'হে আবু হানিফা! তোমার নির্ধারণকৃত প্রশ্নসমূহকে উত্থাপন কর'।

আমি আমার নিজের প্রশ্নগুলোকে একের পর এক ইমামকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তিনি একের পর এক জবাব দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ এই বিষয়ে তুমি এমন বল, মদীনাবাসী এরূপ বলে। কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমার মতের সাথে মিল ছিল আবার কোন কোন প্রশ্নের উত্তর মদীনাবসীদের মতের সাথে মিল ছিল। আবার কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমাদের দু'পক্ষের কারো মতের সাথেই মিল ছিল না। এরূপভাবে আমার নির্ধারণকৃত চল্লিশটি প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল এবং তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রত্যেকটির উত্তর

বর্ণনা করলেন। তারপর আবু হানিফা বলল ঃ

أَلَيْسَ أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ، أَعْلَمُهُمْ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ

"বিজ্ঞ ও অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কি সেই নয়, যে ব্যক্তি বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে অধিক জানেন"[১]

---

[১] । আনওয়ারুল বাহিয়্যা, পৃঃ-১৫২।

১৯- যে মুনাযিরা নিজেকে খোদা দাবীকারী ব্যক্তিকে আটকে দেয়

ইমাম সাদিকের (আঃ) সময় জো'দ ইবনে দারাহাম নামে এক ব্যক্তি বিদয়া'ত প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম বিরোধী কথা-বার্তা বলে বেশ কিছু লোককে তার অনুসারী করেছিল। অবশেষে ঈদুল আযহার দিনে তাকে ফাঁসী দেয়া হয়।

সে একদিন এক মুষ্টি পরিমান মাটি ও অল্প পানি একটি বোতলের মধ্যে ঢেলে রাখলো। এর কয়েকদিন পরে ঐ বোতলের মধ্যে কীট-পতঙ্গ জন্ম নিল। সে তখন জনসাধারণের মধ্যে এসে এরূপ বলে দাবী জানাল যে, 'এই সমস্ত কীট-পতঙ্গকে আমি সৃষ্টি করেছি, কেননা তাদের জন্মের কারণ হয়েছি, সুতরাং আমিই হচ্ছি তাদের সৃষ্টিকর্তা'।

মুসলমানদের কয়েকজন এই ঘটনাটিকে ইমাম সাদিকের (আঃ) পৌছালে তিনি বলেন ঃ "তার কাছে জিজ্ঞাসা কর যে, ঐ বোতলের মধ্যে কীট-পতঙ্গের সংখ্যা কত? তাদের কতগুলো পুরুষ আর কতগুলো স্ত্রী? তাদের প্রত্যেকটির ওজন কত? আর তাকে ঐ কীট-পতঙ্গগুলোর অবয়ব পরিবর্তন করতে বল, কেননা যে তাদের সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে সে তাদের অবয়ব পরিবর্তনেরও ক্ষমতা রাখে"।

তারা ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে উল্লেখিতভাবে প্রশ্ন তুলে ধরে তার কাছে উত্তর জানতে চাইলো। উল্লেখিত প্রশ্নের কোনটারই সে উত্তর দিতে পারলো না, আর এভাবেই তার সৃষ্টিকর্তার রূপ ধারন করে মানুষের মাঝে বিদয়া'ত প্রসারের ভ্রান্ত ধারনার অবষান ঘটলো[১]।

[১]। সাফিনাতুল বিহার, খণ্ড-১, পৃঃ-১৫৭।



২০- এ জবাবটা কি হিজায থেকে নিয়ে এসেছো?

ইমাম সাদিকের (আঃ) সময়ে আবু সাকের দাইছানি নামে একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল। সে ছিল তৌওহীদ বিরোধীদের সারিতে। সে আলোর খোদা এবং অন্ধকারের খোদায় বিশ্বাসী ছিল। সে সব সময় চেষ্টা করতো যে, আক্বীদাগত আলোচনার মাধ্যমে তার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ইসলামকে ত্রুটিযুক্ত করে মানুষের মাঝে তুলে ধরাই ছিল তার প্রধান কাজ। সে তার নামানুসারে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে যা ছিল দাইছানিয়া নামে পরিচিত। তার ছাত্র ও অনুসারীও ছিল। 'হিশাম ইবনে হাকাম' কিছু সময় তার ছাত্র ছিল। এখানে দাইছানির ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার মধ্যে থেকে একটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবোঃ

সে তার চিন্তামতে কোরআন থেকে অনুধাবনকৃত একটি বিষয় হিশাম ইবনে হাকামকে (যে পরবর্তীতে ইমাম সাদিকের উচ্চ মানের ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে) বললঃ

কোরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যা আমাদের দুই খোদায় বিশ্বাসী হওয়ার পিছনে যুক্তি পেশ করে।

হিশাম ঃ কোন আয়াতের ব্যাপারে বলছো?

সে ঃ এই যে, সূরা যুখরুফের ৮৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

و هو الذي في السماء اله و في الارض اله

"তিনি হচ্ছেন এমন কেউ যিনি আসমানেও মা'বুদ এবং জমিনেও মা'বুদ"

হিশাম ঃ আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম যে, তাকে কিভাবে জবাব দেব। ঐ বছর কা'বা ঘর যিয়ারত করতে গিয়েছিলাম। সেখানে ইমাম সাদিকের (আঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি তাকে জানালাম।

ইমাম বললেন ঃ এমন কথা একজন দ্বীনহীন দুষ্ট ব্যক্তির কথা। হজ্জ মৌসুম শেষ করে যখন তুমি ফিরে যাবে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, কুফায় তোমার নাম কি? যখন সে তার নাম বলবে তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করবে যে, বসরায় তোমার নাম কি? যখন যে পূর্বের নামের পুনরাবৃত্তি করবে তখন তাকে বলবে যে, "আমাদের আল্লাহ্ তা'য়ালাও হচ্ছেন এরূপ যে, আসমানেও তাঁর নাম (ইলাহ্) এবং যমিনেও তাঁর নাম হচ্ছে (ইলাহ)। তদ্রূপ সাগর-মহাসাগরেও, মুরুভূমি এবং যে কোন স্থানেই তিনি হচ্ছেন (ইলাহ্) মা'বুদ।

হিশাম ঃ যখন আমি হজ্জ মৌসুম শেষ করে ফিরে এসেছিলাম

প্রথমেই তার সন্ধানে গিয়েছিলাম। তাকে পেয়ে উপরোল্লিখভাবেই তাকে বললাম, তখন সে বলল ঃ 'এই উত্তটি তোমার নিজের নয়, তুমি এই উত্তরটিকে হিজায থেকে নিয়ে এসেছো' (هذه نقلت من الحجاز) ।

২১- শামের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে ইমাম সাদিকের (আঃ) এক ছাত্রের মুনাযিরাঃ

ইমাম সাদিকের (আঃ) আমলে শামের এক বিজ্ঞ ব্যক্তি মক্কায় ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেকে এরূপে পরিচয় দেয় ঃ

'আমি কালাম, ফীকাহ্ ও ফারায়েয শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শি, এখানে আপনার ছাত্রদের সাথে আলোচনা বা মুনাযিরা করতে এসেছি।

ইমাম ঃ তোমার জ্ঞান কি নবীর (সাঃ) প্রচলিত ধারার না কি তোমার নিজের?

সে ঃ নবীর (সাঃ) প্রচলিত ধারারও আছে আবার আমার নিজেরও আছে। (অর্থাৎ দু'য়ের মিশ্রণ)

ইমাম ঃ তাহলে তুমি নবীর (সাঃ) শরিক?

সে ঃ না, আমি তাঁর শরিক নই।

ইমাম ঃ তোমার উপর কি ওহী নাজিল হয়?

সে ঃ না।

ইমাম ঃ যদি তুমি নবীকে (সাঃ) আনুগত্য করাকে ওয়াজীব বলে মনে করে থাক সেক্ষেত্রে নিজেকে আনুগত্য করাকেও কি ওয়াজীব বলে মনে কর?

সে ঃ নিজেই নিজেকে আনুগত্য করাকে ওয়াজীব মনে করি না।

তখন ইমাম তাঁর এক বিশিষ্ট ছাত্রের (ইউনুস ইবনে ইয়াকুব) দিকে ফিরে বললেন ঃ হে ইউনুস! এই ব্যক্তি মুনাযিরা করার আগেই নিজেকে দণ্ডিত করেছে, কেননা কোন দলিল ছাড়াই সে নিজের কথাকে সঠিক বলে মনে করে। হে ইউনুস! যদি কালাম[১] শাস্ত্রের উপর তোমার ধারনা থেকে

থাকে তবে এই ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা কর।

ইউনুস ঃ ভারী আফসোসের কথা! আমি তো কালাম শাস্ত্রের উপর পারদর্শি নই। আপনি তো কালাম শাস্ত্রের উপর পড়া-শোনা করতে বারণ করেছেন। আর কালাম শাস্ত্রে শুধু এরূপ আলোচনা হয়ে থাকে যে, এটা ঠিক নয়, ওটা যুক্তিহীন, এটাতে কোন ফলাফলে পৌছানো যাবে না, একটা বুঝি তো অন্যটা বুঝি না............

ইমাম ঃ আমি যা করতে নিষেধ করেছি তা হচ্ছে যে, শুধুমাত্র আমার কথার উপরেই তোমরা চুপ করে বসে থেকো না। তোমাদের চিন্তা-চেতনাতে যা কিছু আসে তার উপরে দৃঢ়তা ধারণ কর। হে ইউনুস! এখন তুমি বাইরে গিয়ে আমার কয়েকজন

---

[১]। কালাম শাস্ত্র হচ্ছে এমন এক জ্ঞান যা আক্বীদাগত বিষয়কে আক্বল ও সূত্র উল্লেখের মাধ্যমে গভীর যুক্তি-দলিল দিয়ে আলোচনা করা।

বিশিষ্ট ছাত্রকে এখানে নিয়ে এসো যারা কালাম শাস্ত্রের উপর বিশেষ পারদর্শি।

ইউনুস ঃ আমি ইমামের কাছ থেকে উঠে বাইরে এলাম এবং ইমামের তিনজন বিশিষ্ট ছাত্র যথাক্রমে ঃ হুমরান ইবনে আইয়ান, মু'মিন আলতাক আহ্ওয়াল এবং হিশাম ইবনে সালাম। এরা সকলেই কালাম শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শি ছিল। আর কাইস ইবনে মাসিরকেও নিয়ে এসেছিলা। সে কালাম শাস্ত্রকে ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) কাছে শিক্ষা অর্জন করেছিল। তাদের সকলকে ইমামে সামনে হাজির করলাম। তারা যখন সকলেই পাশা-পাশি বসলো ইমাম খিমা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন (যে খিমাটি কা'বা শরীফের পাশে অবস্থিত পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হত এবং তিনি হজ্জ মৌসুম শুরুর কয়েক দিন আগে ঐ খিমাতে আসতেন)। তিনি অনেকক্ষণ একটি উটের দিকে লক্ষ্য করছিলেন যা তাঁর দিকেই আসছিল। তিনি বললেন ঃ এই কা'বা ঘরের কসম ঐ উটটি হিশামের, সে এখানেই আসছে।

উপস্থিত সকলেই চিন্তা করলো যে, ইমাম আকিলের সন্তান হিশামের কথা বলছেন। কেননা ইমাম তাকে প্রচুর ভালবাসতেন। যখন উটটি এসে পৌছালো তখন দেখা গেল ঐ উট সওয়ারী ছিল হিশাম ইবনে হাকাম (সে ছিল ইমামের অতি নিকটতম ছাত্র)। সেও সেখানে প্রবেশ করলো। সে ছিল যুবক, সবেমাত্র মোচের রেখা দেখা দিয়েছে। উপস্থিত সকলেই তার থেকে বয়সে বড় ছিল। ইমাম তাকে যথেষ্ট সমাদরের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাকে বিশেষ একটি স্থানে বসতে দিলেন। তিনি তার শানে বললেনঃ

ناصرنا بقلبه و لسانه و يده (হিশামের অন্তর, জিহ্বা ও কর্মকাণ্ড সব কিছুই আমাদের সাহায্যকারী)।

তারপর ইমাম উপস্থিত ছাত্রদের সাথে আলাপ শেষে পর্যায়ক্রমে উক্ত শামের বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা বা মুনাযিরা করতে বললেন। প্রথমে হুমরানকে ঐ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করতে বললেন। সে ঐ ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা করলো এবং অল্প সময়ের মধ্যেই হুমরানের কাছে ঐ ব্যক্তি মুনাযিরাতে হেরে গেল।

তারপর ইমাম মু'মিন আলতাককে[১] বললেন ঃ হে আলতাক! শামের ঐ ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা কর। সে ঐ ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা করলো, কিন্তু এ বারেও তাকে হারাতে আলতাকের বেশী সময় লাগলো না।

তারপর ইমাম হিশাম ইবনে সালামকে বললেন ঃ এবার তুমি যাও ঐ ব্যক্তির

---

[১]। এই ব্যক্তির নাম হচ্ছে আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে নো'মান। কুফায় বসবাস করতো। তার লাকাব (উপাধী) হচ্ছে 'আহ্ওয়াল'। তার কুফা শহরের তাক মহল্লায় একটি দোকান ছিল। সে আল্লাহ্র মু'মিন বান্দা ছিল। তাই পরবর্তীতে তাকে মু'মিন আলতাক বলা হত অর্থাৎ তাক মহল্লার মু'মিন। আর তার বিরোধীদেরকে শয়তান আলতাক বলা হত (সাফিনাতুল বাহার)।

সাথে মুনাযিরা কর। সেও ইমামের কথামত ঐ ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা করলো। কিন্তু এবারের আলোচনায় জয়-পরাজয় কারো ভাগ্যেই আসলো না অর্থাৎ দু'জনেই সমান সমান থাকলো।

অতপর ইমাম কাইস ইবনে মাসিরকে বললেন ঃ তুমি যাও ঐ ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা কর। সে ঐ ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা করলো। ইমাম তাদের মুনাযিরাকে শুনছিলেন এবং মুচকি হাসছিলেন। কেননা ঐ ব্যক্তি কাইসের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারছিল না। সাথে সাথে পরাজয়ের লজ্জা তার চেহারায় পরিস্কার বুঝা যাচ্ছিলো[১]।

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-১৭১।

২২- শামের সে বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে হিশামের কঠিন মুনাযিরাঃ

ইমাম সাদিকের (আঃ) উপস্থিতিতে তাঁর ছাত্রদের সাথে শামের পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত মুনাযিরা যা আগেই তার বর্ণনা দিয়েছি, এবার তিনি হিশাম ইবনে হাকামের দিকে ইশারা করে ঐ ব্যক্তিকে বললেন ঃ "এই যুবকের সাথে মুনাযিরা কর"।

ঐ ব্যক্তি বলল আমি হিশামের সাথে মুনাযিরা করার জন্য প্রস্তুত। ইমামের উপস্থিতিতে তাদের মুনাযিরা এরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঃ

সে হিশামকে ইশারা করে বলল ঃ হে যুবক! এই (ইমাম সাদিক) ব্যক্তির ইমামত সম্পর্কে আমাকে বল, এ ব্যাপারে তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই।

ইমামের প্রতি ঐ ব্যক্তির এত বড় রূঢ় আচারণ দেখে এতই রাগান্বিত হয়েছিল যে, তার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপছিল। এই পরিস্থিতিতেই ঐ ব্যক্তিকে বলল ঃ আচ্ছা বল দেখি, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দার মঙ্গল বেশী চান, না বান্দারা আল্লাহ্র থেকে নিজেরাই নিজেদের বেশী মঙ্গল চায়?

সে ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে বান্দাদের থেকে বেশী মঙ্গল চান।

হিশাম ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের মঙ্গলের জন্য কি করেছেন?

সে ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হুজ্জাতকে (পরিপূর্ণতাকে বা সব কিছুকেই) মানুষের জন্য দিয়েছেন। যাতে করে তারা যেন ভবঘুরে না থাকে। তিনি মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্বকে দান করেছেন যাতে করে তারা তাদের অপূর্নতাকে বা কমতিকে একে অপরের সাহায্যে পরিপূর্ণ করতে বা পরিপূর্ণতায় পৌছাতে পারে। সাথে সাথে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে নিজের আইন-কানুন সম্পর্কে অবগত করেছেন।

হিশাম ঃ তাঁর হুজ্জাত কে?

সে ঃ তাঁর হুজ্জাত হচ্ছেন রাসূলে খোদা (সাঃ)।

হিশাম ঃ রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে কে?

সে ঃ রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে আল্লাহ্র হুজ্জাত হচ্ছে তাঁর পবিত্র কোরআন ও রাসূলের সুন্নত।

হিশাম ঃ কোরআন ও সুন্নত কি বর্তমান বিশ্বের সমস্যাসমূহ সমাধানের ব্যাপারে ফলদায়ক?

সে ঃ অবশ্যই।

হিশাম ঃ তাহলে কেন আমার এবং তোমার মধ্যে মতের অমিল রয়েছে, আর

কেনই বা তুমি এ কারণেই শাম থেকে মক্কায় এসেছো?!

সে হিশামের এই প্রশ্নের সম্মুখে নিরব বসে রইলো। ইমাম সাদিক (আঃ) তাকে বললেন ঃ কেন কোন কথা বলছো না?

সে ঃ যদি হিশামের প্রশ্নের ব্যাপারে বলি যে, কোরআন ও সুন্নত আমদের মধ্যকার মতের অমিলকে দুরিভূত করবে তাহলে সে কথাটি অনর্থ হয়ে যাবে। কেননা কোরআন ও সুন্নত বিভিন্ন অর্থ সম্বলিত। আর যদি বলি আমাদের মতানৈক্য কোরআন ও সুন্নত বুঝার ক্ষেত্রে তাহলে তা আমাদের কারো আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি আঘাত আনবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের উভয়েরই দৃষ্টি ভঙ্গি সঠিক। তবে এ বক্তব্য আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফলাফল বয়ে আনবে না। যদিও উল্লেখিত দলিলটি আমার আক্বীদার পক্ষে এবং হিশামের আক্বীদা-বিশ্বাসের পক্ষে নয়।

ইমাম ঃ হিশামের কাছে এই প্রশ্নটিই করে দেখ সে কি জবাব দেয়। তবে যেহেতু তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব জুড়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় ভরপূর সেহেতু অবশ্যই তার কাছ থেকে এর উপযুক্ত জবাব পাবে।

সে ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা কি কাউকে তাঁর বান্দাদের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বা সত্য ও বাতিলকে পৃথক করার জন্য পাঠিয়েছেন?

হিশাম ঃ রাসূলে খোদর (সাঃ) যমানায় না বর্তমানে?

সে ঃ রাসূলে খোদার (সাঃ) যমানায় তো তিনিই ছিলেন। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমানে। আর যদি পাঠিয়ে থাকেন তবে সে কে?

হিশাম ঃ বর্তমানে হচ্ছেন তিনিই যিনি তোমার সামনে (ইমামের

দিকে ইশারা করে বলল) বসে আসেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর কাছে মানুষ আছে। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র হুজ্জাত এবং আমাদের সমস্যা সমাধানকারী। কেননা তিনি নবুওয়াতী জ্ঞানের উত্তরসূরী, যা পিতৃসূত্রে পরমপরায় তাঁর হাতে এসে পৌছেছে। তিনি আসমান ও যমিনের গোপন রহস্য আমাদের সামনে উত্থাপন করেন এবং তা খুলে বর্ণনা দেন।

সে ঃ আমি কিভাবে বুঝবো যে, এই ব্যক্তি (ইমাম সাদিক) আল্লাহ্র হুজ্জাত?!

হিশাম ঃ তুমি যে বিষয়েই জানতে চাও তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর। আর এর মাধ্যমেই তিনি যে আল্লাহ্র হুজ্জাত তা তোমার কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে।

সে ঃ হে হিশাম! এই কথায় তুমি আমার জন্য আর কোন পথই খোলা রাখলে না। এখন সম্পূর্ণটাই আমার উপর। আমি প্রশ্ন করে প্রকৃত সত্যে পৌছাতে পারবো।

ইমাম ঃ তুমি কি চাও যে, তুমি শাম থেকে মক্কায় কোন পথে এসেছো, কিভাবে এসেছো এবং পথে কি করেছো সে সব বিষয়ের বর্ণনা তুলে ধরবো? এই বলে ইমাম তার সফর সম্পর্কে একটু খানি বর্ণনা তুলে ধরলেন।

সে ইমামের বর্ণনা শুনে, প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করতে পেরে অতিশয় আনন্দিত হয়ে গেল এবং ইমামের নূরের ছটা তার অস্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে দিল। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বলল ঃ সত্য বলেছো হিশাম! আল্লাহ্‌র কসম! এক্ষণে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম।

ইমাম ঃ বরং তুমি সবেমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলে। আর ইসলাম হচ্ছে ঈমানের আগের পর্যায়। ইসলামের উছিলার একে অপরের কাছ থেকে উত্তরাধিকারীতা পেয়ে থাকে কিন্তু ছওয়াব পাওয়ার উছিলা হচ্ছে ঈমান। তুমি আগেও মুসলমান ছিলে কিন্তু ইমামতকে গ্রহণ করতে না। আর এখন তুমি আমার ইমামতকে গ্রহণ করে তোমার আমলের ছওয়াব পাবে।

সে ঃ সত্য বলেছেন। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন

মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রাসূল এবং আপনি হচ্ছেন রাসূলের (সাঃ) প্রকৃত উত্তরসূরী'।

এরপর ইমাম যারা ঐ ব্যক্তির সাথে মুনাযিরা করেছিল তাদেরকে ডাকলেন এবং একে একে সবাইকে তাদের মুনাযিরা সম্পর্কে বললেন। সর্ব প্রমথ তিনি হুমরানকে বললেন ঃ তুমি তোমার কথা-বার্তাকে হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক অগ্রসরীত করবে তাহলে সত্য প্রমাণে উপকৃত হবে।

হিশাম ইবনে সালাকে বললেন ঃ তুমি প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হাদীস খুজতে থাক কিন্তু তা খুজে পাওয়ার সঠিক প্রক্রিয়া তোমার নেই।

মু'মিন আলতাককে বললেন ঃ তুমি কিয়াস ও তুলনা দেয়ার মাধ্যমে আলোচনায় প্রবেশ কর, যার ফলে আলোচনার প্রকৃত বিষয় থেকে দুরে সরে যাও। একটি ভূল ব্যাখ্যাকে অন্য আরেকটি ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিহত কর কিন্তু তোমার আনিত ভূল ব্যাখ্যাটি অন্যের ভূল ব্যাখ্যার থেকে অনেক বলিষ্ট।

কাইস ইবনে মাসিরকে বললেন ঃ তুমি এমনভাবে কথা বল যা নবীর (সাঃ) হাদীসের নিকটবর্তী না করে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সত্য ও বাতিলকে মিশ্রিত করে ফেল। যদিও অল্প সত্যই মানুষকে অনেক বড় বাতিলের থেকে অমুখাপেক্ষি করে। তুমি এবং আহওয়াল, আলোচনার সময় এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে যাও। এ সব সত্বেও মুনাযিরার জন্য অনেক পারদর্শি ও অভিজ্ঞ।

ইউনুস বলে ঃ আল্লাহ্ কসম আমি চিন্তা করেছিলাম যে, ইমাম হিশাম ইবনে হাকামের ব্যাপারেও কাইস ও আহওয়ালের ব্যাপারে যেরূপ বলেছেন সেরূপ বলবেন। কিন্তু তিনি হিশামের ব্যাপারে অনেক উচ্চ পর্যায়ের কথা বললেন ঃ

يا هشام لا تكاد تقع تلوي رجليك، اذا هممت با لارض طرت

"হে হিশাম! তুমি তোমার দু'পা নিয়ে কখনোই জমিনে পড়ে যাবে না এবং

তোমার অবস্থা এমন পর্যায় পৌছায় যে, জমিনে পড়ে যাচ্ছ ঠিক
ঐ সময়ে তুমি উড়ে যাবে" (অর্থাৎ যখনই তোমার জমিনে পড়ে যাওয়ার
সম্ভাবনা দেখা দিবে ঠিক তখনই তুমি তোমার যোগ্যতার কারণে নিজেকে নাজাত দিবে)।

তারপর হিশামকে আরো বললেন ঃ "তোমার মত ব্যক্তি যারা বক্তব্য পেশ এবং মুনাযিরা করে তাদের অবশ্যই হুসিয়ার থাকা উচিৎ যে, আলোচনার সময় যেন কোন প্রকারে নড়-বড়ে না হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমাদের শা'ফায়াত তাদের জন্যই যারা এরূপে আলোচনা বা মুনাযিরা করে"[১]।

হিশামের ব্যাপারে ইমাম আরো অনেক কথা বলেছেন যেমন ঃ "হিশাম আমাদের পক্ষের এবং আমাদের কথা-বার্তার প্রচারক, সত্য যে আমাদের পক্ষে তার প্রমাণকারী এবং আমাদের শত্রুদের অনর্থক কথা-বার্তার বিরোধীতাকারী, যে তাকে অনুসরণ করবে সে পক্ষান্তরে আমাদেরকেই অনুসরণ করলো। আর যে তার বিরোধীতা করবে সে পক্ষান্তরে আমাদেরই বিরোধীতা করলো[২]।

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৭২, ১৭৩।
[২]। আস্ সাফী, সাইয়েদ মুর্তাযা, পৃঃ- ১২, তানকিহুল মাকাল, খণ্ড-৩, পৃঃ- ২৯৫।

২৩- ইমাম কাযিমের (আঃ) নিকট খৃষ্টান জাসালিকের মুসলমান হওয়া

শেইখ সাদুক (রহঃ) এবং অন্যরা হিশাম ইবনে হাকামের উদ্ধৃতি দিয়ে রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। বুরাইহাহ্ নামে খৃষ্টানদের একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম বা বিজ্ঞ ব্যক্তি যাকে জাসালিক[1] বলা হত, সে ৭০ বছর যাবৎ খৃষ্টান ধর্ম পালন করার সাথে সাথে ইসলামের সত্য পথের অন্বেষণে রত ছিল। অনেক বছর ধরে তার সাথে এক মহিলাও ছিল, উক্ত মহিলা তার কাজ-কর্মে সাহায্য করতো।

বুরাইহাহ্ খৃষ্টান ধর্মের অযৌক্তিক আইন-কানুন ও দলিলসমূহকে ঐ মহিলার কাছ থেকে গোপন করে রাখতো। এভাবে থাকতে থাকতে একদিন ঐ মহিলা এ সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। বুরাইহাহ্ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলো। ইসলামের নেতা নেত্রীবর্গের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো এবং তাদের ব্যাপারে আরো বেশী জানার জন্য কৌতুহলী হল।

সে বিভিন্ন ফিরকা ও দলের মধ্যে প্রবেশ করতো এবং তাদের সাথে আক্বীদা-বিশ্বাসগত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও তাদের নিয়ে গবেষণা করতো, কিন্তু সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলো না। তাই তাদেরকে বলতো ঃ 'যদি তোমাদের নেতাগণ সত্যের উপর বলিষ্ট থাকতো, তবে সেক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সত্যও তোমাদের কাছে থাকতো'।

এভাবে চলতে চলতে সে শিয়া মাযহাবের বিষয়ে অবগত হল এবং হিশাম ইবনে হাকামের কথা তার কানে গেল।

ইউনুস ইবনে আব্দুর রাহমান [ইমাম সাদিকের (আঃ) ছাত্র] বলে, হিশাম বলেছে ঃ আমি একদিন আমার দোকানের পাশে বাবুল কারাখ নামে একটি স্থান ছিল সেখানে বসে ছিলাম। কয়েকজন সেখানে আমার কাছে কোরআন শিক্ষা অর্জন করছিল। হটাৎ খৃষ্টানদের একটি দলকে আসতে দেখলাম তাদের মধ্যে বুরাইহাহ্‌ও ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই পাদ্রি এবং অন্যরা অন্য পদে অধিষ্টিত ছিল। তারা আনুমানিক একশ জন ছিল। তাদের শরীরে ছিল কালো পোশাক এবং মাথায় ছিল বুরনুস[2] টুপি। বুরাইহাহ্ (বড় জাসালিক) তাদের সবাইকে নিয়ে আমার দোকানের পাশে সমবেত হল। বুরাইহাহ্‌র জন্য একটি বিশেষ চেয়ার দেয়া হল। সে তার উপর বসলো। উসকুফ ও অন্যান্য আলেমগণের মাথায়ও বুরনুস টুপি ছিল, তারা সবাই তাদের হাতের লাঠির

---

[1]। জাসালিক ঃ খৃষ্টান ধর্মের আলেমদের মধ্যে এমন সর্বচ্চো ব্যক্তিত্ব যার পরে 'মুতরান' তারপরে 'উসকুফ' .... ইত্যাদি পদ মর্যাদা রয়েছে।

[2]। একটি লম্বা ধরনের টুপি যা খৃষ্টান আলেমগণ তাদের মাথায় পরিধান করতো।

উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে ছিল।

বুরাইহাহ্ বলল ঃ মুসলামানদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি যে কালাম শাস্ত্রের উপর বিশেষ দক্ষ, যার সাথে আমি খৃষ্টান ধর্মের সত্যতা নিয়ে মুনাযিরা করবো আর সে আমাকে হারিয়ে দিবে। এখন ইসলামের সত্যতা নিয়ে তোমার সাথে মুনাযিরা করতে এসেছি।

বুরাইহাহ্ হিশামের সাথে মুনাযিরা করলো এবং তাতে সে পরাজয় বরণ করলো অর্থাৎ হিশাম বিজয় লাভ করে। যদিও তাদের মুনাযিরা অনেক সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয়। আর বুরাইহাহ্র পরাজয়ের ফলে উপস্থিত অন্যান্য খৃষ্টানরা সভা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। তারা তখন এ কথাই বলছিল ঃ হায়! আমরা তো হিশামের সাথে মুনাযিরা না করলেও পারতাম, তার মুখো-মুখি না হলেও পারতাম। বুরাইহাহ্ এই মুনাযিরার পর যেহেতু সে অনেক ভেঙ্গে পড়েছিল, তাই বাড়ীতে ফিরে গেল। তার বাড়ীতে যে মহিলা কাজ করতো সে তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনার এই মন খারাপ করে থাকার কারণ কী?

বুরাইহাহ্, হিশামের সাথে তার মুনাযিরার ঘটনা ঐ মহিলার সাথে বর্ণনা করলো এবং বলল আমার অস্থির থাকার কারণ হচ্ছে এটাই।

ঐ মহিলা তাকে বলল ঃ আপনি কি সত্যের সাথে থাকতে চান না বাতিলের সাথে?!

বুরাইহাহ্ উত্তরে বলল ঃ 'আমি সত্যের সাথে থাকতে চাই'।

মহিলা বলল ঃ যেখানেই আপনার সেই সত্যকে খুজে পাবেন, সেখানেই তাকে গ্রহণ করবেন এবং গোড়ামী ও পক্ষপাতিত্বকে এড়িয়ে

চলবেন কারণ এগুলোর কারণেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আর সন্দেহ হচ্ছে একটি অসভ্য জিনিষ এবং সন্দেহকারীর স্থান হচ্ছে দোযখের আগুনের মধ্যে।

বুরাইহাহ্ ঐ মহিলার বক্তব্যকে গ্রহণ করলো এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, সকালে হিশামের কাছে যাবে। সে সকালে হিশামের কাছে গেল এবং সেখানে দেখলো যে, হিশামের কাছে তার কোন ছাত্র নেই। সে হিশামকে বলল ঃ 'হে হিশাম! তোমার কি এমন কোন ব্যক্তিকে জানা আছে যে, তার কথাকে আদর্শ মনে করে তাকে অনুসরণ এবং তার আনুগত্য করাকেই নিজের দ্বীনি দায়িত্ব বলে মনে করবো'?

হিশাম ঃ হ্যাঁ, এমন ব্যক্তি আছে হে বুরাইহাহ্।

বুরাইহাহ্, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে হিশামের কাছে জানতে চাইলো।

হিশাম, ইমাম সাদিকের (আঃ) ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার কাছে বর্ণনা দিল। সে হিশামের বর্ণনামতে ইমামের প্রতি আসোক্ত হল এবং হিশামের সাথে ইরাক থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হল। বুরাইহার কাজের মহিলাও তাদের সফর সঙ্গী ছিল।

তাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে, সরাসরি ইমামের সাথে দেখা করবে কিন্তু ইমামের বাড়ীতে ঢুকতেই মুসা ইবনে জা'ফারের (আঃ) সাথে তাদের দেখা হল (তিনি ছিলেন ইমামের সন্তান এবং শিয়া মাযহাবের পরবর্তী ইমাম এবং তাঁর উপাধি হচ্ছে কাযিম)।

'সাকিবুল মানাকিব'-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী হিশাম তাকে সালাম জানালো, বুরাইহাও তাকে সালাম জানালো। তারপর তারা তাদের সফরের উদ্দেশ্যকে তাঁর সাথে বর্ণনা করলো। ইমাম কাযিম তখন ছোট ছিলেন।

ইমাম কাযিমের (আঃ) সাথে জাসালিকের কথোপকথন ঃ

ইমাম কাযিম ঃ "হে বুরাইহাহ্! তোমার নিজের আসমানী কিতাব (ইঞ্জিল) সম্পর্কে কি পরিমান জ্ঞান রাখ?

বুরাইহাহ্ ঃ আমি আমার কিতাব সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখি।

ইমাম কাযিম ঃ ইঞ্জিলের বাতেনি অর্থের উপর কতটুকু বিশ্বাসী।

বুরাইহাহ্ ঃ আমি যতটুকু পরিমানে তার ব্যাপারে জ্ঞান রাখি ঠিক সে পরিমানেই তার বাতেনি অর্থের প্রতি বিশ্বাস রাখি।

এ পর্যায়ে ইমাম কাযিম (আঃ) ইঞ্জিলের কয়েকটি আয়াত পড়তে শুরু করলেন।

বুরাইহাহ্ ইমামের কেরাতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে বলল ঃ 'হযরত ঈসা মাসীহ্ (আঃ) ইঞ্জিলকে এরূপে তেলোওয়াত করতেন যেরূপে আপনি তেলোওয়াত করছেন। আর এরূপে তেলোওয়াত হযরত মাসীহ্ (আঃ) ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারতো না'।

তারপর সে ইমামকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ

اياك كنت اطلب منذ خمسين سنة او مثلك

'প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে যাচ্ছে যে, আপনার বা আপনার মত ব্যক্তির খোজে ছিলাম'

ততক্ষণাৎ বুরাইহাহ্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। আর তার কাজের মহিলাও তার সাথে মুসলমান হয়ে গেল (পরবর্তীতে তারা ইসলামের জন্য অনেক কাজও করেছিল)। তারপর হিশামের সাথে তারা ইমাম সাদিকের (আঃ) সামনে উপস্থিত হল। হিশাম ইমামকে পূর্ব ঘটনার (ইমাম কাযিমের সাথে বুরাইহার কথোপকথন) বর্ণনা দিল। আর তাদের মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও ইমামের কাছে জানালো।

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন ঃ

ذرية بعضها من بعض و الله سميع عليم

"তারা এমন সন্তান-সন্ততি যারা (পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতাকে) একে অপরের কাছ

থেকে গ্রহণ করেছে, আর আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন এবং জানেন”[১]।

ইমাম সাদিকে (আঃ) সাথে বুরাইহার কথোপকথন ঃ

বুরাইহাহ্ ঃ আপনার তরে আমার প্রাণ উৎসর্গীত! তৌওরাত, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য নবীদের কিতাব আপনাদের কাছে কিভাবে এসেছে?

ইমাম সাদিক ঃ এই কিতাবসমূহ তাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। আমরা তাদের মতই ঐ কিতাবসমূহকে তেলোওয়াত করি এবং পড়ি। আল্লাহ্ তাঁর যমিনে ঐ ব্যক্তিকে হুজ্জাত হিসেবে নিযুক্ত করেন না যার কাছে প্রশ্ন করা হলে বলে যে, এর উত্তর জানি না।

এরপর থেকে বুরাইহাহ্ ইমামের একজন অনুসারী এবং তার ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হত। এরূপে সে ইমামের জীবদ্দশায় এই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে যায়। ইমাম তাঁর নিজের হাতে তাকে গোসল দেন, কাফন পরান এবং কবরে রাখেন ও বলেনঃ

هذا حواري من حواري المسيح عليه السلام يعرف حق الله عليه

“এই ব্যক্তি, ঈসার (আঃ) অত্যন্ত কাছের একজন অনুসারী ছিল, সে নিজের মধ্যে আল্লাহ্র সত্যকে অনুধাবন করেছে”।

ইমামের অনেক সাহাবারই কামনা ছিল বুরাইহার মত (আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পন্ন) হওয়ার[২]।

---

[১]। আলে ইমরান ঃ ৩৪।

[২]। আনোয়ারুল বাহিয়াহ্, পৃঃ-১৮৯-১৯২।

২৪- ইমাম কাযিমের (আঃ) সম্মুখে আবু ইউসুফের চরম দুরবস্থা

তৃতীয় আব্বাসীয় খলিফা মাহ্দী আব্বাসী একদিন ইমাম মুসা ইবনে জা'ফরের (আঃ) সামনে বসে ছিল। আবু ইফসুফ [একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ও নবীর (সাঃ) পরিবারের বিরোধী ছিল] সেখানে উপস্থিত ছিল। মাহ্দীর দিকে ফিরে বলল ঃ মুসা ইবনে জা'ফরের (আঃ) কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করার অনুমতি দিবেন, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে তিনি হতভম্ব হয়ে যান?

মাহ্দী আব্বাস ঃ হ্যাঁ, অনুমতি দিচ্ছি।

আবু ইউসুফ ইমামকে বলল ঃ আপনার অনুমতি আছে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার?

ইমাম ঃ প্রশ্ন কর।

আবু ইউসুফ ঃ 'যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে মুহ্‌রেম হয় তার কি চলার পথে ছায়ার নিচ দিয়ে যাওয়া জায়েয হবে?

ইমাম ঃ না, জায়েয নয়।

সে ঃ যদি মুহ্‌রেম মাটির উপর কোন খিমা তৈরী করে (তার মধ্যে থাকার ইচ্ছায়) তার নিচে যাওয়া কি জায়েয হবে?

ইমাম ঃ হ্যাঁ, তার নিচে যাওয়া জায়েয হবে।

সে ঃ এই দুটির মধ্যে এমন কি পার্থক্য রয়েছে যার কারণে প্রথমটির ক্ষেত্রে জায়েয নয় আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে জায়েয?

ইমাম ঃ যে মহিলার ঋতুচক্র হয় তার জন্য কি ঐ অবস্থার নামাযগুলো পরে কা'যা করতে হবে?

সে ঃ না, তার জন্য তা করতে হবে না।

ইমাম ঃ মহিলার ঐ অবস্থা থাকা সময়কার রোযাগুলো কি কাযা করতে হবে?

সে ঃ হ্যাঁ, তাকে তা কা'যা করতে হবে।

ইমাম ঃ তাহলে এখন আমাকে বল যে, এই দু'য়ের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে যার কারণে প্রথমটির ক্ষেত্রে কা'যা করতে হবে না আর

দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তা কা'যা করতে হবে?

সে ঃ এরূপভাবেই নির্দেশ এসেছে।

ইমাম ঃ হজ্জে মুহ্‌রেম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ঐরূপ নির্দেশ এসেছে। শরীয়তী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিয়াস করা বৈধ হবে না।

সে এই উত্তরটি শোনার পরে যেন আগুনে পড়লো। মাহ্দী আব্বাসী তাকে বললঃ

চেয়েছিলে এমন কিছু প্রশ্ন করবে যার উত্তর না দিতে পেরে মুসা ইবনে জা'ফার হতভম্ব হয়ে যাবে কিন্তু তা তো পারলে না।

সে ঃ رماني بحجر دامغ 'মুসা ইবনে জা'ফার (আঃ) পাথর ভেঙ্গে আমাকে হত্যা করলো'। অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত উত্তরে আমি নিজেই চরম দুরাবস্থায় পড়েছি বা হতভম্ব হয়েছি[১]।

২৫- হারুনের সাথে ইমাম কাযিমের (আঃ) মুনাযিরা

৫ম আব্বাসীয় খলিফা হারুনার রশিদ ইমাম কাযিমের (আঃ) সাথে তার আলোচনা এরূপে শুরু করলো, ইমামাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল ঃ

'অনেকদিন যাবৎ ভাবছি আপনার সাথে আলোচনা করবো। কেননা আমার মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে যা আজোবধি কাউকে জিজ্ঞাসা করি নি। আমাকে শুনেছি যে, আপনি কখনোই মিথ্যা বলেন না। তাই আমি আপনার কাছে আমার প্রশ্নের সঠিক ও সত্য জবাব আশা করছি।

ইমাম ঃ যদি আমাকে বাক স্বাধীনতা থাকে তবে তোমার প্রশ্ন সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি, তা তোমাকে অবহিত করব।

হারুন ঃ আপনি স্বাধীন। আপনার যা বলার মুক্তভাবে ব্যক্ত করতে পারেন... ...।

যাহোক আমার প্রথম প্রশ্ন হল ঃ কেন আপনার এবং জনগণের মাঝে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, আপনারা যারা আবু তালিবের সন্তান তারা আমাদের অর্থাৎ আমরা যারা আব্বাসের সন্তান তাদের উপর শ্রেষ্টত্ব রাখেন। অথচ আমরা এবং আপনারা একই বৃক্ষের অংশ।

আবু তালিব ও আব্বাস উভয়েই মহানবীর (সাঃ) চাচা ছিলেন এবং আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম ঃ আমরা তোমাদের চেয়ে মহানবীর (সাঃ) বেশী নিকটবর্তী।

হারুন ঃ কিরূপে ?

ইমাম ঃ যেহেতু আমাদের পিতা আবু তালিব ও মহানবীর (সাঃ) পিতা পরস্পর আপন ভাই (পিতা ও মাতা একই) ছিলেন। কিন্তু আব্বাস আপন ভাই ছিলেন না

---

[১]। আইয়্যানু আখবারুর রেযা (আঃ) থেকে ইকতিবাস, খন্ড-১, পৃঃ-৭৮।

(কেবলমাত্র মাতৃকুল থেকে)।

হারুন ঃ কেন আপনারা দাবী করেন যে, শুধুমাত্র আপনারাই মহানবীর (সাঃ) থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেন? অথচ আমরা জানি যে, যখন নবী (সাঃ) পরলোক গমণ করেছেন, তখন তার চাচা আব্বাস (আমাদের পিতা) জীবিত ছিলেন। কিন্তু অপর চাচা আবু তালিব (আপনাদের পিতা) জীবিত ছিলেন না। আর এটা সকলের জানা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত চাচা জীবিত আছেন, চাচার সন্তানের নিকট উত্তরাধিকার পৌঁছায় না।

ইমাম ঃ আমার স্বাধীনভাবে কথা বলার অনুমতি আছে তো?

হারুন ঃ আলোচনার শুরুতেই আমি বলেছি, মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে আপনি স্বাধীন।

ইমাম ঃ ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন সন্তানের উপস্থিতিতে, পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত কেউ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। আর সন্তান থাকলে চাচার উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারটি কোরআনে কিংবা রেওয়ায়েতে প্রমাণিত হয়নি। অতএব, যারা চাচাকে পিতার নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করে, নিজ থেকেই বলে এবং তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই।

(অতএব, নবী কন্যা যাহরার (সালাঃ) উপস্থিতিতে তাঁর চাচা আব্বাসের নিকট উত্তরাধিকার পৌঁছায় না)।

তাছাড়া আলীর (আঃ) সম্পর্কে মহানবীর (সাঃ) পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, اقضاكم عليّ -আলী তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বিচারক'।

ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে ও বর্ণিত হয়েছে ঃ اقضانا علي -আলী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

উল্লেখিত বাক্যটি হল সামগ্রীক তাৎপর্যবহ যা হযরত আলীর (আঃ) জন্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, সকল প্রকারের বিদ্যা যে গুলোর মাধ্যমে স্বীয় সাহাবীগণকে প্রশংসা করেছেন যেমন ঃ কোরআনের জ্ঞান, আহ্‌কামের জ্ঞান ও সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ইত্যাদি সবকিছুই ইসলামী বিচারের তাৎপর্যে নিহিত রয়েছে। যখন বলা হবে আলী (আঃ) বিচারকার্যে সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞানেও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(অতএব, আলীর (আঃ) এ উক্তি যে, সন্তানের বর্তমানে চাচা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না তা চূড়ান্ত দলিল রূপে পরিগণিত হবে। সুতরাং এটা গ্রহণ করা উচিৎ, না কি ওটা যে বলা হয়েছে চাচা আইণগত ভাবে পিতার স্থানে? কারণ, নবীর (সাঃ) বক্তব্য অনুসারে, আলী (আঃ) দ্বীনের আহ্‌কাম সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞাত)।

হারুন ঃ কেন আপনারা মানুষকে অনুমতি দেন আপনাদেরকে রাসূলের (সাঃ) সাথে সম্পর্কিত করতে এবং এ কথা বলতে যে, আপনারা আলাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) সন্ত

ান। অথচ আপনারা হলেন আলীর (আঃ) সন্তান। কারণ, প্রত্যেককেই তার পিতার সাথে সম্পর্কিত করা হয় (মাতার সাথে নয়)। আর মহানবী (সাঃ) হলেন আপনাদের নানা।

ইমাম ঃ যদি মহানবী (সাঃ) এখন উপস্থিত হয়ে হয়ে তোমার কন্যাকে বিয়ে করতে চান, তবে তুমি কি তোমার কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিবে?

হারুন ঃ সুবহান আলাহ, কেন দেব না। বরং তার কারণে অনারব এবং কুরাইশদের সকলের উপর গর্ববোধ করব।

ইমাম ঃ কিন্তু নবী (সাঃ) জীবিত হলে আমার কন্যার জন্য প্রস্তাব দিবেন না, কিংবা আমি ও দিব না।

হারুন ঃ কেন ?

ইমাম ঃ কারণ, তিনি আমার পিতা (যদিও মায়ের দিক থেকে) তথাপিও তোমার পিতা তো নন। (অতএব, নিজেকে আলাহর রাসূলের সন্তান বলে মনে করতে পারি)।

হারুন ঃ তাহলে কেন আপনারা নিজেদেরকে রাসূলের (সাঃ) বংশধর বলে মনে করেন। অথচ বংশ পিতৃকুল থেকে নির্ধারিত হয়, মাতৃকুল থেকে নয়।

ইমাম ঃ আমাকে এ প্রশ্নের জবাব প্রদান থেকে অব্যাহতি দাও।

হারুন ঃ না, আপনাকে জবাব দিতেই হবে; আর সেই সাথে কোরআন থেকে দলিল বর্ণনা করতে হবে ... ...।

ইমাম ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ঃ

ومن ذرية داود وسليمان و ايوب ويوسف و موسى وهارون وكذلك نجزي

المحسنين و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس كل من الصالحين.

ইব্রাহীমের (আঃ) বংশধর হচ্ছেন হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত আইয়্যুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ), আর এভাবে সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করি এবং হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহিয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইলিয়াসকে (আঃ), কেননা তারা সেই সৎকর্মশীল ছিলেন................ (আনয়াম ঃ ৮৪,৮৫)।

ইমাম, এখন তোমাকে প্রশ্ন করব ঃ এ আয়াতে যে, ঈসা (আঃ) ইব্রাহীমের (আঃ) বংশ বলে পরিগণিত হয়েছে, তা কি পিতৃকুল থেকে, না মাতৃকুল থেকে?

হারুন ঃ কোরআনের দলিল মোতাবেক ঈসার (আঃ) কোন পিতা ছিলেন না।

ইমাম ঃ তাহলে মাতৃকুল থেকেই বংশধর বলে পরিগণিত হয়েছে। আমরাও আমাদের মাতা ফাতিমার (সালাঃ) (আল্লাহ্ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন) দিক থেকে

রাসূলের বংশধর বলে পরিগণিত হই।

ইমাম ঃ আরো দলিল উত্থাপন করবো কি?

হারুন ঃ বলুন।

ইমাম ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা মুবাহিলার ঘটনায় বলেছেন ঃ

فمن حاجّك فيه من بعد ماجائك من العلم فقل تعالو ندع ابنائنا و ابنئكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا وانفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

"ঈসার ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পরে যখন তোমার ব্যাপারে এসেছে এবং তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ এসো, আমরা আমাদের পুত্রদিগকে আহ্বান করি এবং তোমরাও তোমাদের পুত্রদিগকে, আর আমরা আমাদের নারীগণকে এবং তোমরাও তোমাদের নারীগণকে, আর আমরা আমাদের নফ্সকে এবং তোমারও তোমাদের নফ্সকে। অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত দিতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস না হয়। (আলে ইমরান-৬১)।"

কেউই এরূপ দাবী করেনি যে, মহানবী (সাঃ) নাজরানের নাসারাদের সাথে মুবাহিলা করার জন্য আলী (আঃ), ফাতিমা (সালাঃ), হাসান ও হুসাইন (আঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের সঙ্গী করেছিলেন।

অতএব, উল্লেখিত আয়াতে 'আব না'য়ানার' (আমাদের পুত্রগণ) দৃষ্টান্ত হলেন ইমাম হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ)। যদিও তারা তাদের মাতার দিক থেকে নবীর (সাঃ) সাথে সম্পর্কিত এবং তাঁর কন্যার সন্তান।

ইমাম কাযিমের (আঃ) এই দৃঢ় দলিল ও বক্তব্যকে গ্রহণ করলো

এবং বলল ঃ সাবাস তোমাকে হে মুসা[১]!.............

---

[১]। ইহ্তিজাজ তাবরাসী থেকে ইশতিবাস, খণ্ড-১, পৃঃ-১৬৩-১৬৫। অনেকেই এই দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বিশ্বাসী যে, ফাতিমার (সালাঃ) বংশ থেকে কাল কিয়ামত পর্যন্ত যে সন্তানগণ পৃথিবীতে আসবেন তারা সকলেই সাইয়্যেদ হবেন এবং নবীর (সাঃ) উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হবেন। সুতরাং যদি কারো পিতা সাইয়্যেদ না হয়ে থাকে কিন্তু মা হযরত ফাতিমার (সালাঃ) সিলসিলা থেকে সাইয়্যেদাহ্ হয়ে থাকেন তবে ঐ ব্যক্তিকেও সাইয়্যেদ বলা হবে (গবেষণা যোগ্য বিষয়)।

২৬- আবু কোর্‌রার সাথে ইমাম রেযার (আঃ) মুনাযিরা

ইমাম রেযার (আঃ) সময়ে আবু কোর্‌রাহ্ (খৃষ্টানদের বড় উসকুফের বন্ধু) নামে এক উড়ো খবর প্রদানকারী ব্যক্তি ছিল। সাফওয়ান ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া নামে ইমামের এক ছাত্র বলে ঃ আবু কোর্‌রাহ্ আমাকে বলল যে, আমি যেন তাকে ইমামের কাছে নিয়ে যাই। আমি এ ব্যাপারে ইমামের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন।

আবু কোর্‌রাহ্ ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে দ্বীনের হালাল, হারাম বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। এভাবে আলোচনা করতে করতে সেখানে তৌওহীদ সম্পর্কিত বিষয়ের উত্থাপিত হল। এ বিষয়ে তার প্রশ্নগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

'আমাদের রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে দেখাশোনা ও তাঁর সাথে কথা বলার দায়িত্বকে দুই নবীর উপর প্রবর্তন করেছেন (তিনি তাঁর নবীগণের মধ্যে দুইজন নবীকে নির্নয় করেন যাদের একজন তাকে দেখাশোনা করে আর অপরজন তাঁর সাথে কথা বলে)। তাঁর সাথে কথা বলার দায়িত্বটা দেন হযরত মুসার (আঃ) এবং তাকে দেখাশোনার দায়িত্বটা দেন হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) উপর। আর এই সূত্রে খোদা হচ্ছেন এমন এক অস্তিত্ব যাকে দেখা সম্ভব।

ইমাম ঃ যদি তাই হয়ে থাকে, তবে যে নবী -অর্থাৎ নবী (সাঃ)- জিন ও ইনসানকে খবর দিলেন যে, আল্লাহ্‌কে চোখে দেখা যাবে না এবং সৃষ্টিত বস্তুর কারো পক্ষে তাঁর সত্তার ব্যাপারে ধারনা করাও সম্ভব নয়। তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন শরিক নেই, সে তাহলে কোন নবী? তাহলে কি মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই এই কথাগুলো বলেন নি?

আবু কোর্‌রাহ্ ঃ হ্যাঁ, তিনি এরূপই বলেছেন।

ইমাম ঃ সুতরাং এটা তাহলে কিভাবে সম্ভব যে, একজন নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের নিকট আসবেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি দাওয়াত দিবেন এবং তাদেরকে বলবেন যে, আল্লাহ্‌কে চোখে দেখা যাবে না এবং সৃষ্টিত বস্তুর কারো পক্ষেই তাঁর সত্তার

ব্যাপারে ধারনা করাও সম্ভব নয়, তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন শরিক নেই, আবার সেই নবীই

বলবেন যে, আমি নিজে এই দুই চোখে খোদাকে দেখেছি? তাঁর সম্পর্কে প্রতক্ষ্য জ্ঞান অর্জন করেছি? আর তিনি মানুষের মতই চোখে দেখা যায়, তুমি কি এ ব্যাপারে লজ্জা পাচ্ছ না? এখনো পর্যন্ত কোন বে-দ্বীন ও অন্ধ অন্তর সম্বলিত মানুষই নবীর (সাঃ) ব্যাপারে এরূপ কথা বলতে পারে নি যে, তিনি এরূপ বলেছেন এবং পরবর্তীতে তার বিপরীতে বলেছেন।

আবু কোর্‌রাহ্‌ ঃ আল্লাহ্‌ তা'য়ালা কোরআনে সূরা নাজ্‌মের ১৩ নং আয়াতে এরূপ বলেছেন ঃ و لقدرآه نزلة اخری ঃ "দ্বিতীয় বারের মত নবী আল্লাহ্‌কে দেখলো"।

ইমাম ঃ এই সূরার ১১ নং আয়াতে নবী (সাঃ) যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেঃ ما كذب الفواد ما رای ঃ "তার অন্তর যা কিছু দেখেছে (সে ব্যাপারে) কখনই সে ভুল বলেনি"। অর্থাৎ নবীর (সাঃ) অন্তর দৃষ্টি যা কিছু দেখেছে তা ভুল ছিল না।

তারপর আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এই সূরাতেই (আয়াত নং ১৮) নবী (সাঃ) যা কিছুকে দেখেছেন তার বর্ণনায় বলেছেন ঃ لقد رای من آيات ربه الكبری ঃ "সে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার আয়াতের বড় নমুনা বা নিদর্শনসমূহকে দেখেছে"।

সুতরাং আল্লাহ্‌র নিশানাসমূহ (নবী যেগুলোকে দেখেছেন) সেগুলো তাঁর সত্তা ভিন্ন অন্য কিছুকে দেখেছিলেন। আর আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সূরা ত্বা-হার ১১০ নং আয়াতে বলেছেন ঃ و لا يحيطون به علماً ঃ " তারা তাঁর সত্তার ব্যাপারে কোন প্রকার জ্ঞান বা ধারনা রাখে না"। সুতরাং যদি চোখ দিয়ে আল্লাহ্‌কে দেখা যেত তাহলে তাঁর সত্তার ব্যাপারেও জানা বা ধারনা করা যেত (যেখানে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে তাঁর ব্যাপারে ধারনা করা অসম্ভব ব্যাপার)।

আবু কোর্‌রাহ্‌ ঃ তাহলে ঐ রেওয়ায়েতকে (যেখানে বলা হয়েছে নবী আল্লাহ্‌কে দেখেছেন) মিথ্যা ঘোষণা করছেন?

ইমাম ঃ যদি রেওয়ায়েত কোরআনের বিপরীতে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা বলবো। আর এ ব্যাপারে মুসলমানদের যে ধারনা তা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ্‌র সত্তার ব্যাপারে কোন প্রকার ধারনা করা সম্ভব নয়

এবং তাঁর সত্তাকে চোখে দেখাও যায় না, আর তিনি কোন কিছুর অনুরূপ নন"[১]।

সাফওয়ান আরো বলে ঃ আবু কোর্‌রাহ্‌ অন্য আরেক দিন তাকে অনুরোধ করে

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ- ৯৫ ও ৯৬, হাদীস নং- ১।

যে, তাকে যেন ইমামের কাছে নিয়ে যাই। আমি ইমামের কাছ থেকে তাকে আনার অনুমতি নিলাম এবং তাকে উপস্থিত করলাম। সে সেখানে উপস্থিত হয়ে পূর্বের ন্যায় হালাল, হারাম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করার পর এই প্রশ্নটি উপস্থাপন করে ঃ 'আপনি কি এটাকে সমর্থন দেন যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন মাহ্মুল (যা বহন করা হচ্ছে)?

ইমাম ঃ প্রতিটি মাহ্মুলই (হাম্ল অর্থাৎ বহন) কর্মের উপর স্থিত যা অন্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর মাহ্মুল একটি নাম যার অর্থ হচ্ছে অন্যের উপর ভর করা যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

যেমন বলা হয় ঃ যবর, যের, উপরে, নিচে (যবর ও উপরে শব্দ দুটি প্রশংসা, বিশিষ্টতা প্রকাশ করে আর যের ও নিচে শব্দ দুটি ভর, কমতি বা ঘাটতি প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ইচ্ছামত পরিবর্তীত করা সমীচিন নয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা (হামেল অর্থাৎ বাহক) হচ্ছেন সব কিছুর বাহক। আর 'মাহ্মুল' শব্দটি অপরের উপরে ভর করা ব্যতীত অর্থহীন। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা 'মাহ্মুল' হওয়াটা ঠিক হবে না। সাথে সাথে এটা দেখা যাবে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে, সে ব্যক্তি দোয়া করার সময় বলছে (হে মাহ্মুল)।

আবু কোর্রাহ্ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা কোরআনে সূরা হক্কার ১৭ নং আয়াতে বলেছেনঃ و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ঃ "ঐ দিনে পরওয়ার দিগারের আরশকে আট ব্যক্তি তাদের মাথায় করে তা বহন করে নিয়ে যাবে"।

এবং কোরআনে সূরা গাফিরের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

الذين يحملون العرش (যারা আরশকে বহন করে নিয়ে যাবেন)

ইমাম ঃ আরশ, আল্লাহ্র নাম নয়। বরং আরশ হচ্ছে আল্লাহ্র জ্ঞান ও ক্ষমতার নাম। আর যে আরশের মধ্যে সব কিছু আছে তাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা বহন করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিজে ব্যতীত তাঁর ফেরেশ্তাগণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আবু কোর্রাহ্ ঃ রেওয়ায়েতে এসেছে যে, 'যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা রাগান্বিত হন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাগণ তাদের কাঁধে তাঁর রাগের ভারকে অনুভব করতে পারেন এবং ততক্ষণাৎ সিজদায় পড়ে যান। আর যখন আল্লাহ্র রাগ কমে যায় তখন তারা তাদের কাঁধ হালকা অনুভব করে এবং তারা তাদের পূর্বের কাজে ফিরে যায়'। আপনি কি এই রেওয়ায়েতকে মিথ্যা বলবেন?!

ইমাম এই রেওয়ায়েতকে খণ্ডন করার লক্ষ্যে বলেন ঃ হে আবু কোর্রাহ্! আমাকে বল দেখি, যখন থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালা শয়তানের উপর তাঁর লানত দিয়েছেন এবং রাগান্বিত হয়েছেন তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কখন আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন? কখনই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হননি। বরং সব সময় তার এবং তার বন্ধুদের

উপর রেগেই আছেন। তাহলে তো তোমার বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা আরশের বাহক তাদের সিজদায় থাকার কথা। কিন্তু তেমন তো নয়। সুতরাং আরশ আল্লাহ্র নাম নয়।

এখন তুমি কিভাবে আল্লাহ্কে বিভিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তীত করে বর্ণনা দিতে পার, আর তাকে অনুরূপ তাঁর সৃষ্টিত বস্তুর ন্যায় বিভিন্ন অবস্থা সম্পন্ন মনে করতে পার? তিনি এ সব কিছু থেকে পবিত্র এবং পরিবর্তনহীন দৃঢ় সত্বার অধিকারী। সমস্ত কিছুই তাঁর ক্ষমতার আওয়াতায়। আর সব কিছুরই তাঁর প্রয়োজন কিন্তু তাঁর কোন কিছুরই বা কারোরই প্রয়োজন নেই[১]।

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ- ১৩০,১৩১।

২৭- নাস্তিক ব্যক্তির সাথে ইমাম রেযার (আঃ) মুনাযিরা

ইমাম রেযা (আঃ) সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বসেছিলেন এমন সময় তাঁর কাছে এক নাস্তিক ব্যক্তি উপস্থিত হল। তিনি তার দিকে ফিরে বললেন ঃ

যদি তোমার কথা সত্য হয়ে থাকে (যদিও এমন নয়), সেক্ষেত্রে আমরা তোমার সমান সমান। আর আমাদের নামায, রোযা, যাকাত ও ঈমান আমাদেরকে কোন ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে না। আর যদি আমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে (সত্য আমাদের পক্ষেই), সেক্ষেত্রে আমরা হব পুরস্কৃত আর তুমি হবে প্রলাপ বক্তা এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

সে ঃ আমাকে বুঝিয়ে দাও যে, খোদা কেমন? সে কোথায় আছে?

ইমাম ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়। যে পথে তুমি অগ্রসর হচ্ছো তা হচ্ছে ভূলের পথ। আল্লাহ্ তা'য়ালা ধরন-ধারণকে তাঁর ধরন-ধারণ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে কোন স্থানে অবস্থানরত না থেকেই স্থানকে স্থান রূপ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র পবিত্র সত্বার ধরন-ধারণ ও স্থান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যাবে না এবং কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাকে উপলব্ধি করা যাবে না। আর কোন কিছুর সাথেই তাকে তুলনা করা যাবে না।

সে ঃ যদি খোদাকে কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা না যায় তাহলে সে কিছুই নয়।

ইমাম ঃ এই যে, তোমার ইন্দ্রিয়ের কোন মাধ্যমই তাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম তাই তুমি তাকে অবিশ্বাস করছো। কিন্তু তা (আমাদের ইন্দ্রিয়ের কোন মাধ্যমই তাকে উপলব্ধি করতে পারে না) সত্বেও আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং ইয়াকিন (বিশ্বাস) রাখি যে, তিনি আমাদের প্রতিপালক। আর তিনি কোন কিছুর মত নন।

সে ঃ আমাকে বল খোদা কোন সময় থেকে আছেন?

ইমাম ঃ তুমি আমাকে বল যে, আল্লাহ্ কোন সময় ছিলেন না? তাহলে আমি তোমাকে বলবো যে, তিনি কখন থেকে আছেন।

সে ঃ খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার দলিল কি?

ইমাম ঃ আমি যখন আমার নিজের অবয়বের দিকে লক্ষ্য করবো তখন তাতে না কিছু বাড়াতে আর না তাতে কিছু কমাতে পারবো। এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বিশ্বাস করেছি যে, এই সৃষ্টির নিশ্চয়ই কোন না কোন স্রষ্টা রয়েছেন। আর এর মাধ্যমেই এই সৃষ্টির স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছি। এ ছাড়াও কক্ষপথের ঘূর্ণায়ন, মেঘের আসা-যাওয়া, বাতাস প্রবাহীত হওয়া, সূর্য ও চাদের ঘূর্ণাবর্তন ও তারকারাজীর পরিচালনার জন্য অবশ্যই একজন পরিচালকের প্রয়োজন। অতএব সকল সৃষ্টির অবশ্যই একজন স্রষ্টা রয়েছেন[1]।

---

[1]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-৭৮।

২৮- চাওয়া (মাশিয়্যাত) ও ইচ্ছার (ইরাদা) অর্থ

ইউনুস ইবনে আব্দুর রহমান নামে ইমাম রেযার (আঃ) এক ছাত্র ছিল। ঐ সময় সকল স্থানেই 'কাযা ও কাদার ও শেষ পরিণতি' (অজানা বিচার ব্যবস্থা ও তার ফলাফল) নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ইউনুস 'কাযা ও কাদারের' সঠিক অর্থটি ইমামের কাছ থেকে জানার ইচ্ছায় তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা তুললো এবং সে সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা চাইলো।

ইমাম তাকে এরূপ বললেন ঃ "হে ইউনুস! 'কাদারিয়াহ্'[১] গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করো না। কেননা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস দোযখবাসী ও শয়তানের আক্বীদা-বিশ্বাসের থেকেও অধিক ক্ষতিকর এবং.............

ইউনুস ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করিনি, বরং আমার বিশ্বাস এটাই যে, 'কোন কিছুই খোদার ইচ্ছার বিপরীতে অস্তিত্বমান হয় না।

ইমাম ঃ "হে ইউনুস! এরূপভাবেও নয়......... (বরং আল্লাহ্‌র চাওয়া এটাই যে, মানুষ নিজেই তার কর্ম আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে)। তুমি কি (মাশিয়্যাত) চাওয়া (এখানে চাওয়া বলতে আল্লাহ্ যা চান তাই বুঝানো হয়েছে অন্য কারো চাওয়া নয়) অর্থ জান?

ইউনুস ঃ না, আমি সে ব্যাপারে কিছুই জানি না।

ইমাম ঃ আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা প্রথম লৌহে মাহ্ফুযে লিখিত আছে। তুমি কি (ইরাদা) ইচ্ছার অর্থ জান?

ইউনুস ঃ না, আমি সে ব্যাপারেও কিছু জানি না।

ইমাম ঃ ইরাদা হচ্ছে তার উপর সিদ্ধান্ত নেয়া যা সে চায়। তুমি কি (কাদার) অজানা বিষয়ের অর্থ জান?

ইউনুস ঃ না, আমি সে বিষয়েও কিছু জানি না।

ইমাম ঃ কাদার হচ্ছে পরিমান বা ছক নির্ধারণ করা। যেমন, কত

বছর জীবন-যাপন করবে, মৃত্যুর সময় কখন ইত্যাদি। তারপর বললেন ঃ (কাযা) বিচার ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে উক্ত ছকের আওতায় হুকুম জারি করা এবং তা বাস্তবে

---

[১]। কাদারিয়াহ্ বলতে এখানে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যা বলে ঃ আল্লাহ্ সব বিষয়কে মানুয়ের উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিজের প্রভূত্বকে মানুষের উপর থেকে তুলে নিয়েছেন।

রূপদান করা।

ইমামের পরিচ্ছন্ন আলোচনায় ইউনুস দারুণভাবে সন্তুষ্ট হল এবং ইমামের কপালে চুম্বন দেয়ার অনুমতি চাইলো, সাথে সাথে এটাও বলল ঃ

فتحت لي شيئا كنت عنه غفلة

'আমার গিরো পড়ে যাওয়া সমস্যার গিরোকে আপনি খুলে দিলেন যে ব্যাপারে আমি ছিলাম অজ্ঞ'[১]।

---

[১]। উসূলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-১৫৮-১৫৭।

২৯- ইমাম জাওয়াদ সম্পর্কে বনি আব্বাসের সাথে মা'মুনের মুনাযিরা

শেইখ মুফিদ (রহঃ) তার ইরশাদ নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ৭ম আব্বাসীয় খলিফা মা'মুন ইমাম জাওয়াদের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে যায়। কেননা সে ইমামের মধ্যে ঐ অল্প বয়েসেই এমন পূর্ণতা ও জ্ঞানের

চমক দেখতে পেয়েছিল যা সে সময়ে অনেক বয়স্কো জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও তা পরিলক্ষিত হত না বা ঐ ধরনের জ্ঞানে পৌছাতে তারা ছিল অপারগ। এ করণেই সে তার কন্যা উম্মুল ফাযলকে ইমামের সাথে বিয়ে দেয় এবং তাকে ইমামের সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। আর ইমামের শানে প্রচুর পরিমানে সম্মান প্রদর্শন করে।

হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান (তার নিজস্ব সনদে), রিয়্যান ইবনে সাবিব এক উদ্ধৃতি দিয়ে রেওয়ায়েত করেন যে ঃ যেহেতু মা'মুন তার কন্যাকে ইমামের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিল, এ বিষয়টি বানি আব্বাসের সকলেই জানতে পেরে দারুণভাবে রাগান্বিত হয়। তারা এটা ভেবে ভয় পাচ্ছিল যে, হয়তো ইমামের পিতা ইমাম রেযার (আঃ) মতই মা'মুন তাকেও ওয়ালি আহাদ পদে অধিষ্টি করবে এবং তারপর থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতা বনি হাশিমের হাতে চলে যাবে। তারা সবাই একত্রি হল এবং এ বিষয়ে আলোচনা করলো ও মা'মুনের কাছে এসে বলল ঃ হে আমিরুল মু'মিনিন! আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আপনি এ কাজ করা থেকে বিরত হোন। কেননা আমরা ভয় পাচ্ছি এই ভেবে যে, যে ক্ষমতা আল্লাহ্ আমাদেরকে হাতে করে দিয়েছেন তা এই কাজের মাধ্যমে হাত ছাড়া করে ফেলবো এবং ইজ্জত-সম্মানের যে পোশাক আল্লাহ্ আমাদেরকে পরিয়েছেন তা আমরা নিজেরাই আমাদের শরীর থেকে খুলে ফেলবো। কেননা আপনি খুব ভাল করেই আমাদের সাথে বনি হাশিমের অতীত শত্রুতা এবং যেভাবে আমাদের অতীত খলিফগণ তাদের ইমামগণকে অপমান-অপদস্থ করেছেন আর বর্তমানে আপনি ইমাম রেযার (আঃ) সাথে যা করেছেন এর সব কিছুই তাদের জানা আছে। আপনাকে আবারও আল্লাহ্ কসম! একটু গভীর দৃষ্টিতে ভেবে দেখুন। কেননা সবে মাত্র একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলাম, কিন্তু তা আপনি হতে দিচ্ছেন না। আলী ইবনে মুসা রেযার (আঃ) সন্তানের সাথে আপনার কন্যার বিয়ের সম্মতিকে

ফিরিয়ে নেন এবং বনি আব্বাসের মধ্যে থেকে ভাল ছেলে পছন্দ করে তার সাথে আপনার কন্যার বিয়ে দিন।

মা'মুন বনি আব্বাসের আপত্তির মুখে বলল ঃ 'যা কিছু তোমাদের ও আবু তালিবের সন্তানদের মধ্যে বিদ্যমান তার জন্য তোমারই দায়ী। যদি তোমরা ইন্সাফের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাও তবে তারা তোমাদের থেকে খেলাফতের জন্য অধিক উপযুক্ত। কিন্তু অতীত খলিফাগণ তাদের (যাদের কথা তোমরা বলছো) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। আল্লাহ্র কাছে সাহায্য কামনা করছি এই জন্য যে, আমিও তাদের সিলসিলা অনুসারে কাজের আঞ্জাম দিয়েছি। তবে আল্লাহ্র কসম! আমি আমার ওয়ালী আহাদ (খলিফার স্থলাভিষিক্ত, অর্থাৎ খলিফার ইন্তেকালের পরে এই ওয়ালী আহাদই হবে পরবর্তী খলিফা) ইমাম রেযার (আঃ) সাথে যা করেছি তার জন্য একটুও অনুতপ্ত নই। কেননা সত্য সত্যই আমি তার কাছে চেয়েছিলাম যে, সে খেলাফতকে গ্রহণ করুক আর আমি তা থেকে দূরে সরে যাবো। কিন্তু সে তা করতে রাজি হল না, যা তোমরা দেখেছো।

আর এই যে, আমি হযরত জাওয়াদকে (আঃ) আমার কন্যার জন্য পছন্দ করেছি তার কারণ হচ্ছে এই অল্প বয়সে তাঁর জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় দক্ষতা। সে বর্তমান সময়ের সব থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি। কেননা তাঁর জ্ঞান হচ্ছে আশ্চার্য ধরনের। আমি এটাতে বিশ্বাসী যে, আমি তাঁর ব্যাপারে যা জানি তা তোমাদের ও মানুষের জন্য উম্মুক্ত হোক। আর তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে, কেন আমি তাকে পছন্দ করেছি এবং আমি তাঁর ব্যাপারে যা বলছি তা সত্যে প্রমাণিত হবে'।

তারা মা'মুনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলল ঃ এই অল্প বয়েসের যুবক ছেলেটি যদিও সে তাঁর আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তোমাকে আশ্চর্যিত করেছে এবং তোমাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছে তথাপিও সে (যাই হোক না কেন) এখনও অনেক ছোট। আর তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি অনেক কম। সুতরাং তাকে সময় দাও যাতে করে সে অধিক জ্ঞান অর্জন করে বিজ্ঞ হতে পারে, তারপর তাঁর ব্যাপারে যা কিছু করতে চাও করো।

মা'মুন বলল ঃ তোমাদের কি হবে! আমি তোমাদের থেকেও এই যুবকের ব্যাপারে বেশী অবগত এবং তোমাদের থেকে তাকে অধিক পরিমানে জানি। এই যুবক এমন এক পরিবারের যারা খোদায়ী জ্ঞানে

জ্ঞানান্বিত এবং আল্লাহ্র অসীম জ্ঞান ও ইলহামসমূহ তাদের কাছে প্রেরীত হয়েছে। তার পূর্বপুরুষগণ দ্বীনি জ্ঞান ও নৈতিকতায় সর্বদা সবার কাছ থেকে অমুখাপেক্ষি ছিল। আর অন্যরা তাদের পর্যায়ে পৌছাতে অক্ষম এবং সর্বদা তাদের মুখাপেক্ষি ছিল ও আছে। যদি তাকে পরীক্ষা করতে চাও তবে সেক্ষেত্রে আমার কথাই সত্য বলে প্রমাণ হবে।

তারা বলল ঃ এটা খুব ভাল কথা। আমরা তাকে পরীক্ষা করতে একমত। তাহলে অনুমতি দিন আমরা আপনার সম্মুখে কয়েকজনকে হাজির করি, যাতে তারা তাঁর কাছে ফীকাহ্ শাস্ত্রের ব্যাপারে এবং দ্বীনের মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। সে যদি ঐ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। আর আপনার কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাবো না। তখন আপনার কাছে দুরের ও কাছের লোক কারা তা পরিস্কার হয়ে যাবে। আর যদি সে প্রশ্নের উপর না দিতে পারে তবে সেক্ষেত্রে আমাদের কথাকেই সত্য প্রমাণিত করবে যে, আমরা উপযুক্ত সময় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি।

মা'মুন বলল ঃ যখনই তোমরা তাঁর পরীক্ষা নিতে চাও তখনই তা করতে পার। তবে আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো।

তারা মা'মুনের কাছ থেকে চলে গেল এবং সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটা নির্দিষ্ট হল যে, ইয়াহ্হিয়া ইবনে আকছামকে (ততকালীন বিজ্ঞ বিচারক) ইমামের কাছে প্রশ্ন করার জন্য হাজির করবে যাতে করে সে প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ময়দানের বীর পুরুষ ইমাম জাওয়াদ (আঃ) ঃ

বিরোধীতাকারীগণ ইয়াহ্হিয়া ইবনে আকছামের কাছে গেল এবং অনেক টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ইমামের সাথে মুনাযিরা করার জন্য

রাজি করালো।

তারপর মা'মুনের কাছে গিয়ে মুনাযিরার দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করতে বলল। মা'মুন একটি দিন নির্ধারণ করলো। ঐ দিনে বড় বড় আলেম ওলামাগণ ও ইয়াহ্হিয়া ইবনে আকছাম এবং স্বয়ং মা'মুন নিজেও মুনাযিরার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হল। মা'মুনের নির্দেশে ইমামের জন্য একটি

নরম বিছানা তৈরী করা হল এবং হেলান দেয়ার জন্য সেখানে দুটি বালিশও রাখা হল। নয় বছর বয়োস্ক ইমাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন এবং ঐ তৈরীকৃত বিছানায় দুই বালিশের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। ইয়াহ্হিয়া ইবনে আকছাম ইমামে মুখো-মুখি বসলো। অন্যরা তাদের নিজ নিজ স্থানে বসলো। মা'মুন ইমামের পাশেই তৈরীকৃত নরম বিছানায় বসেছিল।

ইয়াহ্হিয়া ইবনে আকছাম মা'মুনের দিকে ফিলে বলল ঃ হে আমিরুল মু'মিনিন। হযরত জাওয়াদের কাছে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি দিবেন কি?

মা'মুন ঃ তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ কর।

এবার ইয়াহ্হিয়া ইবনে আকছাম ইমামের দিকে ফিলে বলল ঃ আপনাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিবেন কি?

ইমাম ঃ হ্যাঁ, প্রশ্ন কর।

ইয়াহ্ইয়া ঃ কোন ব্যক্তি যদি মুহ্‌রেম অবস্থায় কোন জন্তুকে হত্যা করে সে ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ইমাম ঃ সে কি হারাম শরীফের মধ্যে হত্যা করেছে না বাইরে? হজ্জের মাসায়েলের ব্যাপারে তার জানা ছিল, না জানা ছিল না? ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে না ভুলবশতঃ? ঐ ব্যক্তি স্বাধীন ছিল না কারো গোলাম ছিল? ছোট ছিল না বড়? প্রথমবার এরূপ কাজ করেছে না এর আগেও এমন কাজ করেছে? ঐ শিকারটি কি পাখি ছিল না অন্য কিছু? ছোট শিকার ছিল না বড়? এ কাজে সে কি ভয় পেয়েছিল বা অনুতপ্ত হয়েছিল? রাতে ঘটেছিল না দিনে? ওমরাহ্ পালনের জন্য মুহ্‌রেম ছিল না তামাত্তু পালনের জন্য মুহ্‌রেম ছিল? হজ্জে পালনীয় ২২টি বিষয়ের মধ্যে এটা কোন পর্যায়ের ছিল? কেননা প্রত্যেকটির জন্য ফতোয়া হচ্ছে ভিন্ন

ধরনের।

ইয়াহ্ইয়া এতগুলো প্রশ্নের সম্মুখে হতভম্ব হয়ে গেল এবং কোন একটিরও জবাব না দিতে পেরে চরম দুরাবস্থায় পড়লো। তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উপস্থিত সবাই ইমামের সম্মুখে তার পরাজিত হওয়াটা স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করলো।

মা'মুন বলল ঃ আমাদেরকে এই নে'য়ামত দানের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। কেননা আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ঘটলো। তারপর সে তার নিজের বংশের লোকজনদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল ঃ এখন কি তোমরা বুঝতে পেরেছো, যা তোমরা মনে করছিলে তা ছিল নিছক কল্পনা?

এরপর সে ইমামের সাথে তার কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করলো[১]।

---

[১]। ইরশাদ- শেইখ মুফিদ, খণ্ড-২, পৃঃ-২৬৯-২৭৩।

৩০- যে মুনাযিরাতে ইরাকের দার্শনিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল

ইসহাক কেন্দি ইরাকের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল। সে সেখানে দার্শনিক হিসেবে পরিচিত ছিল। সে কাফের থাকা সত্বেও কোরআন পড়েছিল। সে কোরআন পড়ার সময় লক্ষ্য করলো যে, কিছু কিছু আয়াত অন্য কিছু কিছু আয়াতের সাথে বাহ্যিকভাবে মিল নেই। বরং একটি অপরটির বিপরীত। সে সিদ্ধান্ত নিল যে, কোরআনের ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করে একটি বই লিখবে। সে তার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ শুরু করলো। তার একটি ছাত্র ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে ইমামের কাছে উক্ত ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরলো।

ইমাম তাকে বললেন ঃ তোমারদের মধ্যে কি এমন কেউ সাহসী ব্যক্তি নেই, যে দলিলের ভিত্তিতে (নিজের শিক্ষক) কেন্দিকে এই কাজ করা থেকে দুরে রাখতে পারে?!

সে বলল ঃ আমরা তার ছাত্র, কিভাবে তাকে এ কাজ করা থেকে দুরে সরাবো?

ইমাম বললেন ঃ তোমাকে একটা কিছু শিখিয়ে দিব। তারপর তার কাছে গিয়ে উক্ত বিষয়টি তাকে বলবে। যেভাবে আমি তোমাকে বলছি, "তার কাছে গিয়ে তুমি তাকে এই কাজে সাহায্য করবে। যখন তার সাথে বন্ধু হয়ে যাবে তখন তাকে বলবে, - কোরআন যার বাণী সম্বলিত (আল্লাহ্) সে যদি তোমার কাছে আসে তাহলে কি এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, তুমি কোরআনের আয়াত সম্পর্কে যা বুঝেছো এবং যে অর্থ করেছো তা তার নির্দিষ্ট অর্থ ও বর্ণনার থেকে আলাদা?

তখন সে বলবে, হ্যাঁ সম্ভাবনা আছে।

তখন তুমি তাকে বলবে যে, আপনি এ ব্যাপারে সঠিক কিছু জানেন কি? হয়তো উক্ত আয়াতের অর্থ আপনি যা বুঝেছেন তার ভিন্ন।

ঐ ছাত্রটি ইসহাকের কাছে গেল এবং কিছু সময় তার অধিনে কাজ করলো। কিছু দিন পার হওয়ার পর ইমামের নির্দেশ মোতাবেক তাকে বলল ঃ আচ্ছা এটার সম্ভাবণা আছে কি যে, আপনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে যে অর্থ বুঝেছেন আল্লাহ্ হয়তো ঐ আয়াতের মাধ্যমে অন্য অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন?

কেন্দি কিছু সময় নিরব থেকে বলল ঃ তোমার প্রশ্নটিকে আরেকবার বল, ছাত্রটি দ্বিতীয়বার তার প্রশ্নটিকে বয়ান করলো।

কেন্দি ঃ হ্যাঁ, এটা সম্ভব যে, উক্ত আয়াতসমূহের অর্থ আল্লাহ্ অন্য কিছু স্থির

করেছেন যা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। তারপর সে তার ছাত্রের দিকে ফিরে বলল ঃ এই বিষয়টি তোমাকে কে শিখিয়েছে?

ছাত্র বলল ঃ আমার নিজের কাছে এরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে।

কেন্দি ঃ এই বিষয়টি একটি উচ্চমানের জ্ঞানগর্ভ বিষয়। তুমি এখনো ঐ পর্যায়ে পৌছাওনি যে, তোমার মাথায় এত বড় জ্ঞানী বিষয় উদ্ভব হবে।

ছাত্র ঃ এ বিষয়টি ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) কাছে শিখেছি।

কেন্দি ঃ এখন সত্য বললে। এরূপ বিষয়সম্পর্কে এই পরিবার ব্যতীত অন্য কোথাও শোনা যাবে না।

তারপর সে তার কোরআনের ক্রটির উপর লিখিত পুস্তকটি আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে ফেললো[১]।

---

[১]। আনোয়ারুল বাহিয়্যা, পৃঃ- ৩৪৯-৩৫০।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বিভিন্ন দলের সাথে ইসলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুনাযিরা



৩১- সিবত ইবনে জৌওযীর সাথে এক বিজ্ঞ মহিলার মুনাযিরা

সিবত ইবনে জৌওযী নামে সুন্নী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। যিনি বিভিন্ন মূল্যবান বইও লিখেছেন। তিনি কখনো কখনো বাগদাদের মসজিদে জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্যও দিতেন। অবশেষে ৫৯৭ হিজরীর ১২ই রমযান বাগদাদেই এ পৃথিবীকে বিদায় জানান[১]।

ইমাম আলীর (আঃ) একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি সব সময় সকলকে বলতেনঃ سلوني قبل ان تفقدوني -আমাকে তোমরা হারিয়ে ফেলার আগে যা তোমাদের জানার আছে তা আমার কাছে জেনে নাও।

এমন কথা শুধুমাত্র ইমাম আলী (আঃ) ও অন্যান্য মা'সুমগণের (আঃ) পক্ষে বলাটাই শোভা পায়। কেননা তাঁরা ইলমে গাইবের (গোপন জ্ঞান) অধিকারী ছিলেন। আর এরূপ কথা অন্যদের বলাটা একেবারেই বেমানান ব্যাপার। এরূপ একটি ঘটনা আমরা এখানে লক্ষ্য করবো, যা সিবত ইবনে জাওযী ও এক মহিলার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলঃ

একদিন সিবত ইবনে জাওযী মিম্বারে উঠে সকলের উদ্দেশ্যে ঐ কথাটি বললঃ سلوني قبل ان تفقدوني।

শিয়া-সুন্নী, পুরুষ-মহিলা অনেকেই তার আলোচনায় উপস্থিত ছিল। হটাৎ করে তাদের মধ্য থেকে একজন মহিলা দায়িড়ে বলল ঃ আমাকে বল দেখি, এ কথাটি কি ঠিক যেমন বলা হয়েছে যখন একদল মুসলমান উসমানকে হত্যা করেছিল তখন তার মৃত দেহটি তিন দিন যাবৎ পড়ে ছিল এবং কেউ তাকে মাটি দেয়ার জন্য উপস্থিত হয় নি।

সিবত ঃ হ্যাঁ, কথাটি সত্য।

মহিলা ঃ এ কথাটি কি ঠিক যে, যখন মাদায়েনে (যেখানে সালমানকে জনাব ওমর বনবাস দিয়েছিল) সালমান মৃত্যুবরণ করেন তখন আলী (আঃ) মদীনা থেকে অথবা কুফা থেকে মাদায়েনে গিয়ে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাযার নামায পড়ে সম্মানের সাথে দাফন করে ফিরে আসেন?

সিবত ঃ হ্যাঁ, কথাটি সত্য।

মহিলা ঃ তাহলে ইমাম আলী (আঃ) উসমানের মৃত্যুতে যখন কিনা তিনি মদীনায় ছিলেন তারপরও কেন তিনি তাকে মাটি দিতে যান নি? অতএব, যা চোখে পড়ে তা

---

[১]। সাফিনাতুল বাহার ঃ খণ্ড-১, পৃঃ-১৯৩।

হচ্ছে হয় আলী (আঃ) উসমানের মাটি দিতে না গিয়ে ভুল করেছেন অথবা মু'মিন ব্যক্তি ছিল না তাই আলী (আঃ) তার দাফন কর্মে শরীক হওয়া থেকে দূরে থেকেছেন। (তিন দিন পরে গোপনে কয়েকজন মিলে কবরস্থানে বাকীর পিছনে ইয়াহুদিদের কবরস্থানে তাকে দাফন করে। ঘটনাটি তারিখে তাবারী এরূপে উল্লেখ করেছে, খণ্ড-৯, পৃঃ-১৪৩)।

সিবত ইবনে জাওযী এই প্রশ্নে দারুণভাবে বিপাকে পড়লো, কেননা যদি ঐ দুইজনের মধ্যে যে কোন একজনকে [আলী (আঃ) অথবা উসমান] ভুল কাজ সম্পাদনকারী হিসেবে গণ্য করে তবে তা হবে তার আক্বীদা-বিশ্বাস বিরোধী। কেননা সে উক্ত দুইজনকেই খলিফা হিসেবে গ্রহণ করে। তাই সে এভাবে বলল ঃ

হে সম্মানীতা মহিলা! যদি তুমি তোমার স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাড়ীর বাইরে এসে না-মাহারামদের (শরীয়তের দৃষ্টিতে যাদের সাথে বিয়ে করায় কোন অসুবিধা নেই) সামনে এভাবে আমার সাথে কথা বলে থাকো তবে আল্লাহ্র লানত যেন তোমার স্বামীর উপর বর্তায়, আর যদি তুমি তোমার স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ীর বাইরে এসে থাকো এবং এভাবে কথা বলে থাকো তবে যেন তোমার উপর আল্লাহ্র লানত হয়।

ঐ বিচক্ষণ মহিলা, এ কথা শুনেই তড়িৎ গতিতে বলল ঃ হযরত আ'য়েশা যে আমিরুল মু'মিনিন আলীর (আঃ) সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাড়ীর বাইরে এসেছিলেন এবং জাঙ্গে জামালের মত এক কঠিন যুদ্ধকে পরিচালনা করেছিলেন, তিনি কি এ কাজ তার স্বামী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) অনুমতি নিয়ে করেছিলেন না তাঁর বিনা অনুমতিতে?

সিবত ইবনে জাওযী, এই প্রশ্নেরও উত্তর না দিতে পেরে দারুণভাবে হয়রান হয়ে গেল। কেননা সে যদি বলে, হযরত আ'য়েশা তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ীর বাইরে এসেছেন তবে তাকে সীমা লংঘনকারী বলা হয় (যা সত্য)। আর যদি বলে যে, তিনি তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাড়ীর বাইরে এসেছেন তবে আলীকে (আঃ) সীমা লংঘনকারী বলা হয় (যা মিথ্যা)। সে ভেবে দেখলো যে, এ দুটি উত্তরের কোনটাই সঠিক নয় তাই উপায়হীন হয়ে মিম্বার থেকে নেমে এল এবং বাড়ী চলে গেল[১]।

---

[১]। আস্ সিরাতুল মুসতাকিম, বিহারুল আনোয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে, খণ্ড-৮, পৃঃ-১৮৩।

৩২- বেহ্লুলের এক আঘাতে তিনিটি প্রশ্নের উত্তর

ইমাম কাযেমের (আঃ) সময়ে বেহ্লুল ইবনে আমরু নামে কুফা শহরে এক অতি চালাক ও উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি ছিল। তাকে যেন হারুনের দরবারের কাজী হতে না হয়, তাই সে পাগল হয়ে গেছে এমন ভাব করতো। যাতে করে হারুন তাকে কাজী হওয়া থেকে রেহাই দেয়। সে তুখড় মুনাযিরায় পারদর্শি ছিল এবং কখনো কখনো অতি সুক্ষ্ম দলিলের ভিত্তিতে অন্যের দলিলহীন আক্বীদা-বিশ্বাসকে (যা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো) মানুষের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরতো। এমনই এক মুনাযিরাহ্ এরূপ ছিল ঃ সে শুনতে পেরেছিল যে, আবু হানিফা (হানাফি মাযহাবের ইমাম) তার ছাত্রদের সামনে বলেছে 'জা'ফার ইবেন মুহাম্মদ [ইমাম সাদিক (আঃ)] তিনটি বিষয় বয়ান করেছেন কিন্তু আমি উক্ত তিনটি বিষয়কে গ্রহণ করি না, যা নিম্নরূপ ঃ

১- 'শয়তানকে আগুনের মধ্যে ফেলে আজাব দেয়া হবে'-এটা ঠিক নয়, কেননা শয়তান তো নিজেই আগুনের তৈরী। আর যাকে আগুন দিয়ে তৈরী করা হয়েছে তাকে আবার কিভাবে আগুন দিয়ে আজাব দেয়া হবে। তা কখনোই হতে পারে না।

২- 'আল্লাহ্কে দেখা যাবে না' -এটাও ঠিক নয়, কেননা প্রতিটি অস্তিত্বমান জিনিষই কষ্ট হলেও দেখা সম্ভব।

৩- 'আল্লাহ্র বান্দাগণ যে সকল কাজ করে থাকে তা তাদের নিজেদের ইচ্ছায় করে থাকে'-এটাও ঠিক নয়, কেননা অনেক আয়াত ও রেওয়ায়েত এই কথার বিপরীতে রয়েছে এবং বান্দাগণ যে কাজ করে থাকে তা যে আল্লাহ্র নির্দেশেই তার প্রমাণ করে।

এ সব শোনার পরে বেহ্লুল, একখণ্ড মাটি হাতে নিয়ে আবু হানিফার কপালে ছুড়ে মারলো। আবু হানিফা বেহ্লুলের ব্যাপারে হারুনের কাছে অভিযোগ জানালো। হারুন তাকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলো। সে দরবারে হাজির হলে তাকে সাজা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়।

বেহ্লুল হারুনের দরবারে হাজির হয়ে আবু হানিফাকে বলল ঃ

১- মাটি টুকরোটি যেখানে লেগেছে সেখানে নাকি তোমার ব্যাথা

হয়েছে বলেছো, সেই ব্যাথাকে আমায় দেখাও। যদি দেখাতে না পারো তাহলে তুমি যা বলেছো, সমস্ত অস্তিত্বসম্পন্ন কিছুকেই দেখা যায় সেটা ভূল।

২- তুমি বলেছো যে, একই প্রকৃতির জিনিষ কখনো একে অপরকে আজাব দিতে পারে না। তাহলে তুমি তো মাটি থেকে সৃষ্টি সেহেতু মাটির আঘাতে তোমার ব্যাথা পাওয়ার কথা নয়।

৩- আমি তোমাকে মাটি টুকরোটি ছুড়ে মারাতে কোন অন্যায় করি নি, কারণ তোমার বিশ্বাস মতে বান্দা তার সমস্ত কাজই আল্লাহ্ নির্দেশে করে থাকে। সুতরাং আমি নই বরং আল্লাহ্ তোমাকে মেরেছে!!

আবু হানিফা চুপ করে কিছু সময় বসে থাকার পর উক্ত দরবার ছেড়ে চলে যায়। সে এটা বুঝতে পেরেছিল যে, বেহ্লুলের আঘাতটি তার উল্টো-পাল্টা আক্বীদা-বিশ্বাসের কারণেই ছিল[১]।

---

[১]। মাজালিসুল মু'মিনিন, খণ্ড-২, পৃঃ-৪১৯, বিহ্জাতুল আমাল, খণ্ড-২, পৃঃ-৪৩৬।

৩৩- বেহ্লুল উযিরকে একটি চমৎকার উত্তর দিল

হারুনের দরবারের উযির একদিন বেহ্লুলকে বলল ঃ তোমার অনেক বড় কপাল, কেননা খলিফা তোমাকে শুকর ও হিংস্র পশুদের পরিচালক করেছেন।

বেহ্লুল তড়িৎ গতিতে বলে উঠলো ঃ তুমি যখন এ কথাটি বুঝেই ফেলেছো তবে আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে উঠবে না!!

বেহ্লুল এরূপে উযিরকে শুকর ও হিংস্র পশু বানিয়ে দিল। দরবারে উপস্থিত সবাই এ কথায় হেসে উঠলো, কিন্তু উযির আসল ব্যাপাটা ঠিকই বুঝতে পারলো[১]।

---

[১]। বিহ্জাতুল আমাল, খণ্ড-২, পৃঃ-৪৩৭।

৩৪- জাবৃরী মাযহাবের এক শিক্ষকের সাথে শিয়া মাযহাবের বিশিষ্ট আলেমের মুনাযিরা

একদিন যুরার ইবনে যাবি (সুন্নী মাযহাবের উচ্চ পর্যায়ের আলেম ও জাবরী মাযহাবের প্রধান) ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ হারুনের উযিরের কাছে এসে কিছু সময় কথোপকথন করে বলল ঃ আমি মুনাযিরা করার জন্য তৈরী আছি। যার সাথেই বলবে আমি তার সাথেই মুনাযিরা করার জন্য প্রস্তুত।

ইয়াহিয়া বলল ঃ তুমি কি 'শিয়া মাযহাবের রুকনের' সাথে মুনাযিরাহ্ করতে প্রস্তুত?

যুরার বলল ঃ হ্যাঁ, যে কোন ব্যক্তির সাথেই মুনাযিরাহ্ করতে প্রস্তুত আছি।

ইয়াহিয়া, হিশাম ইবনে হাকামকে [ইমাম সাদিকের (আঃ) উচ্চ পর্যায়ের ছাত্র] দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য পয়গাম পাঠালো। হিশাম উপস্থিত হল এবং নিম্নরূপে তাদের মুনাযিরা শুরু হল ঃ

হিশাম ঃ ইমামতের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির উপযুক্ততাকে কি বাহ্যিক দিক থেকে বুঝা যায়, না আভ্যন্তরীণ দিক থেকে?

যুরার ঃ আমরা বাহ্যিকভাবে বুঝে থাকি, কেননা মানুষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ওহী ব্যতীত অন্য কোন ভাবে বুঝা যায় না।

হিশাম ঃ ঠিক বলেছো। এখন বল দেখি, জনাব আবু বকর এবং আলীর (আঃ) মধ্যে কে উম্মুক্ত তরবারী হাতে রাসূলের (সাঃ) পক্ষে প্রতিরক্ষা করেছিল, কে নিজেকে রাসূলের (সাঃ) জন্য উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিল, কে রাসূলের (সাঃ) শত্রুদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল, কে ইসলামের অধিকাংশ যুদ্ধে বিজয় নিয়ে এসেছিল?

যুরার ঃ জিহাদের ক্ষেত্রে আলী (আঃ) একটি উচ্চ মর্যাদা রাখতেন কিন্তু আবু বকর আধ্যাত্মিকতার (আভ্যন্তরীণ দিক থেকে) ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান দখল করে ছিলেন।

হিশাম ঃ এই যে, তুমি আধ্যাত্মিকতার কথা বলছো; কিন্তু আমরা তো তোমার কথা মতো বাহ্যিক দিকের কথা বলছিলাম। আর তুমি জিহাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আলী (আঃ) যে বাহ্যিকভাবে নেতৃত্ব দানের উপযোগী তা স্বীকার করেছো।

যুরার ঃ হ্যাঁ, বাহ্যিকভাবে তা ঠিক আছে।

হিশাম ঃ যদি কারো বাহ্যিক ভাল দিকসমূহ আভ্যন্তরীণ ভাল দিকসমূহের সাথে একাকার হয়ে যায়, তবে কি তা ঐ ব্যক্তির সকল ক্ষেত্রে বিশেষ উপযক্ততা প্রমাণ করে না?

যুরার ঃ অবশ্যই তা ঐ ব্যক্তির সকল ক্ষেত্রে বিশেষ উপযুক্ততা প্রমাণ করে।

হিশাম ঃ তুমি অবশ্যই জেনে থাকবে যে, এমন অনেক হাদীস রয়েছে (যা ইসলামের সকল মাযহাবের কাছেই গ্রহণীয়) যেখানে রাসূল (সাঃ) আলীর (আঃ) মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেনঃ

انت منّي بمنـــزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي

"তোমার আমার সম্পর্ক ঐরূপ যেরূপ হারুন ও মুসার (আঃ) মধ্যে ছিল, শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এটাই যে আমার পরে আর কোন নবী আসবে না"।

যুরার ঃ এই হাদীসটিকে আমিও গ্রহণ করি। (কেননা সে বলেছিল যে, আভ্যন্তরীণ বিষয় শুধুমাত্র ওহীর মাধ্যমে বুঝা যায়, আর নবী (সাঃ) ওহী প্রাপ্তের মাধ্যমেই কথা বলে থাকেন, তাই সে এই বিষয়টি গ্রহণ করেছিল)।

হিশাম ঃ এটা কি কখনো হতে পারে যে, নবী (সাঃ) আলীর (আঃ) মধ্যে কোন উত্তম কিছু না দেখতে পেয়েই তিনি তাঁর ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করেছেন?

যুরার ঃ না, তা কখোনই হতে পারে না। আলীর (আঃ) মধ্যে ঐরূপ আধ্যাত্মিকতা ছিল বলেই নবী (সাঃ) তাঁর ব্যাপারে এরূপ বলেছেন।

হিশাম ঃ সুতরাং তোমার কথা মতই, আলী (আঃ) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে, নবীর (সাঃ) পরেই অন্য সকলের থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আর সে কারণেই তিনি অন্য সবার থেকে ইমামত ও নেতৃত্ব

দানের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী[১]।

[১]। ফুসুলল মুখতার- সাইয়্যেদ মুরতাযা, খণ্ড-১, পৃঃ-৯, কামুসুর রিজাল, খণ্ড-৯, পৃঃ-৩৪২।

৩৫- আবু হানিফার সাথে ফায্যালের মুনাযিরা

ইমাম সাদিকের (আঃ) সময়ে আবু হানিফা (হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা) কুফার মসজিদে তার ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করতো।

একবার ইমাম সাদিকের (আঃ) বিশেষ স্মৃতিশক্তির অধিকারী 'ফায্যাল বিন হাসান' নামে এক ছাত্র তার এক বন্ধুর সাথে ঘুরতে ঘুরতে উক্ত মসজিদে এসে পৌছায়। তারা সেখানে পৌছে দেখলো কিছু লোক আবু হানিফার চার পাশে গোল হয়ে বসে আছে। আর সে তাদেরকে শিক্ষা দান করছে। ফায্যাল তার বন্ধুকে বলল ঃ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে ফিরে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত আবু হানিফাকে শিয়া মাযহাব গ্রহণ না করাচ্ছি। এই বলে সে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে, আবু হানিফার ছাত্রদের পাশে গিয়ে এক কোণে চুপ করে বসলো। তারপর সে আবু হানিফার সাথে মুনাযিরা করার জন্য নিজের প্রশ্নগুলোকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করলোঃ

ফায্যাল ঃ হে শিক্ষা দানকারী! আমার একটি ভাই আছে, সে আমার থেকেও বড়। সে শিয়া মাযহাবের অনুসারী। আমি তাকে জনাব আবু বকরের উপযুক্ততার ব্যাপারে যতই দলিল-প্রমাণ পেশ করি, (যাতে করে সে যেন সুন্নী মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়) কিন্তু সে আমার সমস্ত দলিল-প্রমাণকে খণ্ডন করে দেয়। এখন আপনার কাছে আমার কামনা হচ্ছে যে, আপনি আমাকে আলীর (আঃ) থেকে জনাব আবু বকর ও ওমর যে উত্তম ও উপযুক্ত তার ব্যাপরে দলিল-প্রমাণ শিক্ষা দেন। যাতে করে আমি যেন আমার ভাইয়ের সামনে তা উপস্থাপন করে তাকে সত্য বুঝাতে সক্ষম হই।

আবু হানিফা ঃ তোমার ভাইকে বল যে, সে কোন দলিলের ভিত্তিতে আবু বকর ও ওমরকে আলীর (আঃ) উপরে স্থান দেয়? যখন কিনা যুদ্ধের সময় ঐ দু'জনকে নবী (সাঃ) তাঁর নিজের পাশে বসিয়ে রাখতেন আর আলীকে যুদ্ধে পাঠাতেন। আর এটাই হচ্ছে উপযুক্ত দলিল যে, নবী (সাঃ) তাদের দু'জনকে অধিক ভালবাসতেন। তাই তাদের জীবনের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

ফায্যাল ঃ আমি আমার ভাইকে এই দলিলটিও দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার এই দলিলের বিপরীতে বলল ঃ পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মতে আলী (আঃ) যেহেতু যুদ্ধে গিয়েছিল এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেছিল সে জন্য সে উত্তম। কেননা কোরআন বলছেঃ

و فضل الله المجاهدون على القاعدين اجراً عظيماً

"আল্লাহ্ তা'য়ালা মুজাহিদদেরকে যারা মুজাহিদ নয় তাদের উপরে স্থান দিয়েছেন"[১]।

আবু হানিফা ঃ তোমার ভাইকে বল যে, সে কোন দলিলের ভিত্তিতে আবু বকর ও ওমরকে আলীর (আঃ) উপরে স্থান দেয়? যখন কিনা তাদের দু'জনের কবর নবীর (সাঃ) কবরের পাশে, আর আলীর (আঃ) করব হচ্ছে কয়েক'শ কিলোমিটার দূরে! অতএব, এ বিষয়টিই তাদের দু'জনের জন্য অধিক সম্মানের ও মর্যাদার ব্যাপার।

ফায্যাল ঃ আমি আমার ভাইকে এই দলিলটিও দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার এই দলিলের বিপরীতে বলল ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেঃ

لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم

"নবীর (সাঃ) বিনা অনুমতিতে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করো না"[২]।

আমাদের সামনে এটা পরিস্কার যে, নবীর (সাঃ) কবরটি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তিনি অবশ্যই এরূপ অনুমতি আর কাউকে দেন নি। যেমন তাঁর উত্তরসূরীদেরকেও দেন নি।

আবু হানিফা ঃ তোমার ভাইকে বল যে, আ'য়েশা ও হাফছা তারা স্ত্রী হিসেবে নবীর (সাঃ) কাছে দেন-মোহ্র পাওনা ছিল, তাই তারা দেন-মোহ্রের স্থানে উক্ত জমি নিয়েছিল এবং তাদের পিতাদেরকে দান করছে।

ফায্যাল ঃ আমি আমার ভাইকে এই দলিলটিও দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার এই দলিলের বিপরীতে বলল ঃ তুমি কি কোরআন পড় নি?

কেননা কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

يا ايها النبي انا احللنا ازواجك التي اتيت اجورهن

"হে নবী! আমরা তোমার স্ত্রীগণকে তোমার প্রতি হালাল করেছি যেহেতু তুমি তাদের দেন-মোহ্র দিয়ে দিয়েছো"[৩]।

সুতরাং নবী (সাঃ) জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের দেন-মোহ্র প্রদান করে গিয়েছিলেন।

আবু হানিফা ঃ তোমার ভাইকে বল যে, আ'য়েশা ও হাফছা তারা স্ত্রী হিসেবে নবীর (সাঃ) কাছে মৌরুসী সম্পত্তির পাওনাদার ছিল, তাই তারা উভয়ই ঐ বাড়ীর এক এক অংশকে নিয়েছিল এবং তা তাদের পিতাদেরকে দান করেছিল। আর এই ভাবেই

---

[১]। নিসা ঃ ৯৭।

[২]। নিসা ঃ ৫২।

[৩]। আহযাব ঃ ৪৯।

তারা সেখানে দাফন হয়েছেন।

ফাযৃযাল ঃ আমি আমার ভাইকে এই দলিলটিও দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার এই দলিলের বিপরীতে বলল ঃ তোমরা যারা সুন্নী মাযহাবের অনুসারী তারাই তো বিশ্বাস কর যে, নবী (সাঃ) ইন্তেকালের পরে কোন কিছুই তার পরিবারের ব্যক্তিদের জন্য মৌরুসী সম্পত্তি হিসেবে রেখে যান না। আর তাই তো হযরত ফাতিমা যাহ্রার (সালাঃ) ফাদাক সম্পত্তিকে তাঁর পিতা ইন্তোকালের পরে তাঁর কাছ থেকে এই দলিলের ভিত্তিতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর যদি এই বিষয়টি গ্রহণও করি যে, নবী (সাঃ) তাদের জন্য সম্পত্তি হিসেবে তা রেখে গেছেন; তবে তাঁর ইন্তেকালের সময় ৯ জন স্ত্রী জীবিত ছিল[১]। যদি প্রত্যেককে ঐ বাড়ীর অংশ প্রদান করা হয় তবে তারা সকলেই ঐ বাড়ীর লম্বা ও চওড়ায় এক বিঘৎ পরিমানে জায়গা পাবে। আর ঐ পরিমান জায়গায় একজন মানুষকে করব দেয়া যায় না।

আবু হানিফা এই উত্তর শোনার পরে চুপ হয়ে গেল। তারপর সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তার ছাত্রদেরকে বলল ঃ

اخرجوه فانه رافضي و لا اخ له

'তাকে এই সমজিদ থেকে বের করে দাও। কেননা সে নিজেই হচ্ছে রাফেযী আর তার কোন ভাইও নেই'[২]!!

[১]। যথাক্রমে ঃ আ'য়েশা, হাফছা, উম্মে সালামাহ্, উম্মে হাবিবাহ্, যয়নাব, ময়মুনাহ্, ছুফিয়াহ্, জুওয়াইরাহ্, সুদাহ্।

[২]। খাযায়েনু নারাকি, পৃঃ-১০৯।

৩৬- হাজ্জাজের সাথে এক সাহসিনী মহিলার মুনাযিরা

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছাকাফি (ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অত্যাচারী হিসেবে পরিচিত) আব্দুল মালেকের (৫ম আব্বাসীয় খলিফা) পক্ষ থেকে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিল। সে শিয়া মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন ঃ কুমায়েল, কাম্বার ও সাইদ বিন যুবাইরকে হত্যা করেছিল। আলীর (আঃ) সাথে তার শত্রুতা থাকার কারণেই তাদের উপর জুলুম এবং তাদেরকে হত্যা করেছিল।

একদিন 'হুর্‌রাহ্' নামে এক বিশেষ সাহসী মহিলা (হালিমা সাইদাহ্‌র নাতীন এবং পরবর্তীতে সে হালিমার কন্যা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল ও ইমাম আলীর বিশেষ ভক্ত ছিল) হটাৎ হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হল।

হাজ্জাজ ও হুর্‌রাহ্‌র মধ্যে এক বিশেষ মুনাযিরা অনুষ্ঠিত হয় যা নিম্নরূপ ঃ

হাজ্জাজ ঃ তুই কি হালিমা সাইদাহ্‌র কন্যা?

হুর্‌রাহ্ ঃ فراسة من غير مؤمن -এটা তো বে-ঈমান লোকের ধী-শক্তি। অর্থাৎ সে এই কথাতে বুঝালো যে, হ্যাঁ আমি হুর্‌রাহ্ হালিমার কন্যা (কিন্তু যেহেতু তোমার মত বে-ঈমান লোক আমাকে চিনতে পেরেছে সেহেতু এটা তোমার ধী-শক্তিরই পরিচয় বটে)।

হাজ্জাজ ঃ আল্লাহ্ তোকে এখানে এনেছে এবং আমার সামনে হাজির করিয়েছে। আমি শুনেছি যে, তুই নাকি আলীকে (আঃ) আবুবকর, ওমর ও উসমানের থেকে বেশী অগ্রাধিকার দিস।

হুর্‌রাহ্ ঃ তোমাকে এ ব্যাপারে যে ব্যক্তি বলেছে, সে মিথ্যা বলেছে। কেননা আমি

আলীকে (আঃ) শুধুমাত্র তাদের উপরেই স্থান দেই নি বরং তাকে পয়গম্বারগণ যেমন ঃ আদম, নূহ, লূত, ইব্রাহীম, মুসা, দাউদ, সুলাইমান ও ঈসার (আঃ) উপরেও স্থান দিয়ে থাকি।

হাজ্জাজ ঃ তোর কপালে তো দুঃখ আছে! তুই আলীকে সাহাবীদের এবং সাতজন পয়গম্বার যাদের মধ্যে আবার অনেকে হচ্ছেন 'উলুল আজম' (আসমানী কিতাবধারী) তাদের থেকেও উপরে স্থান দিয়েছিস? যদি তুই তোর বিশ্বাসের ব্যাপারে দলিল না আনতে পারিস তবে তোর দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলার নির্দেশ দিবো।

হুর্‌রাহ্ ঃ শুধু আমিই নই যে, আলীকে (আঃ) ঐ সকল পয়গম্বারগণের উপরে স্থান দিয়ে থাকি বরং আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে তাকে তাদের থেকে উপরে স্থান দিয়েছেন।

যেমন হযরত আদমের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন বলছেঃ

و عصى آدم ربه فغوى

- আদম তাঁর পরওয়ারদিগারের কথা অমান্য করেছে এবং সে পুরস্কার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে[১]।

কিন্তু আলীর (আঃ) ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন বলেছে ঃ

و كان سعيكم مشكوراً

- তোমারদের চেষ্টা ও পরিশ্রম, পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য[২]।

হাজ্জাজ ঃ হুর্‌রাহ্ তোকে অনেক ধন্যবাদ। এখন বল দেখি হযরত নূহ ও লূতের উপরে আলীকে স্থান দেয়ার ব্যাপারে তোর দলিল কী?

হুর্‌রাহ্ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তাদের উপরে স্থান দিয়েছেন। যেমন বলেছেনঃ

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرئة نوح و امرئة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً و قيل ادخلا النار مع الداخلين.

- যারা কাফের হয়েগিয়েছিল তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন হযরত নূহ্ ও লূতের (আঃ) স্ত্রীদ্বয়ের ব্যাপারে। তারা আমাদের দুই উত্তম বান্দার অভিভাকত্বে ছিল, কিন্তু তারা তাদের সাথে খিয়ানত করেছে। আর এই দুই নবীর সাথে তাদের সম্পর্ক (আল্লাহ্র আজাবের সম্মুখে) কোন ফল দেয় নি।

---

[১]। ত্মা-হা ঃ ১২১।
[২]। ইনসান ঃ ২২।

আর তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তাদের সাথে

জাহান্নামের আগুনের মধ্যে প্রবেশ কর যারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে[১]।

কিন্তু নবীর (সাঃ) কন্যা ও আলীর (আঃ) স্ত্রী হযরত ফাতিমা (সালাঃ) এরূপ নারী ছিলেন না। তিনি এমনই এক নারী ছিলেন যে, তাঁর খুশিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা খুশি হতেন আর তিনি রাগান্বিত হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাগান্বিত হতেন।

হাজ্জাজ ঃ সাবাস হুর্‌রাহ্! এখন বল দেখি আলীকে কেন নবীগণের (আঃ) পিতা হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) উপরে স্থান দিয়েছিস?

হুর্‌রাহ্ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেনঃ

رب اري كيف تحيي الموتى قال او لم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي

- হে আল্লাহ্! আমাকে দেখাও কিভাবে মৃত প্রাণীকে জীবিত করবে ? বললেন ঃ তাহলে কি তুমি ঈমান আন নি। বলল ঃ নিশ্চয়ই এনেছি, কিন্তু আমার অন্তরের প্রশান্তির লক্ষ্যে[২]।

কিন্তু আমার মাওলা আলী (আঃ) আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এমন এক পর্যায়ে উন্নিত ছিলেন যে, তিনি বলেছেনঃ

لو كشيف الغطا ما ازددت يقيناً

- যদি পর্দা সরিয়ে নেয়া হয়, তবুও আমার বিশ্বাসের পরিমান একটুও বাড়বে না। (অর্থাৎ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তিনি এমনভাবে জ্ঞাত যে, তা পর্দার এ পাশে বা ওপাশেই হোক না কেন তাঁর জন্য কোন পার্থক্যই সৃষ্টি করে না)।

এরূপ বিশেষ অর্থ সম্পন্ন কথা এর আগে কেউ বলে নি বা এর পরেও আর কেউ বলবে না।

হাজ্জাজ ঃ অনেক ধন্যবাদ! কিন্তু আলীকে মুসা কালিমুল্লাহ্‌র (আঃ) উপর স্থান দেয়ার ব্যাপারে তোর দলিল কী?

হুর্‌রাহ্ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসার (আঃ) ব্যাপারে বলেছেনঃ

فخرج منها خائفاً يترقب

- মুসা যখন ফিরআউনদের পক্ষ থেকে যে কোন ধরনের অসুভ ও ভয়নক আচরণের সম্ভাবনা দিয়েছিল তখন শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু আলী (আঃ) [নবীর (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে] নবীর (সাঃ) বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন এবং কোন প্রকার ভয় পান নি। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর শান ও মর্যাদা স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রেরণ করেন ঃ

---

[১]। তাহ্‌রীম ঃ ১০।
[২]। বাকারাহ্ ঃ ২৬০।

و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله

- কিছু কিছু মানুষ (নিজের জীবন উৎসর্গকারী) নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিলীন করে দেন[১]।

হাজ্জাজ ঃ বাহ্! বাহ্! হুর্‌রাহ্, হযরত দাউদের উপরে আলীকে স্থান দেয়ার ব্যাপারে তোর দলিল কী?

হুর্‌রাহ্ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত দাউদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

- হে দাউদ! যমিনে আমরা তোমাকে আমাদের খলিফা নিযুক্ত করেছি, মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-সালিস কর, আর হাওয়ায়ে নফসের আনুগত্য করো না যা তোমাকে খোদার রাস্তা থেকে দুরে সরিয়ে দিবে[২]।

হাজ্জাজ ঃ দাউদ কোন বিষয়ে বিচার করেছিল?

হুর্‌রাহ্ ঃ তার বিচারটি এক রাখাল ও এক কৃষকের ব্যাপারে ছিল। রাখালের পশুগুলো ঐ কৃষকের খেতে গিয়ে চরে বেড়িয়ে তার সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে বির্তকের সৃষ্টি হলে তারা বিচারের জন্যে দাউদের (আঃ) কাছে গিয়েছিল।

হযরত দাউদ বলল ঃ রাখাল তার পশুগুলো বিক্রয় করে সম্পূর্ণ অর্থ ঐ কৃষককে দিবে। আর কৃষক ঐ অর্থ তার খেত তৈরীর কাজে ব্যয় করবে যাতে করে তা পূর্বের ন্যায় হয়।

হযরত দাউদের (আঃ) ছেলে সুলাইমান তার বাবাকে বলল ঃ হে পিতা! বরং কৃষক ঐ রাখালের দুম্বার পশম ও দুধ নিতে পারে, আর তা দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এখানে বলেন ঃ

ففهمناها سليمان

- আমরা উপযুক্ত বিচারটি সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম[৩]।

কিন্তু আমাদের মাওলা আমিরুল মু'মিনিন আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

سلوني قبل ان تفقدوني

- আমি তোমাদের মধ্য থেকে চলে যাওয়ার আগে এই দুনিয়ার সমস্ত বিষয় ও ঐ দুনিয়ার সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তোমাদের যা কিছু জানার আছে তা আমার কাছ থেকে

---

[১]। বাকারাহ্ ঃ ২০৭।
[২]। সাদ ঃ ২৬।
[৩]। আম্বিয়া ঃ ৭৯।

জেনে নাও।

তিনি খয়বারের যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে নবীর (সাঃ) সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে উপস্থিত সকলকে বলেন ঃ

افضلكم و اعلمكم و اقضاكم علي

- আলী তোমাদের মধ্যে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তোমাদের সকলের থেকে উত্তম বিচারক।

হাজ্জাজ ঃ তোকে তো প্রশংসা করতে হয়! বল দেখি সুলাইমানের উপরে আলীকে স্থান দেয়ার ব্যাপারে তোর দলিল কী?

হুর্‌রাহ্ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে হযরত সুলাইমানের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي

- হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার এমন ক্ষমতা দান কর যা আমার পরে আর কেউ ঐরূপ ক্ষমতার উপযুক্ত না হয়[১]।

কিন্তু আমার মাওলা আলী (আঃ) দুনিয়ার ব্যাপারে বলেছেন ঃ

طلقتك يا دنيا ثلاثاً لا حاجة لي فيك

- হে দুনিয়া! আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি, তোমার কাছে আমার কোন চাওয়া-পাওয়াই নেই।

আর তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াতটি নাযিল করলেনঃ

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض و لا فساداً و العاقبة للمتقين

- আখিরাতের সুফল তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট করবো যারা যমিনের বুকে উত্তম পদক্ষেপ নিবে এবং ফিত্‌না-ফ্যাসাদ থেকে দূরে থাকবে, আর শেষ ভাল শুধুমাত্র গোনাহ্ পরিত্যাগকারীদের জন্যেই[২]।

হাজ্জাজ ঃ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ! এখন বল দেখি হযরত ঈসার উপরে আলীকে স্থান দেয়ার ব্যাপারে তোর দলিলটি কী?

হুর্‌রাহ্ ঃ আল্লহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ঈসাকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ

و اذ قال الله يا عيسى بن مريم ءانت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون

---

[১]। সাদ ঃ ৩৫।

[২]। কাসাস ঃ ৮২।

الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي و لا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به

- ঐ সময়কে স্মরণে আন, যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা (কিয়মাতের দিনে) ঈসা ইবনে মারিয়ামকে বলবেন ঃ তুমি কি মানুষকে এরূপ বলেছিলে যে, আমাকে এবং আমার মাকে খোদা ব্যতীত অন্য দুটি মা'বুদ হিসেব কর? তখন ঈসা বলবে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি এ ব্যাপারে পাক ও পবিত্র, আর আমি তা বলার অধিকার রাখি না যা আমার উপযুক্ত নয়। যদি আমি এরূপ কোন কিছু বলে থাকি তবে তা তো তুমি জান, কেননা যা কিছু আমার অন্তরে রয়েছে সে ব্যাপারে তুমি জ্ঞাত। আর যা কিছু তোমার পবিত্র সত্তায় রয়েছে আমি সে ব্যাপারে অজ্ঞ। অমি তাদেরকে শুধুমাত্র তুমি যা বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছো তার অতিরিক্ত কিছুই বলি নি[১]।

আর এভাবেই ঈসাকে (আঃ) খোদা হিসেবে আনুগত্যকারীদের বিচার ও আজাব কিয়মাত পর্যন্ত মুলতবি করা হল।

কিন্তু আলীকে (আঃ) (فرقه نصيريه) *(ফিরকায়ে নাসিরিয়েহ্) নামে একটি দল যখন খোদা হিসেবে অনুগত্য করা শুরু করলো, তখন তিনি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। আর তাদের বিচার ও আজাবকে কাল কিয়মাত পর্যন্ত মুলতবি করেন নি।*

হাজ্জাজ ঃ অনেক অনেক ধন্যবাদ হে হুররাহ্! তুই তোর আক্বীদা-বিশ্বাসের স্ব-পক্ষে যথেষ্ট দলিল আনতে সক্ষম হয়েছিস। আর যদি তা না পারতিস তবে তোর দেহ থেকে মাথা নামিয়ে নিতে বলতাম।

এরপর হাজ্জাজ তাকে অনেক পুরস্কারে পুরস্কৃত করলো এবং তাকে সম্মানের সাথে বিদায় জানালো[২]।

---

[১]। মায়েদাহ্ ঃ ১১৬ ও ১১৭।

[২]। ফাযায়েলে ইবনে সাযান, পৃঃ- ১২২, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৪৬, পৃঃ-১৩৪ থেকে ১৩৬ পর্যন্ত।

৩৭- অপরিচিত এক বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আবুল হুযাইলের আশ্চর্য এক মুনাযিরা

ইরাকে আবুল হুযাইল নামে সুন্নী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি বলেন ঃ সফর করতে করতে 'রুক্কা' (সিরিয়ার একটি শহর) নামে এক শহরে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রবেশ করে জানতে পারলাম একজন পাগল কিন্তু মিষ্ট ভাষী ব্যক্তি 'যাকী মাবয়া'দে' (উপসনা কেন্দ্র) জীবন-যাপন করে[১]। তাকে দেখার জন্য উক্ত মাবয়া'দে গেলাম। দেখলাম সেখানে একজন সুদর্শন বৃদ্ধ ব্যক্তি আসনের উপর বসে আছেন। তিনি বসে বসে তার চুল-দাড়ি আচড়াচ্ছিলেন। তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। তারপর আমাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয় ঃ

অপরিচিত বিজ্ঞ ব্যক্তি ঃ তোমার দেশ কোথায়?

আমি ঃ আমি ইরাকের অধিবাসী।

তিনি ঃ তাহলে তো তুমি তাহলে জীবন সম্পর্কিত রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইরাকের কোন এলাকায় বসবাস কর?

আমি ঃ বসরা শহরে।

তিনি ঃ সুতরাং তুমি তাহলে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। তোমার নাম কি?

আমি ঃ আমার নাম আবুল হুযাইল আ'ল্লাফ।

তিনি ঃ তুমি কি সেই কালাম শাস্ত্রে (আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ধর্মী শাস্ত্র) পারদর্শি ব্যক্তি?

আমি ঃ জী হ্যাঁ।

এ কথা শুনে তিনি উঠে এসে আমাকে তার পাশে একটি নরম স্থানে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং আমার সাথে খুব ঘনিষ্ট ভাবে কথা বলতে শুরু করলেন।

ইমামত সম্পর্কে তোমার দৃষ্টি-ভঙ্গি কী?

আমি ঃ কোন ইমামত সম্পর্কে বলছেন?

তিনি ঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পরে কাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গ্রহণ কর বা উপযুক্ত মনে কর?

আমি ঃ যাকে রাসূলে খোদা (সাঃ) উপযুক্ত মনে করতেন।

---

[১]। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাকিয়া স্বরূপ এরূপে জীবন-যাপন করতেন এবং নিজেকে পাগল পরিচয় দিতেন।

তিনি ঃ কে সেই ব্যক্তি?

আমি ঃ সেই ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর।

তিনি ঃ কেন তাকে উপযুক্ত মনে কর।

আমি ঃ কেননা নবী (সাঃ) বলেছেন, 'নিজের থেকে উত্তম ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দাও এবং তাকে নিজের পরিচলক কর'। সকলেই আবু বকরকে উপযুক্ত মনে করে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

তিনি ঃ হে আবুল হুযাইল! এখানেই ভুল করেছো।

আর এই যে, বলছো নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ 'নিজের থেকে উত্তম ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দাও এবং নিজের পরিচালক কর'। এক্ষেত্রে তোমার প্রতি আমার অভিযোগ হচ্ছে যে, আবু বকর নিজে মিম্বাবে বসে বলেছে ঃ

و لیتکم و لست بخیر کم

- তোমাদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম যদিও আমি তোমার মধ্যে উত্তম ও উপযুক্ত নই [১]।

যদি মানুষ ভুলবশতঃ আবু বকরকে উপযুক্ত মনে করে নিজেদের নেতা বানিয়ে থাকে তবে তারা নবীর (সাঃ) উক্তির বরখেলাপ করেছে। আর যদি আবু বকর নিজে মিথ্যা বলে থাকে যে, আমি তোমাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি নই। তবে এটা শোভনীয় নয় যে, রাসূলে খোদার (সাঃ) মিম্বারের উপর কোন মিথ্যাবাদী উঠবে।

আর এই যে, তুমি বলছো সমস্ত মানুষ আবু বকরকে তাদের নেতা বা পরিচালক হিসেবে মেনে নিয়েছিল, এটা কিঞ্চিত সত্য। কেননা আনসারদের অধিকাংই বলেছিলঃ

منا امیر و منکم امیر

- আমাদের পক্ষ থেকে একজন নেতা হোক এবং একজন তোমাদের (মুহাজির) পক্ষ থেকে।

আর মুহাজিরদের ব্যাপারে যেভাবে 'যুবাইর' বলেছে ঃ আমি (যুবাইর) আলীর (আঃ) হাতে ছাড়া অন্য কারো হাতে বাইয়াত করবো না। এই বলে সে তার তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলল। আবু সুফিয়ান আলীর (আঃ) কাছে এসে বলল ঃ আপনি যদি চান তাহলে সকলকে একত্রিত করে আপনার হাতে বাইয়াত করাবো। আর সালমান ফার্সি বাইরে এসে বলল ঃ যা ঘটলো, কি ঘটলো কিছুই বুঝা গেল না যে কি হলো।

অতএব, আবু বকরের হাতে বাইয়াত করার জন্য যা করা হয়েছিল তা ছিল আইন-কানুন বহিরভূত। কেননা মিকদাদ, আবুযার, ও আরো অনেক মুহাজির এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। সুতরাং সকলেই আবু বকর নেতা হোক সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট

---

[১]। আল আ'কদুল ফারিদ, খণ্ড-১, পৃঃ-৩৪৭।

বা রাজি ছিল না।

হে আবু হুযাইল! এখন তোমার কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে এবং তুমি সেগুলোর উত্তর দেবে।

১- আমাকে বল দেখি, আবু বকর মিম্বারে উঠে এমটাই বলে নি কী? হে মানব সকল! ....

ان لی شيطاناً يعتريني، فاذا رايتموني مغضباً فاحذروني

- ঐরূপ আমার অস্তিত্বেও শয়তানের প্রভাব রয়েছে যা আমাকে অসর্তক এবং আমার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। যখন আমাকে রাগান্বিত দেখবে তখন আমার কাছ থেকে দুরে থাকবে।

সে তার এই কথায় এটাই বুঝাতে চেয়েছে যে ঃ আমি অনুরূপ পাগলের ন্যায়। তাহলে এই কথার পরেও তোমরা তাকে কিভাবে নেতা বানালে?!

২- আমাকে বল দেখি, যে ব্যক্তির বিশ্বাস করে যে, নবী (সাঃ) কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান নি; কিন্তু জনাব আবু বকর, জনাব ওমরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যায়। আর ওমর নিজে আবার কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায় নি। অতত্রব তাদের কাজের মধ্যে এক ধরনের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় এ ব্যাপারে কি বলবে?

৩- আমাকে বল দেখি, যখন ওমর নিজের পরে খেলাফতকে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি শুরার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, এই ছয়জন হচ্ছে বেহেশ্‌তবাসী। তাহলে পরবর্তীতে কেন বলেছিল যে, যদি ছয়জনের মধ্যে দুইজন বিরোধ করে তবে বাকী চারজন যেন উক্ত দুইজনকে হত্যা করে, আর যদি তিনজন বিরোধ করে তবে যে তিনজনের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ থাকবে সেই তিনজনকে হত্যা করবে? এরূপ নির্দেশ কি সততা বা ধার্মীকতার মধ্যে, আর কোনই বা বেহেশ্‌তবাসীকে হত্যা করার কথা বলবে?!

৪- হে আবু হুযাইল! আমাকে বল দেখি, ওমরের সাথে ইবনে আব্বাসের দেখা করার ঘটনাকে; তুমি কিভাবে নিজের বিশ্বাসের সাথে সমন্বয় করাবে? যখন ওমর ইবনে খাত্তাব আঘাত পাওয়ার কারণে বিছানায় ছিল এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস তাকে দেখতে গেলে, সে তখন ছটফট করছিল। ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করলো ঃ কেন তুমি ছটফট করছো?

সে উত্তরে বলল ঃ আমি আমার নিজের জন্য ছটফট করছি না। বরং এজন্য যে, আমার পরে কে এই নেতৃত্বের আসনে বসবে। তখন তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয় ঃ

ইবনে আব্বাস ঃ তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ্‌কে নেতা বানিয়ে যাও।

ওমর ঃ সে রূঢ় স্বভাবের। নবী (সাঃ) তাকে এরূপ ভাবেই জানতেন। আমি এই

পদকে কোন রূঢ় স্বভাবের ব্যক্তির উপর অর্পণ করবো না।

ইবনে আব্বাস ঃ যুবাইর ইবনে আওয়ামকে নেতা বানিয়ে যাও।

ওমর ঃ সে কৃপণ ব্যক্তি। আমি দেখেছি যে, সে তার স্ত্রীর হাতে তৈরী পশমী পোশাকের মুজুরী দেয়ার ব্যাপারে অনেক কঠোরতা করেছে। অতএব, কোন কৃপণ ব্যক্তির হাতে এই দায়িত্ব অর্পণ করবো না।

ইবনে আব্বাস ঃ সা'দ ইবনে ওয়াক্কাসকে নেতা বানিয়ে যাও।

ওমর ঃ সা'দ, সে তো ঘোড়া ও তীর-বল্লম নিয়ে ব্যস্ত (সামরিক লোক)। এমন লোকের হাতে এই মহান দায়িত্ব অর্পন করা যায় না, আর সে এই পদের জন্য উপযুক্তও নয়।

ইবনে আব্বাস ঃ তাহলে আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফকে নেতা বানিয়ে যাও।

ওমর ঃ সে তো নিজের পরিবারকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কিভাবে নেতৃত্ব দান করবে।

ইবনে আব্বাস ঃ তাহলে তোমার ছেলেকে এই দায়িত্ব দিয়ে যাও।

ওমর ঃ আল্লাহ্‌র কসম না! কেননা সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ারও ক্ষমতা রাখে না। তাকে আমি এই পদের অধিকারী করবো না।

ইবনে আব্বাস ঃ উসমানকে নেতা বানিয়ে যাও।

ওমর তিনবার বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! যদি উসমানকে নেতা বানিয়ে যাই তবে বনি মু'ইত (যারা উমাইয়্যা খেলাফতের বিরোধী ছিল) ফিরে আসবে এবং মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করবে। আর তাকে হত্যা করার সম্ভাবণা আছে।

ইবনে আব্বাস বলল ঃ এরপর আমি চুপ করে রইলাম। আর ওমর ও আলীর (আঃ) সাথে শত্রুতা থাকায় আমার মাওলা আলীর (আঃ) নাম উঠালাম না। কিন্তু ওমর নিজেই আমাকে বলল ঃ হে ইবনে আব্বাস! তোমার মাওলার নাম বলছো না কেন?

বললাম ঃ তাহলে আলীকে (আঃ) নেতা বানিয়ে যাও।

ওমর ঃ আল্লাহ্‌র কসম! অন্য কোন কারণে হয়রান নই শুধুমাত্র প্রকৃত অধিকারীর অধিকারকে হরণ করেছি তাই।

و الله لئن و ليته ليحملنهم على المحجة العظمى، و ان يطيعوه يدخلهم الجنة

- আল্লাহ্‌র কসম! যদি আলীকে নেতা বানিয়ে যাই তবে সে অবশ্যই তা

পরিপূর্ণতায় পৌছাবে এবং যদি মানুষ তাকে অনুসরণ করে চলে তবে সে

তাদেরকে বেহেশ্‌তবাসী করবে।

ওমর এই কথাটি বলল, কিন্তু খেলাফতকে নিজের পরে শুরার হাতে অর্পণ করে দিয়ে গেল। এরূপেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল।

আবু হুযাইল বলল ঃ ঐ মিষ্ট ভাষী বৃদ্ধ লোকটি যখন এ কথায় পৌছালেন তখন তার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেলো এবং তিনি পাগলের ন্যায় ছটফট করতে লাগলেন।

উক্ত ঘটনাটি মা'মুনকে (সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা) বললাম। সে তাকে ডেকে পাঠালো এবং তাকে চিকিৎসা করানোর নির্দেশ দিল। ঐ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠলে মা'মুন তাকে নিজের বন্ধু হিসেবে স্থান দিল এবং তার এই যুক্তিসঙ্গত কথার প্রভাবে সে শিয়া হয়ে গেল[১]।

---

[১]। ইহ্‌তিজাজ তাবরাসী, খণ্ড-২, পৃঃ- ১৫১-১৫৪।

৩৮- আলেমগণের সাথে মা'মুনের মুনাযিরা

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের পক্ষ থেকে একটি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা মা'মুন সেখানে প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিল। ঐ সমাবেশে অনেকক্ষণ ব্যপী এক মুনাযিরা অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

একজন সুন্নী আলেম বলল ঃ রেওয়ায়েতে আছে যে, নবী (সাঃ) আবু বকর ও ওমরের শানে বলেছেন ঃ

ابوبكر و عمر سيد اكهول اهل الجنة

- আবু বকর ও ওমর হচ্ছে বেহেশ্তের বৃদ্ধদের নেতা।

মা'মুন বলল ঃ এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বেহেশ্তে কোন বৃদ্ধ থাকবে না। আর এ ব্যাপারে রেওয়ায়েত রয়েছে, যেমন ঃ নবীর (সাঃ) কাছে এক বৃদ্ধ মহিলা এসেছিল, আর তিনি তাকে বলেছিলেন ঃ 'বৃদ্ধ মহিলা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না'। এই কথা শুনে বৃদ্ধ মহিলা কাদতে শুরু করলো। নবী (সাঃ) তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন ঃ

انا انشأنا هن انشاء، فجعلنا هن ابكارا، عرباً اترابا

- আমরা তাদেরকে নতুন জন্ম দান করবো এবং সকলকে যুবক-যুবতীর রূপ দিবো, পুরুষগণ তাদের স্ত্রীগণের সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং তারা মিষ্ট ভাষী ও সমবয়েসের অধিকারী হবে[১]।

যেহেতু আবু বকর ও ওমর যুবক হয়ে যাবে এবং তোমারদের চিন্তা মতে তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, সেহেতু তোমরা কিভাবে এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করছো যখন কিনা রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ

ان الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة الاولين و الآخرين و ابو هما خير منهما

- হাসান এবং হুসাইন (আঃ) হচ্ছে পূর্বের ও পরের বেহেশ্তবাসী যুবকদের সর্দার বা নেতা এবং তাদের পিতার (আলী আলাইহিস সালাম) মর্যাদা তাদের থেকেও উচ্চে[২]।

---

[১]। ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৩৫-৩৭।

[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৪৯, পৃঃ-১৯৩।

৩৯- নবীর (সাঃ) বক্তব্যে ভুল ধরায় আবু দুল্‌ফের জবাব

কাসেম ইবনে ঈসা আ'জলী, 'আবু দুল্‌ফ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ইমাম আলীর (আঃ) অনুসারী ছিল। সে তার বংশের প্রধানও ছিল। ২২০ হিজরীতে সে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়[১]।

দুল্‌ফ নামে তার এক ছেলে ছিল। ছেলের স্বাভাব-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পিতার বিপরীত (রূঢ় স্বভাবের ও খারাপ চরিত্রের) ছিল।

একদিন এই ছেলে তার বন্ধুদেরকে আলীর (আঃ) সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলো। তাদের কথোপকথন বেশ সময় নিল। তাদের মধ্যে একজন বলল ঃ রেওয়ায়েতে আছে যে, নবী (সাঃ) আলীকে (আঃ) বলেছেন ঃ

لا يحبك الا مؤمن تقي، و لا يبغضك الا ولد زنية او حيضة

- মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউ তোমাকে ভাসবাসবে না। আর তোমার সাথে শত্রুতা করবে তারাই যারা যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট হয়েছে, অথবা ঋতুশ্রসাব অবস্থায় তার মায়ের গর্ভে এসেছে।

দুল্‌ফ এ সকল বিষয়কে অস্বীকার করতো, তাই সে তার বন্ধুদের বলল ঃ আমার পিতা আমির আবু দুল্‌ফের ব্যাপারে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এটা কি বলা সম্ভব যে, কোন ব্যক্তির সাহস আছে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করবে?

তার বন্ধুরা ঃ না, কখনই তোমার পিতার ব্যাপারে এটা বলা সম্ভব নয় এবং এমনটা ভাবাও ঠিক হবে না।

দুল্‌ফ ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আলীর সাথে বিশেষভাবে শত্রুতা পোষণ করি। যদিও আমি যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট হইনি ও আমার মা ঋতুবতী থাকা অবস্থায়ও আমি তার গর্ভে আসিনি।

---

[১]। সাফিনাতুল বাহার, খণ্ড-১, পৃঃ-৪৬২।

এমন সময় আবু দুল্‌ফ বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেখলো তার ছেলে কয়েকজন বন্ধুদের সাথে আলোচনা করছে। যখন সে তার ছেলের আলোচনার বিষয়ের প্রতি অবগত হল তখন উপস্থিত সকলের সামনে

বলল ঃ

'আল্লাহ্‌র কসম! আমার ছেলে দুল্‌ফ যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট হয়েছে এবং তার মা ঋতুবতী থাকা অবস্থায় সে গর্ভে এসেছে। এরূপে যে, আমি অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় আমার ভাইয়ের বাড়ীতে দিন কাটাচ্ছিলাম। বিছানায় শুয়ে ছিলাম, এমন সময় এক কানিয (কাজের মেয়ে) আমার ঘর পরিস্কার করতে এলে আমার নাফ্‌সে আম্মারা (শয়তানী নফ্‌স) তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সে আমারকে বলল ঃ আমার ঋতুস্রাব হয়েছে। তথাপিও আমি তাকে খারাপ কাজে বাধ্য করলাম। আর সে অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়ে। আমি জানতে পেরে তাকে বিয়ে করি। কিন্তু এই দুল্‌ফ হচ্ছে সেই যেনা ও ঋতুস্রাব অবস্থায় গর্ভে আসা সন্তান[১]।

উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলো যে, আলীর (আঃ) সাথে দুল্‌ফের শত্রুতা তার মায়ের গর্ভে আসা থেকেই শুরু হয়েছে। আর যেহেতু বৃক্ষটি প্রথম থেকেই বাকাভাবে রোপণ করা হয়েছিল তাই তা শেষ পর্যন্ত বাকাই রয়ে গিয়েছিল।

---

[১]। কাশফুল ইয়াকিন -আল্লামা হিল্লি, পৃঃ-১৬৬, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৩৯, পৃঃ- ২৮৭।

৪০- এক চালাক যুবকের সাথে আবু হুরাইরার মুনাযিরা

মুয়া'বিয়া কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী সাহাবী ও তাবেঈনদেরকে ইমাম আলীর (আঃ) বিপক্ষে জাল হাদীস তৈরী করার জন্য অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়েছিল। যেমন ঃ সাহাবীদের মধ্যে আবু হুরাইরা, আ'মরো আ'স ও মুগাইরা ইবনে শো'বেহ্ এবং তাবেঈনদের মধ্যে উ'রওয়াতু ইবনে যুবাইর।

ইমাম আলীর (আঃ) শাহাদতের পরে আবু হুরাইরা কুফাতে গিয়েছিল। আর সেখানে গিয়ে সে (মুয়া'বিয়ার ক্ষমতাবলে) আলীর (আঃ) বিপক্ষে তৈরী করে নবীর (সাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন আশ্চর্য ধরনের বিষয়কে উল্লেখ করতে লাগলো। রাতের পর রাত 'বাবুল কিনদাহ্' কুফার মসজিদে বসে বসে লোকজনের মধ্যে তার তৈরীকৃত বিষয় বর্ণনা করতো এবং তাদেরকে বিপথে নিয়ে যেত।

এক রাতে তার ঐ সভায় চালাক ও ধী-শক্তি সম্পন্ন এক যুবক অংশ গ্রহণ করলো। কিছু সময় ধরে তার অযৌক্তিক আলোচনা শোনার পর, তাকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ 'তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম! তুমি কি শুনেছো যে, নবী (সাঃ) আলীর (আঃ) ব্যাপারে এই দোয়াটি করেছিলেন'ঃ

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه

- হে আল্লাহ্! তাকেই তুমি ভালবেসো যে আলীকে ভালবাসবে আর তাকেই তুমি শত্রু ভেবো যে আলীর সাথে শত্রুতা করবে।

আবু হুরাইরা দেখলো যে, এই মুতাওয়াতির হাদীসটিকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না তাই সে বললঃ

اللهم نعم

- আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রাখছি, হ্যাঁ আমি এই হাদীসটি শুনেছি।

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুবকটি বলল ঃ সুতরাং আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রাখছি যে, তুমি আলীর (আঃ) বন্ধুদের সাথে শত্রুতা কর আর তাঁর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব। অতএব, তুমি রাসূলে খোদা (সাঃ) অভিষাপ প্রাপ্ত। তারপর ঐ যুবক ঐ সভা থেকে বেরিয়ে যায়[১]।

১। শারহে নাহজুল বালাগাহ্ -ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড-৪, পৃঃ- ৬৩ ও ৬৮।

৪১- অপবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো

এক বন্ধু বলেছিল ঃ সৌদি আরবের একটি মসজিদে ছিলাম, এমন সময় মধ্যবয়োস্ক একটি লোক আমার কাছে এল। তার পরিচয় নিয়ে জানতে পারলাম সে সিরিয়ার অধিবাসী। সে আগে থেকেই জানতো যে, আমি শিয়া মাযহাবের অনুসারী। সে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে বলল ঃ তোমরা শিয়ারা নামায শেষে কেন তিনবার নিম্নোক্ত কথাটি বল?

خان الامين، خان الامين، خان الامين

- জিব্রাঈল আমিন খিয়ানত করেছে।

এই কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তখন আমি এক অসাধারণ অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম। তার দিকে ফিরে কিছু সময় ভেবে, তাকে বললাম ঃ আমাকে দু'রাকায়া'ত নামায পাড়র অনুমতি দিন। আর আপনি বিশেষভাবে তা লক্ষ্য করুণ।

সে বলল ঃ ঠিক আছে।

আমি উঠে দাড়ালাম। দুই রাকায়া'ত নামায পড়লাম। শেষে তিনবার তাকবির (মুসতাহাব) বললাম। তারপর তাকে প্রশ্ন করলাম যে, এখন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

সে বলল ঃ তুমি তো একজন ইরানী, আরব নও বরং আজাম (অনারবকে আজাম বলা হয়)। আমাদের আরবদের থেকেও অনেক সুন্দর করে নামায পড়েছো। কিন্তু ঐ কথাটি (খানাল আমিন) কেন বললে না?

বললাম ঃ এ সব পরিভাষা শয়তানের পক্ষ থেকে আপনাদের মত সাদা-সিধা মানুষের অন্তরে ও চিন্তায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এই পথে শত্রু পক্ষ আমাদের মুসলামনদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিরোধ সৃষ্টির পায়তারা করছে।

ব্যাখ্যা ঃ তাদের এ (খানাল আমিনের) ব্যাপারে দৃষ্টি ভঙ্গি হচ্ছে (না'উযুবিল্লাহ্) শিয়া মাযহাবের বিশ্বাস এটাই যে, পবিত্র কোরআনকে জিব্রাঈল আমিনের ইমাম আলীর (আঃ) কাছে আনার কথা ছিল। কিন্তু তিনি মাঝ পথে ঘুরে গিয়ে কোরআনকে নবীর (সাঃ) কাছে পৌছে দেন। তাই শিয়ারা নামায শেষে তিনবার বলে খানাল আমিন (অর্থাৎ জিব্রাঈল
আমিন খিয়ানত করেছে)!!

এটা কি ইনসাফহীন কথা নয়? এ বিশ্বের কোন শিয়া এ ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাস রাখে? আর যদি শিয়াদের কেউ এ ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাস রাখে তবে বিশ্বের মুসলমান

তাকে কাফের বলাতে কোন ভুল হবে কি[১]?

দ্বিতীয় বদনামটি হচ্ছে এরূপঃ

এক শিক্ষক বলেছিলেন ঃ একজন হিজাজের দরবারী আলেম তার খোৎবাতে এরূপ বলেছিল ঃ

'যদি শিয়ারা ঐক্যের দাওয়াত দেয়, তবে তাদের ধোকায় পড়ো না। তারা আমাদের সাথে কোন ব্যাপারেই ঐক্যের দৃষ্টি রাখে না। না তৌওহীদের ব্যাপারে, আর না খোদার বিশেষণের ব্যাপারে। না কোরআনের ব্যাপারে, আর না অন্যান্য বিষয়ে। তারা আমাদের ও ইসলামী বিশ্বের জন্য হচ্ছে মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এরূপে বলতে বলতে সে এই পর্যায়ে পৌছালো ঃ শিয়ারা এ মতে বিশ্বাসী যে, আল্লাহ্ আলেম (জ্ঞানী), সামিয়' (শ্রবণকারী) ও বাসিরের (দৃষ্টি শক্তি) অধিকারী নন। কিন্তু তারা তাদের ইমামগণের ব্যাপারে উক্ত বিশেষণে বিশ্বাসী। যে কোরআন আমাদের হাতে আছে তা তারা গ্রহণ করে না। সে আরো বলল যে, আমি এখানে যা বলেছি তা শিয়াদের মুল গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছি।

এই খতিবের উক্ত বক্তব্যের জবাবে বলতে হয় যে, যদি মতলববাজ না হয়ে থাকো তবে ইনসাফের সাথে বিচার-বিশ্লেষণ কর। শিয়াদের মুল গ্রন্থাবলী সকল স্থানেই রয়েছে। পবিত্র কোরআনও মিলিয়ন মিলিয়ন শিয়াদের হাতে রয়েছে। আর শিয়া আলেমগণের তফসিরও সংগ্রহযোগ্য। কোথায় এমন লেখা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁ'য়ালা আলেম, সামিয়' ও বাসির নন, কিন্তু আমাদের ইমামগণ উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী? আর কোন কোরআন যা শিয়াদের হাতে আছে তা আপনাদের হাতে যে কোরআন রয়েছে তার সাথে পার্থক্য রয়েছে?!

---

[১]। এই (খানাল আমিন) ইনসাফহীন বাক্যটি কিছু কিছু সুন্নী মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। আর যখনই শিয়াদের বিরুদ্ধে কথা বলে তখনই এই বাক্যসমূহ তাদের মুখে মুখে উচ্চারীত হয়ে থাকে। ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তিজানী সামাভির লেখা 'অবশেষে সত্য পথের সন্ধান পেলাম' গ্রন্থটিতে এ ধরনের সুন্নী মাযহাবের পক্ষ থেকে শিয়াদের ব্যাপারে উচ্চারীত দুটি কটু বাক্য উল্লেখি হয়েছে।

৪২- যুক্তির সম্মুখে এক ওহাবী পণ্ডিত ব্যক্তির চরম দুরবস্থা

একজন মুসলমান আলেম বলেন ঃ মদীনায় মসজিদে নব্বীতে রাসূলে খোদার (সাঃ) মাজারের পাশে দাড়িয়ে ছিলাম। হটাৎ সেখানে একজন শিয়া মাযহাবের অনুসারী উপস্থিত হয়ে রাসূলের (সাঃ) পবিত্র মাজার শরিফের বিভিন্ন স্থানে চুম্বন দিতে শুরু করলো। উক্ত মসজিদের ইমাম সাহেব (সে ছিল ওহাবী মাযহাবের অনুসারী) তাকে দেখে চিৎকার করে বলল ঃ হে মুসাফির! কেন তুমি এই বিবেক-বুদ্ধিহীন মাজারের দেয়ালকে চুম্বন করছো, আর এর মাধ্যমে শির্ক করছো[১]?

ইমাম সাহেবের বিকট চিৎকার করাতে, আমার অন্তর ঐ শিয়া ব্যক্তির জন্য দুঃখে ভারাক্রান্ত হল। কিছুটা সামনে গিয়ে ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললাম ঃ 'এই দেয়ালে চুম্বন দেয়ার অর্থ হচ্ছে রাসূলের (সাঃ) প্রতি ভালবাসা। যেমনভাবে পিতা যে তার সন্তানকে ভালবাসে, তা চুম্বনের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু সে তো কোন শির্ক করে না।

সে বলল ঃ না, কিন্তু এটা হচ্ছে শির্ক।

বললাম ঃ সূরা ইউসূফের ৯৬ নং আয়াতটি পড়েছো কি? যেখানে বলা হয়েছে ঃ

فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيراً

-যখন সাক্ষ্যদাতা (হযরত ইউসূফের বেচে থাকার ব্যাপারটি তার পিতা ইয়াকুবের কাছে) পৌছালো তখন সে (ইউসূফের জামাটিকে) ইয়াকুবের মুখ-মণ্ডলের উপর রাখলো, হটাৎ ইয়াকুব (পুনরায়) দৃষ্টি শক্তি ফিলে পেল।

আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, ঐ জামাটি তো কাপড় দিয়ে তৈরী ছিল। কিভাবে তা হযরত ইয়াকুবের (আঃ) মুখ-মণ্ডলের উপর রাখাতে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন? এমনটিই নয় কি যে, কাপড় দিয়ে তৈরী জামাটি হযরত ইউসূফের শরীরের ছোয়া পেয়ে ঐরূপ বিশেষত্ব পেয়েছিল?

ইমাম সাহেব আমার প্রশ্নের সম্মুখে কোন উত্তর না দিতে পেরে চরম দশায় পড়লো।

সূরা ইউসূফের ৯৪ নং আয়াতেও বলা হয়েছে যে, যখন কাফেলা মিশরের ভূমি থেকে আলাদা হয়ে গেল (কানয়া'নের দিকে রওনা হল) ইয়াকুব (কানয়া'ন ও মিশরের

---

[১]। এই ধরনের প্রশ্ন ও অভিযোগ ইমাম সাদিকের (আঃ) সময়ে আবিল আ'উজা নামে এক খোদা অবিশ্বাসী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে করেছিল যে, কেন 'হাজারাল আসওয়াদকে' চুম্বন কর? কেননা সেটা তো পাথর আর পাথরের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই...... (উসূলে কাফী)।

মধ্যে দুরত্ব প্রায় ৫০০ কিলোমিটার) বলল ঃ انی لاجد ریح یوسف ইউসূফের শরীরের সুগন্ধ আমার নাকে আসছে এবং তা অনুভব করছি।

সুতরাং আল্লাহ্‌র অলি-আউলিয়াগণ এক ধরনের বিশেষ আধ্যাত্মিকতায় পারদর্শি। আর তাদের এই বিশেষ আধ্যাত্মিকতা থেকে উপকৃত হওয়াতে কোন শিরক নেই। বরং তা হচ্ছে প্রকৃত তৌওহীদেরই অনুরূপ। কেননা তারাও এই বিশেষত্বকে তৌওহীদের নূর থেকেই গ্রহণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আমরা আল্লাহ্‌র অলি-আউলিয়াগণের মাজারের পাশে বসে তাদের সাথে আন্তরীক সম্পর্কের সৃষ্টি করি। আর তাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে মাধ্যম হিসেবে স্থান দেই। কেননা আমরা আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি যোগাযোগের যোগ্য নই, তাই তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ স্থাপানের লক্ষ্যে অনুরোধ জানাই। যেমন

পবিত্র কোরআনে সূরা ইউসূফের ৯৭ নং আয়াতে এসেছে ঃ

قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین

- ইয়াকুবের সন্তানগণ তাকে বলেছিল ঃ হে পিতা! আল্লাহ্‌র দরবাবে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা আমরা ভুল করেছিলাম।

সুতরাং আল্লাহ্‌র অলি-আউলিয়াগণের তাওয়াছ্ছুল করা বা তাদের উছিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র দরবাবে কিছু চাওয়াটা হচ্ছে জায়েয। আর যারা এটাকে তৌওহীদ থেকে আলাদা মনে করে থাকে তারা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অবগত নন অথবা ভুল হিংসা-বিদ্বেষের কারণে তাদের চোখে পর্দা পড়ে গেছে।

সূরা মায়েদাহ্‌র ৩৪ নং আয়াতে পড়বো ঃ

یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة

- যারা ঈমান এনেছো, পরহিযগার থেকো এবং আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য মাধ্যমের অন্বেষণ কর।

মাধ্যম, এই আয়াতের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ওয়াজিব কাজের আঞ্জাম দেয়া এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার অর্থেই নয়। বরং মুসতাহাব বিষয়ও যেমন আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের প্রতি তাওয়াছ্ছুল করাকেও মাধ্যম বলা হয়েছে।

রেওয়ায়েতে এসেছে যে, মানছুর দাওয়ানিকি (দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা) মালেকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মালিম ইবনে আনাসকে (বিশিষ্ট মুফতি) জিজ্ঞাসা করলোঃ নবীর (সাঃ) মাজারের পাশে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করবো, না মাজারের দিকে ফিরে দোয় করবো?

মালিক এই প্রশ্নের উত্তরে বলল ঃ

لم تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و وسيلة ابيك آدم (ع) الى الله يوم القيامة، بل استقبله و ايتشفع به فيشفعك الله، قال الله تعالى : و لو انهم اذ ظلموا انفسهم ....

- কেন নবীর (সাঃ) দিক থেকে ফিরে আসবে, তিনি তোমার ও তোমার পিতা আদমের (আঃ) উছিলা হবেন কাল কিয়ামতের দিনে। তাঁর দিকে ফিরে (দোয়া কর) এবং তাকে তোমার উছিলা মনে কর। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর শাফায়া'তকে গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন ঃ

و لو انهم اذ ظلموا جائوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

- আর যখন বিরোধীতাকারীরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল এবং তোমার কাছে এসে তোমার মাধ্যমে খোদার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। আর নবী (সাঃ) তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন তখন তারা আল্লাহ্কে তওবা গ্রহণকারী ও মেহেরবান হিসেবে উপলব্ধি করেছিল[১]*-*[২]*।*

শিয়া এবং সুন্নী মাযহাবের রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে যে,

হযরত আদম (আঃ) যখন তওবা করেছিলেন তখন নবীকে (সাঃ) আল্লাহ্র দরবারে উছিলা হিসেবে পেশ করে বলেছিলেনঃ

اللهم اسئلك بحق محمد الا غفرت لي

- হে আল্লাহ্! তোমাকে মুহাম্মদের (সাঃ) কসম দিয়ে বলছি, আমাকে ক্ষমা করবে কি[৩]*?*

অলি-আউলিয়া, নবী-পয়গম্বারগণের মাজার চুম্বন করাতে যে কোন অসুবিধা নেই বা তা যে কোন শির্ক নয় সে ব্যাপারে সুন্নী মাযহাবের বর্ণিত তিনটি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করছিঃ

১- এক ব্যক্তি নবীর (সাঃ) কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! আমি কোন এক ব্যাপারে কসম করছিলাম যে, যদি সফল হই তবে বেহেশ্তের দরজায়

---

[১] *। নিসা ঃ ৬৪।*

[২] *। ওয়াফাউল ওয়াফা, খণ্ড-২, পৃঃ- ১৩৭৬, আদ্ দুররুস সানিয়াহ্ -যাইনী দাহ্লান, পৃঃ- ১০।*

[৩] *। আদ দুররুল মানসুর, খণ্ড-১, পৃঃ-৫৯, মুসতাদরাক হাকাম, খণ্ড-২, পৃঃ-৬১৫, মাজমাউল বায়ান, খণ্ড-১, পৃঃ-৮৯।*

ও হুরুল আ'ইনকে (বেহেশ্‌তী হুরকে) চুম্বন করবো, কিন্তু এ পর্যায়ে কি করবো?

নবী (সাঃ) বললেন ঃ মায়ের পায়ে এবং পিতার কপালে চুম্বন কর। (অর্থাৎ যদি এরূপ কর তবে বেহেশ্‌তের দরজায় ও হুরুল আ'ইনকে চুম্বন দেয়ার পর্যায় পৌছাবে)।

সে বলল ঃ যদি মাতা-পিতা ইন্তেকাল করে থাকে তবে কি করবো?

নবী (সাঃ) বললেন ঃ তাদের করবে চুম্বন করলেই হবে[১]।

২- যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর ছেলে ইসমাঈলকে দেখার জন্য শাম (সিরিয়া) থেকে মক্কায় এসেছিলেন, তখন তাঁর ছেলে বাড়ীতে ছিল না। তিনি শামের দিকে ফিরে গেলেন। যখন ইসমাঈল সফর থেকে ফিরে তার স্ত্রীর কাছে জানতে পারলো যে, তার পিতা এসেছিলেন তখন ইসমাঈল পিতা যেখানে পা রেখে দাড়িয়েছিলেন সেখানে চুম্বন দিল[২]।

৩- সাফিয়ান ছাওরী (সুন্নী মাযহাবের বিশিষ্ট সাধক) ইমাম সাদিকের (আঃ) কাছে এসে বলল ঃ কেন মানুষ কা'বার পর্দাকে আকড়ে ধরে, কেননা তা তো শুধুমাত্র পুরাতন কাপড় ছাড়া অন্য কিছুই নয় এবং

কোন উপকারও করতে পারবে না?

ইমাম সাদিক এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন ঃ এই কাজটি এমন যে, এক ব্যক্তি অন্যের অধিকার নষ্ট করেছে পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির হাত ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে এবং তার চারপার্শে ঘুরছে এই আশায় যে, ঐ ব্যক্তি যেন তার কৃত কর্মকে ক্ষমা করে দেয়[৩]।

---

[১]। আল আ'লামু -কুতুবুদ্দিন হানাফি, পৃঃ-২৪।

[২]। ঐ

[৩]। আনোয়ারুল বাহিয়াহ্, ইমাম সাদিকে (আঃ) জীবনী।

৪৩- সৌদি আরবের এক প্রতিনিধির সাথে একজন মার্জার (শিয়া ধর্মবিশারদের) মুনাযিরা

বিশিষ্ট মার্জা আয়াতুল্লাহ্ আল্ উ'যমা সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ্ সিরাযী (রহঃ) আল ইহ্‌তিজাজাতুল আসারাহ্‌র ষষ্ঠ ইহ্‌তিজাজে এরূপ বলেছেন ঃ

একদিন মদীনায় রাসূলে খোদার (সাঃ) মজারে গিয়েছিলাম। সেখানে পবিত্র কোম নগরীর একজন দ্বীনি ছাত্রকে দেখতে পেলাম। সে নবীর মাজারের দিকে যাচ্ছিল। সে ওখানকার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের (যারা মাজারে চুম্বন দেয়া বন্ধ করে) উপেক্ষা করে মাজারে কয়েকবার চুম্বন দিলো। তারা খুব রাগান্বিত হল। তারা যখন আমাকে দেখলো তখন আমার কাছে এসে বলল ঃ জনাব, কেন আপনার ছাত্রদেরকে মাজারে চুম্বন দেয়ার ব্যাপারে বাধা দেন না? এগুলো তো কিছুই নয়, শুধুমাত্র লোহা দণ্ড দিয়ে তৈরীকৃত বেষ্টনি বিশেষ। আর এগুলোকে তুর্কীর রাজধানী ইসতামবুল থেকে আনা হয়েছে। আপনার ছাত্রদেরকে তাতে চুম্বন দেয়ার অনুমতি দিবেন না, কেননা তা হচ্ছে শির্‌ক।

বললাম ঃ তোমরা কি হাজারাল আসওয়াদে চুম্বন দাও না?

তারা বলল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই দেই।

বললাম ঃ নবীর (সাঃ) কবরের উপরও অনুরূপ পাথর রয়েছে, যদি এই পাথরে চুম্বন করা শির্‌ক হয়ে থাকে তবে হাজারাল আসওয়াদে চুম্বন দেয়াও শির্‌ক হবে?!

বলল ঃ হাজারাল আসওয়াদে নবী (সাঃ) চুম্বন দিয়েছেন।

বললাম ঃ যদি তাবাররুক ও তাইয়ামমুন পাওয়ার আশায় কোন কিছুর উপরে চুম্বন দেয়া হয়, আর তা শির্‌ক হয়ে থাকে তবে তাতে কোন পার্থক্যই নেই যে, তা নবীর (সাঃ) পক্ষ থেকে অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

বলল ঃ নবী (সাঃ) এ কারণেই হাজারাল আসওয়াদে চুম্বন দিতেন যে, তা বেহেশ্‌ত থেকে আনা হয়েছিল।

বললাম ঃ হ্যাঁ, হাজারাল আসওয়াদ বেহেশ্‌ত থেকে আনা হয়েছিল। আর এ কারণেই তাতে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়ে থাকে। অন্য দিক দিয়ে নবী (সাঃ) তাতে চুম্বন দিয়েছেন এবং নির্দেশ করেছেন যে, তাতে চুম্বন দেয়ার। কেননা তা হচ্ছে বেহেশ্‌তের অংশ।

বলল ঃ হ্যাঁ, এ সব কারণেই।

বললাম ঃ ভক্তি-শ্রদ্ধা বেহেশ্‌তের অংশের কারণেই নয় বরং শুধুমাত্র নবীর (সাঃ) উপস্থিতি এবং তাঁর উক্তির কারণে।

বলল ঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

বললাম ঃ যখন বেহেশ্‌তী কোন অংশও নবীর (সাঃ) কারণে ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে, আর তাবাররুক ও তায়ামমুনের কারণে তাতে চুম্বন দেয়া জায়েয হয়ে থাকে, তবে এই লোহা দণ্ড যা দিয়ে বেষ্টনি তৈরী করে নবীর (সাঃ) মাজার ঘিরে রাখা হয়েছে, (যদিও তা ইসতামবুল থেকে আনা হয়েছে) যেহেতু তা তাঁর পাশেই রয়েছে সে কারণে ভক্তি-শ্রদ্ধা পাবে। সুতরাং তাবাররুক ও তায়ামমুনের জন্য তাতে চুম্বন দেয়া হচ্ছে জায়েয।

এ বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝার জন্য আকেরটি দিল লক্ষ্যনীয় ঃ পবিত্র কোরআনের বাঁধাইকৃত ঈড়াবৎ ঢ়ধমব টি তো চামড়ারও হয়ে থাকে, যা হচ্ছে পশুর চামড়া। তবে তা কোন হারাম পশুর চামড়া নয়। কিন্তু তা দিয়ে পবিত্র কোরআন বাঁধাই করার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের কাছে কোন মুল্যই ছিল না। কিন্তু যখন তা দিয়ে পবিত্র কোরআন বাঁধাই করা হল তখন ভক্তি-শ্রদ্ধার উপযুক্ত হয়ে গেল। তা অবমননা করা হচ্ছে হারাম এবং তাতে চুম্বন দিয়ে আমরা তাবাররুক ও তায়ামমুন পাওয়ার চেষ্টা করে থাকি। ইসলামের প্রথম থেকেই আজবোধি এ প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে যে, তাবাররুকের জন্য পবিত্র কোরআনের উপরে চুম্বন দেয়া। আর এখনো পর্যন্ত কেউ বলেনি যে, তা হচ্ছে শির্‌ক বা হারাম। আর নবী (সাঃ) ও ইমামগণ (আঃ) এবং অলি-আউলিয়াদের মাজারে চুম্বন দেয়াও হচ্ছে অনুরূপ বিষয়। আর তা কোন প্রক্রিয়ায় শির্‌ক বা মূর্তি পুজার অনুরূপ নয়।

আলী ইবনে মেইছামের কয়েকটি মুনাযিরা

আলী ইবনে ইসমাঈল ইবনে শোয়েব ইবনে মেইছাম (মেইছাম তাম্মারের দৌহিত্র) নামে শিয়া মাযহাবের এক বিশিষ্ট আলেম ও কালাম শাস্ত্রে বিশেষ পন্ডিত ছিল। তাকে পরবর্তীতে আলী ইবনে মেইছাম নামে ডাকা হত। সে ইমাম রেযার (আঃ) এক বিশেষ ছাত্র এবং মুনাযিরা করার ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শি ছিল। আমরা এখানে তার কয়েকটি মুনাযিরা লক্ষ্য করবো ঃ

৪৪- এক খৃষ্টানের সাথে আলী ইবনে মেইছামের মুনাযিরা

আলী ইবনে মেইছাম ঃ কেন ক্রুস চিহ্নটি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছো?

সে ঃ এটা হযরত ঈসার (আঃ) স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ, যার উপরে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

আলী ঃ হরযত ঈসা (আঃ) নিজেও কি এই চিহ্নটিকে তাঁর গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করবেন?

সে ঃ না, তা কখনোই নয়।

আলী ঃ কেন?

সে ঃ কেননা তিনি এমন চিহ্নকে পছন্দ করেন না যার উপর তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আলী ঃ আমাকে বল দেখি, হযরত ঈসা (আঃ) গাধার পিঠে উঠে এখানে ওখানে যেতেন কি?

সে ঃ হ্যাঁ।

আলী ঃ হযরত ঈসা (আঃ) কি পছন্দ করতেন যে, ঐ গাধাটি বেচে থাকুক আর তাকে এদিকে ওদিকে যেতে সাহায্য করুক?

সে ঃ হ্যাঁ।

আলী ঃ হযরত ঈসা (আঃ) যা পছন্দ করতেন তা তুমি দুরে সরিয়ে দিয়েছো, আর তিনি যা অপছন্দ করতেন তা তুমি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছো। উত্তম হচ্ছে তুমি ঐ গাধার অনুরূপ একটি নকশা গলায় ঝুলিয়ে রাখবে। কেননা হযরত ঈসা (আঃ) তা পছন্দ করতেন। আর এই ক্রুস চিহ্নটিকে খুলে ফেলবে, যদি তা না কর তবে তা হবে তোমার অজ্ঞানতা[১]।

---

[১]। আল ফুসুলুল মুখতার,-সাইয়্যেদ মুর্তাযা, খণ্ড-১, পৃঃ-৩১।

৪৫- এক খোদা অবিশ্বাসীর সাথে তার মুনাযিরা

একদিন আলী ইবনে মেইছাম, হাসন ইবনে সাহ্‌লের (আব্বাসীয় খলিফা মা'মুনের উযির) কাছে গেল। সেখানে দেখলো যে, প্রকৃতিতে বিশ্বাসী এক ব্যক্তি সভার শীর্ষে বসে আছে এবং অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তার সামনে হাটু গেড়ে বসে রয়েছে। আর সকলের উপস্থিতিতে ঐ ব্যক্তি তার ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভ্রান্ত যুক্তির মাধ্যমে সে তার চিন্তা-চেতনাই যে সত্য তা প্রমান করতে চাচ্ছিল।

আলী ইবনে মেইছাম একটু খানি শোরগোল পূর্ণ ভাবেই এরূপে মুনাযিরা শুরু করলোঃ

সে উযিরের দিকে ফিরে বলল ঃ হে উযির! আজ তোমার বাড়ীর সামনে একটি দারুণ জিনিষ দেখে এলাম।

উযির ঃ কি দেখেছো?

সে ঃ দেখলাম একটি জাহাজ কোন চালক ছাড়াই এদিকে ওদিকে আসা-যাওয়া করছে!

এই কথা শোনার সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি উযিরকে বলল ঃ এই ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, কেননা সে এলো-মেলো ও ভুল বকছে।

সে ঃ না, আমি ঠিক বলছি। কেন মিথ্যা বলতে যাবো?

ঐ ব্যক্তি ঃ কাঠের তৈরী জাহাজের তো আক্বল ও প্রাণ নেই। তাহলে কিভাবে তা কোন চালক ছাড়াই এদিকে ওদিকে যেতে পারে?!

সে ঃ আমার কথাটি তোমার কাছে আশ্চর্য লাগছে আর তুমি যা বলছো তা আশ্চর্যের নয়? এই যে, তুমি বলছো বিশ্ব কোন আক্বল ও বিবেকবান সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্টি হয় নি। বিভিন্ন গাছ-পালা যমিন থেকে জন্ম নেয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে, তোমার চিন্তা মতে এ সবের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। এমতাবস্থায় তুমি আমার একটি সাধারণ কথায় আশ্চর্যিত হয়ে গেলে যে, একটি জাহাজ চালক ছাড়াই এদিক ওদিক যাচ্ছে।

নাস্তিক লোকটি হতভম্ব হয়ে বসে রইলো এবং আলী ইবনে মেইছামের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলো না। আর সে এটাও বুঝতে পারলো যে, জাহাজের বিষয়টি তার কথার জবাব দেয়ার জন্যেই সে উত্থাপন করেছিল[১]।

---

[১]। আল ফুসুলুল মুখতার,-সাইয়্যেদ মুর্তাযা, খণ্ড-১, পৃঃ-৪৪।

৪৬- আবু হুযাইলের সাথে আলী ইবনে মেইছামের মুনাযিরা

আবু হুযাইল আল্লাফ নামে সুন্নী মাযহাবের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অতি চালাক লোক ছিল। সে বসরা শহরে জন্ম গ্রহণ করে এবং ২৩০ হিজরীতে বাগদাদে আসে। সে একশ বছর বয়সে ২৩৫ হিজরীতে বাগদাদেই ইন্তেকাল করে।

একদিন আলী ইবনে মেইছাম আবু হুযাইলকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আচ্ছা এমনটি নয় কি যে, ইবলিস মানুষকে সব ধরনের ভাল কাজ করা থেকে নিষেধ করে এবং সব ধরনের মন্দ কাজ করতে উৎসাহিত করে?

আবু হুযাইল ঃ হ্যাঁ, এমনটিই।

আলী ঃ এমনটি কি সম্ভব যে, ইবলিস যে সকল ভাল কাজের ব্যাপারে নিষেধ করে আর যে সকল মন্দ কাজ করতে উৎসাহিত করে সেগুলো সম্পর্কে তার ধারনা নেই?

আবু হুযাইল ঃ না, এমনটি হতে পারে না।

আলী ঃ সুতরাং এটা পরিস্কার যে, ইবলিস যে সকল ভাল কাজের ব্যাপারে নিষেধ করে এবং যে সকল মন্দ কাজের ব্যাপারে উৎসাহিত করে সে গুলোর ব্যাপারে সে জ্ঞাত।

আবু হুযাইল ঃ অবশ্যই।

আলী ঃ তাহলে এখন আমাকে বল দেখি, রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে তোমার ইমাম ছিল কে? আর সে কি সকল প্রকার ভাল ও মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো?

আবু হুযাইল ঃ আবু বকর। না, সে সকল ভাল ও মন্দের ব্যাপারে জ্ঞান রাখতো না।

আলী ঃ সুতরাং ইবলিস তোমার ইমামের থেকে বেশী জ্ঞানী।

আবু হুযাইল কোন উত্তর দিতে না পেরে একটুখানি দুরে গিয়ে বসলো[১]।

অন্য আরেক দিন আবু হুযাইল আলী ইবনে মেইছামের কাছে জিজ্ঞাসা করলোঃ আলীর (আঃ) ইমামত সম্পর্কে এবং তিনি যে

আবু বকরের থেকে প্রাধান্যতা রাখে সে ব্যাপারে তোমার দলিল কী?

আলী ঃ দলিল এটাই যে, তখন ইজমা ও সকল মুসলমানের সিদ্ধান্ত ছিল রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে আলীই (আঃ) হচ্ছেন মু'মিন ও পরিপূর্ণ মানুষ (ইনসানে কামেল)। কিন্তু এরূপ ইজমা আবু বকরের ব্যাপারে ছিল না।

আবু হুযাইল ঃ আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুণ। রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে কারা

---

[১]। আল ফুসুলুল মুখতার,-সাইয়্যেদ মুর্তাযা, খণ্ড-১, পৃঃ-৫, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১০, পৃঃ-৩৭০।

সেই ব্যক্তি যাদের আবু বকরের জ্ঞান ও ঈমানের ব্যাপারে ইজমা ছিলা না।

আলী ঃ আমি ও আমার পূর্ব পুরুষগণ এবং আজকের যুগে আমার ছাত্ররা।

আবু হুযাইল ঃ সুতরাং তুমি ও তোমার ছাত্ররা গোমরাহের মধ্যে আছো।

আলী ঃ এই ধরনের কথার উত্তর হচ্ছে লাঠি পেটা, অন্য কিছু নয়[১]। (অর্থাৎ তুমি যুক্তিযুক্ত উত্তর না দিয়ে গালাগাল দিচ্ছ, অতএব যে মাটির ঢিল ছুড়ে মারে তাকে পাথর ছুড়ে মারাই হচ্ছে উপযুক্ত পুরস্কার)।

---

[১]। আল ফুসুলুল মুখতার,-সাইয়্যেদ মুর্তাযা, খণ্ড-১, পৃঃ-৪৪।

৪৭- মুনাযিরার পর ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিযের পক্ষ থেকে ইমাম আলীকে (আঃ) উত্তম ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা দান

অষ্টম আব্বাসীয় খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিযের খেলাফতকালে সুন্নী মাযহাবের এক ব্যক্তি নিম্নরূপ কসম কেটেছিল ঃ

ان علياً خير هذه الامة و الا امر أتي طالق ثلاثاً

- আলী (আঃ) হচ্ছে উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, আর যদি তা না হয়ে থাকে তবে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক।

ঐ ব্যক্তি বিশ্বাস করতো যে, রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে আলী (আঃ) হচ্ছে উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাই তার তালাক হচ্ছে বাতিল। (সুন্নী মাযহাবের দৃষ্টিতে একই স্থানে তিন তালাক বললে তা গ্রহণ হয়ে থাকে)।

ঐ তালাক প্রাপ্ত মহিলার পিতার বিশ্বাস মতে আলী (আঃ) উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল না। তাই সে ঐ তালাককে সঠিক বলে গন্য করে। ঐ মহিলার পিতা ও স্বামীর মধ্যে গোলমাল শুরু হলে তার স্বামী বলল ঃ এই মহিলা আমার স্ত্রী। আর আমি যে তালাক দিয়েছি তা হচ্ছে বাতিল, কেননা তালাকের শর্ত হচ্ছে যদি আলী (আঃ) উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি না হয়ে থাকে কিন্তু এটা পরিস্কার যে, আলী (আঃ) হচ্ছে উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। সুতরাং তালাক হয় নি।

তার পিতা বলল ঃ তালাক হয়েছে, কেননা আলী (আঃ) উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নয়। সুতরাং আমার কন্যা তোমার জন্য হচ্ছে হারাম।

তাদের মধ্যে বিতর্ক আরো বেড়ে চললো। একদল মহিলার স্বামীর পক্ষে আর একদল মহিলার পিতার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করায় বিষয়টি আরো বিকট রূপ ধারন করলো।

মেইমুন ইবনে মিহ্রান ঘটনাটিকে ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিযের কাছে লিখে জানালো। যাতে করে সে যেন এই ঘটনার নিঃস্পত্তি দেয়।

ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিয একটি সভার আয়োজন করলো। বনি হাশিম ও বনি উমাইয়্যা এবং কুরাইশের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদেরকে সেই সভায় দাওয়াত দিল। তারা সভায় উপস্থিত হলে তাদেরকে উক্ত বিষয়টি সমাধান করার জন্য নির্দেশ দিল। তাদের মধ্যে অনেক কথাই হল। বনি উমাইয়্যা উক্ত বিষয়ের কোন জবাব দিতে না পেরে চুপ করে বসে রইলো।

অবশেষে বনি হাশিমের বনি আকীল গোত্রের একজন বলল ঃ ঐ তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আলী (আঃ) রাসূলে খোদার (সাঃ) পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। যেহেতু আলী (আঃ) উত্তম না হলে তালাক কার্যকর হত, কিন্তু যেহেতু আলী (আঃ) উত্তম ব্যক্তি তাই তালাক গ্রহণীয় নয়।

ঐ ব্যক্তি তার বক্তব্যের ব্যাপারে যুক্তি তুলে ধরে বলল ঃ তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি যে, রাসূলে খোদা (সাঃ) হযরত ফাতিমা (সালাঃ) অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যান। সে সময় তিনি হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) বলেন ঃ আমার প্রিয় কন্যা তুমি কি খেতে চাও?

ফাতিমা (সাঃ) বললেন ঃ আমি আঙ্গুর খেতে চাই।

কিন্তু তখন আঙ্গুর উৎপাদনের সময় নয়। আর আলীও (আঃ) তখন সফরে ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) নিম্নোক্ত দোয়াটি করলেন ঃ

اللهم آتنا به مع افضل امتي عندك منــزلة

- হে আল্লাহ্‌! সেই ব্যক্তির মাধ্যমে আঙ্গুর পৌছাও যার স্থান তোমার দরবারে আমার সকল উম্মতের থেকে উচ্চে।

হটাৎ আলী (আঃ) বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লেন। তাঁর হাতে একটি ঝুড়ি ছিল যা তাঁর আভার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

নবী (সাঃ) বললেন ঃ হে আলী! তোমার হাতে ওটা কি?

আলী (আঃ) বললেন ঃ এই ঝুড়িতে আঙ্গুর আছে যা ফাতিমা (সালাঃ) খেতে চায়। এগুলো তাঁর জন্য এনেছি।

নবী (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌ আকবার, আল্লাহ্‌ আকবার। হে আল্লাহ্‌ যেভাবে আলীকে (আঃ) আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে নির্দিষ্ট করে আমাকে খুশি করেছো, তদ্রূপ আমার কন্যাকে এই আঙ্গুর খাওয়ার মাধ্যমে রোগ মুক্ত কর।

তারপর আঙ্গুরগুলো ফাতিমা (সালাঃ) নিকট নিয়ে গিয়ে বললেন ঃ আমার প্রিয় কন্যা, আল্লাহ্‌র নামে এই আঙ্গুর খাও।

ফাতিমা (সালাঃ) সেই আঙ্গুর খেলেন এবং নবী (সাঃ) তখনও তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যান নি এমতাবস্থায় তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করলেন।

ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিয ঐ ব্যক্তিকে বলল ঃ তুমি সত্য বলেছো এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এই হাদীসটি শুনলাম ও বুঝলাম এবং তা গ্রহণ করলাম।

তারপর ঐ মহিলার স্বামীকে বলল ঃ তোমার স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যাও। সে হচ্ছে তোমার স্ত্রী। যদি তোমার শশুর এ ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ী করে তবে তার মুখ থেতলে দিও..............[১]।

আর এভাবেই এক বিশাল সভা বা সমাবেশে অষ্টম আব্বাসী খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিয সরকারীভাবে আলীকে (আঃ) উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা দিল। আর এতে করে ঐ দু'জনের স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট থাকলো।

---

[১]। শারহে নাহ্‌জুল বালাগাহ্‌ -ইবনে আবিল হাদীদ, ইহ্‌কাকুল হাক্কের উদ্ধৃতি মতে, খণ্ড-৪, পৃঃ-২৯২ থেকে ২৯৫।

৪৮-শেইখ বাহায়ীর এক বিরোধীকে হারিয়ে দিতে এক চমৎকার মুনাযিরা

মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আব্দুস সামাদ 'শেইখ বাহায়ী' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শিয়া মাযহাবের এক বিশিষ্ট আলেম। ১০৩১ হিজরীতে তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন। তার কবরটি ইরানের মাশহাদ শহরে ইমাম রেযার (আঃ) মাজার শরিফের পাশে অবস্থিত। এক সফরে তিনি সুন্নী এক আলেমের সাথে পরিচিত হলে তার কাছে নিজেকে শা'ফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বলে পরিচয় দেন।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের এই ব্যক্তিও শা'ফেয়ী মাযহাবের ছিল, তাই যখন সে জানতে পারলো যে, শেইখ বাহায়ীও হচ্ছে শা'ফেয়ী মাযহাবের এবং সে ইরান থেকে এসেছে তখন সে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে বলল ঃ শিয়ারা যে বিষয়গুলো বলে থাকে সে বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাদের কাছে উপযুক্ত দলিল আছে কি?

শেইখ বাহায়ী বলল ঃ আমি ইরানে কখনো কখনো তাদের সাথে আলোচনা করে থাকি। সেখানে দেখেছি যে, তাদের বক্তব্যের পক্ষে উপযুক্ত দলিল রয়েছে।

ঐ ব্যক্তি বলল ঃ যদি সম্ভব হয়, ঐ আলোচনার একটি আমার কাছে বর্ণনা করুন।

শেইখ বাহায়ী বললেন যেমন তারা বলে থাকে ঃ সহীহ্ বুখারীতে (আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ) লিখিত আছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني و من اغضبها فقد اغضبني

- ফাতিমা (সালাঃ) হচ্ছে আমার দেহের অংশ, যে তাকে কষ্ট দিবে সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে আর যে তাকে রাগান্বিত করবে সে আমাকে রাগান্বিত করেছে[১]।

এবং এই গ্রন্থে উক্ত রেওয়ায়েতের চার পৃষ্ঠা পরেই বলা হয়েছে যে,

و خرجت فاطمة من الدنيا و هي غاضبة عليهما

- আর ফাতিমা (সালাঃ) আবু বকর ও ওমরের উপর রাগান্বিত অবস্থায় ওফাত করেছিলেন[২]।

এই দুটি রেওয়ায়েতকে একত্রিত করার পর (যা সুন্নত ওয়াল জামায়া'তের প্রসিদ্ধ

---

[১]। সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-৭, পৃঃ-৪৭, বৈরুত প্রিন্ট।

[২]। সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-৯, পৃঃ-১৮৫, বৈরুত প্রিন্ট এবং ফাযায়েলুল খামসাহ্ মিনাস সাহাহিস সিত্তা, খণ্ড-৩, পৃঃ-১৯০।

গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে) এবং তা থেকে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সে ব্যাপারে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়া'তের কাছে কি জবাব আছে?

ঐ ব্যক্তি কিছু সময় চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলো (কেননা উক্ত দুই রেওয়ায়তকে একত্রিত করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা হচ্ছে, ঐ দু'ব্যক্তি (আবু বকর ও ওমর) ন্যায়পরায়ণ ছিল না। সুতরাং তারা রাহ্‌বার বা উম্মতে ইসলামীর পরিচালকের স্থানে অধিষ্টিত হতে পারে না)। এরূপে অনেকক্ষণ ভেবে সে বলল ঃ কখনো কখনো শিয়ারা মিথ্যা বলে থাকে। তদ্রূপ এটাও হয়তো তাদের মিথ্যা কথার একটি। আমাকে সময় দিন, আমি আজ রাতে সহীহ্‌ বুখারী দেখবো যাতে করে সত্য মিথ্যা উদঘাটন করতে পারি। আর উপরের বিষয়টি সত্য হলে তার ব্যাপারে উত্তর খুজে বের করার চেষ্টা করবো।

শেইখ বাহায়ী বলেন ঃ পরের দিন, ঐ ব্যক্তির সাথে দেখা হলে তাকে বললাম, তোমার গবেষণা কোথায় পৌছালো?

সে বলল ঃ আমি আগেই যা বলেছিলাম তাই সত্য যে, শিয়ারা কখনো কখনো মিথ্যা বলে থাকে। কেননা আমি সহীহ্‌ বুখারীতে দেখেছি যে, সেখানে উক্ত রেওয়ায়েতটি লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু উল্লেখিত উক্ত দুই রেওয়ায়েতের মধ্যে প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠার ব্যবধান রয়েছে। আর শিয়ারা বলছে যে, দুই রেওয়ায়েতের মধ্যে চার পৃষ্ঠার ব্যবধান রয়েছে[১]!!

সত্যই এটা একটি আশ্চার্য ধরনের উত্তর। কেননা তা হচ্ছে ভ্রামাত্মক যুক্তি প্রদর্শন। শিয়াদের বক্তব্য হচ্ছে উক্ত দুটি রেওয়ায়েত সহীহ্‌ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে, তা পাঁচ পৃষ্ঠার ব্যবধানে হোক অথবা পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ব্যবধানেই হোক না কেন তাতে কোন পার্থক্য আছে কী?!

---

[১]। রোউযাতুল জান্নাত (শেইখ বাহাউদ্দিন আ'মিলির জীবনালেখ্য)।

৪৯- সাইয়্যেদ মুসিলির সাথে আল্লামা হিল্লির মুনাযিরা

অষ্টম দশকের প্রথম দিকে, সুন্নী মাযহাবের অনুসারী এগারোতম শাহ্ খোদবান্দ শাহ্ ইলখানিয়ান ৭০৯ হিজরীতে আল্লামা হিল্লির (শিয়া মাযহাবের বিশিষ্ট মার্জা) যুক্তি ভিত্তিক মুনাযিরার কারণে শিয়া মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায়। আর ঐ শাহ্ সরকারীভাবে শিয়া মাযহাবকে ইরানের রাষ্ট্রীয় মাযহাব বলে ঘোষণা দেয়।

একদিন সুন্নী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেমগণ শাহ্ খোদাবান্দের প্রাসাদে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। শাহের আমন্ত্রণে আল্লামা হিল্লিও ঐ সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত আলেমগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ধরনের মুনাযিরা অনুষ্ঠিত হল। এখানে আমরা সাইয়্যেদ মুসিলি ও আল্লামা হিল্লির মধ্যে যে মুনাযিরাটি সংঘটিত হয়েছিল তারই বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সাইয়্যেদ মুসিলি (সুন্নী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম) আল্লামা হিল্লিকে (রহঃ) বলল ঃ নবী (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারো উপর সালাওয়াত দেয়ার দলিলটি কী?

আল্লামা হিল্লি প্রশ্ন শেষ না হতেই এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

و بشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة ....

- ছবরকারীদেরকে বলে দাও যে, যখনই তারা কোন সমস্যায় পড়বে তখনই যেন তারা বলে, আমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছি এবং পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যাব। আর এ ধরনের সকলের প্রতিই আল্লাহ্র সালাওয়াত ও রহমত পতিত হয়েছে[১]।

সাইয়্যেদ মুসিলি অসর্তকভাবে বলল ঃ নবী (সাঃ) ব্যতীত অন্য কাদের (অর্থাৎ পবিত্র ইমামগণ) উপর সমস্যা এসেছে যে, তাদের জন্য সালাওয়াত পড়াটা হচ্ছে উত্তম?!

আল্লামা হিল্লি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ঃ তাদের কঠিন ও নিদারুন কষ্টের কারণ হচ্ছে তোমার মত নাতি থাকায় যারা আজাব পাবে জেনেও

নবী (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের সাথে মুনাফিকি করে।

উপস্থিত সবাই আল্লামা হিল্লির ততক্ষণাৎ জবাবের কারণে হেসে ফেললো[২]।

---

[১]। বাকারাহ্ ঃ ১৫৫ থেকে ১৫৮।

[২]। বিহজাতুল আমাল, খণ্ড-৩, পৃঃ-২৩৪।

৫০- আ'মিরিণ বে মা'রুফের প্রধানের সাথে এক শিয়া আলেমের মুনাযিরা

সৌদি আরবের মদীনা শহরে আ'মিরিণ বে মা'রুফদের একত্রিত হওয়ার প্রতিষ্ঠানে (যেখানে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা হয়) এক শিয়া আলেম গিয়েছিল। সেখানে তাদের প্রধানের সাথে শিয়া আলেমের এক মুনাযিরা সংঘটিত হয়, যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রধান ঃ রাসূলে খোদা (সাঃ) দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তার মাধ্যমে ক্ষতি বা লাভ কোনটাই আশা করা যায় না। সুতরাং আপনারা তাঁর কবরে কি চান?

শিয়া আলেম ঃ রাসূলে খোদা (সাঃ) যদিও ইন্তেকাল করেছেন তথাপিও তিনি জীবিত আছেন। কেননা পবিত্র কোরআন বলেছে ঃ

و لا يحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون

- কখোনই এটা চিন্তা করো না যে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়েছেন তারা মৃত্যুবরণ করেছেন বরং তারা জীবিত আছেন এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে জীবন ধারনের উপকরণ পেয়ে থাকেন [১]।

আর এ ব্যাপারে প্রচুর পরিমানে রেওয়ায়েতও আছে যা এটাই প্রমাণ করে যে, নবীর (সাঃ) সম্মান ও মর্যাদা তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর জীবিত থাকার ন্যায়।

প্রধান ঃ উক্ত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহে যে হায়াত বা জীবনের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের মত এমন জীবন বা হায়াত নয় বরং তা অন্য রকম।

শিয়া আলেম ঃ কোন অসুবিধা আছে কি যে, নবী (সাঃ) ইন্তোকালের পরে এমন হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয়েছেন যাতে করে তিনি আমাদের কথা শুনতে পান এবং ঐ দুনিয়ায় থেকেই তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করবেন? এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, 'আপনার পিতার ইন্তেকালের পরে আপনি কি তার কবরের পাশে যাবেন না এবং আল্লাহ্র দরবারে তার জন্য মাগফিরাত কমনা করবেন না?

প্রধান ঃ কেন, অবশ্যই যাবো।

শিয়া আলেম ঃ আমরা তো নবীর (সাঃ) সময়ে ছিলাম না। আর সে কারণেই তাকে যিয়ারতও করতে পারি নি। কিন্তু এখন তাঁর কবরে এসেছি যিয়ারত করতে এবং তবারুক নিতে।

বিষয়টি এরূপ যে, এই কবরে যেহেতু রাসূলে খোদার (সাঃ) পবিত্র দেহকে

---

[১]। আলে ইমরান ঃ ১৭৮।

সমাধি করা হয়েছে সেহেতু অবশ্যই এই কবরও পবিত্র হয়ে গেছে। আর আমরা এ করণেই এই কবরের মাটিতে তাবার্রুক নিয়ে থাকি। যেমন কেউ বলে 'আমি আমার শিক্ষকের অথবা পিতার প্রতি এতই ভালবাসা রাখি যে, তার পায়ের ধুলাকে চোখের সুরমার অনুরূপ মর্যাদা দেই।

লেখক বলেন ঃ আমার স্মরণে আছে যে, যখন ইমাম খোমেনী (রহঃ) নির্বাসনে ছিলেন তখন তার প্রেমে ভক্ত এক শিক্ষক বলেছিল ঃ আমার আশা এটাই যে, আমার পাগড়ীটি ইমাম খোমেনীর (রহঃ) জুতার ধুলা দিয়ে ধুলায়িত করে তা মাথায় পরে নামায আদায় করবো। এই ধরনের কথা ও কাজ হচ্ছে কারো প্রতি অন্তরে নিগুঢ় ভালবাসার লক্ষ্যণ এবং তার রংয়ে রঙ্গীন হয়ে যাওয়ার প্রমাণবহ। যা কোন প্রকার শির্কের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর তাই পবিত্র কোরআন পরিস্কারভাবে আল্লাহ্র অলি-আউলিয়াগণকে উছিলা দেয়াটা যে, বিশেষ ফলদায়ক তা প্রকাশ করেছে যেমন নিম্নোক্ত আয়াতটি ঃ

و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

- আর যখন বিরোধীতাকারীরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল এবং তোমার কাছে এসে তোমার মাধ্যমে খোদার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। আর নবী (সাঃ) তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন তখন তারা আল্লাহ্কে তওবা গ্রহণকারী ও মেহেরবান হিসেবে উপলব্দি করেছিল[১]।

---

[১]। নিসা ঃ ৬৪।

৫১- আল্লামা আমিনীর সন্তোষজনক জবাব

আল্লামা আমিনী (রহঃ) শিয়া মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম এবং তিনি হচ্ছেন অতি মুল্যবান গ্রন্থ আল গাদীরের প্রণেতা। তিনি এক সফরে একটি সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে এক সুন্নী আলেম তাকে বলে ঃ আপনারা শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হযতর আলীর (আঃ) ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ী করে থাকেন। যেমন তাকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন (يد الله)، (عين الله) (আল্লাহ্র হাত ও আল্লাহ্র চোখ) এবং আরো অনেক উপাধিতে। একজন সাহাবাকে এরূপে সম্বোধন করা অনুচিৎ।

আল্লামা আমিনি তড়িৎ গতিতে উত্তর দিলেন ঃ যদি ওমর ইবনে খাত্তাব, আলীকে (আঃ) ঐ উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন সেক্ষেত্রে কি বলবে?

সে বলল ঃ ওমরের কথা আমাদের জন্য হচ্ছে হুজ্জাত (দলিল) স্বরূপ।

আল্লামা আমিনি ঐ সমাবেশে আহ্‌লে সুন্নতের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আনতে বললেন। গ্রন্থটি আনা হলে তিনি তার পাতা উল্টে নির্দিষ্ট বিষয়ে পৌছালেন। সে পাতায় নিম্নোক্ত হাদীসটি লিপিবদ্ধ ছিলঃ

"এক ব্যক্তি কা'বা তাওয়াফ করার সময় এক নামাহারাম (যার সাথে বিয়ে করা জায়েজ) মহিলার দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকালো। হযরত আলী (আঃ) তা দেখতে পেয়ে তার মুখমণ্ডলে হাত দিয়ে একটি আঘাত করলেন। আর এভাবেই তাকে শাস্তি দিলেন।

সেই ব্যাক্তি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ করার লক্ষ্যে ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট গিয়ে ঘটনাটি খুলে বলল।

জনাব ওমর উত্তরে বলল ঃ

قد رآی عین الله و ضرب ید الله

- সত্যই আল্লাহ্র চোখ তা দেখেছে এবং আল্লাহ্র হাত আঘাত করেছে।

(এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আলীর (আঃ) চোখ কখনো ভুল দেখে

না। কেননা তাঁর চোখ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি অঘোর বিশ্বাসে বিশ্বস্ত। তাই এমন চোখ কখনো ভুল করতে পারে না। আর আলীর (আঃ) হাতও হচ্ছে ঐরূপ যে, আল্লাহ্কে রাজি ও খুশি করানো ব্যতীত প্রসারীত হয় না)।

প্রশ্নকারী যখন এই হাদীসটি দেখলো তখন বিষয়টি বুঝতে পারলো এবং চুপ হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা ঃ এরূপ উপাধিসমূহ হচ্ছে হযরত ঈসার (আঃ) ব্যাপারে যেরূপে (روح الله) (রুহুল্লাহ্) ব্যবহার করা হত তার অনুরূপ। আর এগুলো সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে

বলা হয়ে থাকে। এমনটি নয় যে, সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র হাত অথবা রুহ অথবা চোখ রয়েছে।

৫২- মোহ্র অথাব পাথরের উপর সিজদা দেয়া কি শিরক?

একজন মার্জায়ে তাক্লীদ বলেন ঃ একদিন মদীনায় মসজিদুন নবীতে ফজরের নামায আদায় করে রাসূলে খোদার (সাঃ) মিম্বারের পাশে বসেছিলাম। সেখানে বসে কোরআন তেলোয়াৎ করছিলাম। হটাৎ সেখানে একজন শিয়া মাযহাবের অনুসারী উপস্থিত হয়ে নামায পড়তে শুরু করলো। আমার ডান পার্শ্বে দুইজন মিশরের অধিবাসী মসজিদের থামের গায়ে ভর দিয়ে বসে ছিল। শিয়া ব্যক্তিটি নামায পড়তে পড়তে পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোহ্র অথবা পাথর টুকরো বের করলো তার উপর সিজদা দেয়ার জন্য।

ঐ দু'জন একে অপরের মধ্যে বলতে লাগলো যে, এই আ'জাম (যারা আরব নয় তাদেরকে আ'জাম বলা হয়) ব্যক্তিটিকে দেখ, সে মোহ্র অথবা পাথর টুকরার উপর সিজদা দিতে চায়!!

শিয়া ব্যক্তিটি রুকুতে গেল এবং রুকু শেষে সিজদাতে। সিজদাতে গিয়ে সে তার কপালটিকে এক খণ্ড পাথরের উপরে রাখলো। হটাৎ ঐ দু'জনের একজনকে দেখলাম যে, তড়িৎ গতিতে উঠে দাড়ালো এবং ঐ শিয়া ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হল তার প্রতি অভিযোগ করার জন্য এবং তার কপালের নিচ থেকে ঐ পাথর খণ্ডটিকে সরিয়ে নিতে। তার কাছে পৌছাবার আগেই আমি তার হাত ধরে ফেললাম এবং গম্ভীর স্বরে বললামঃ

কেন একজন মুসলমানের নামাযকে বাতিল করছো, বিশেষ করে যখন কেউ এই পবিত্র স্থানে রাসূলে খোদার (সাঃ) কবরের পাশে নামায আদায় করছে?

বলল ঃ সে পাথর খণ্ডের উপর সিজদা দিচ্ছিলো।

বললাম ঃ যদি সে পাথর খণ্ডের উপর সিজদা করে তবে তাতে অসুবিধা কোথায়? আমিও তো পাথরের উপর সিজদা দেই।

বলল ঃ কেন এবং কি কারণে।

বললাম ঃ ঐ ব্যক্তি হচ্ছে শিয়া এবং জা'ফারী মাযহাবের অনুসারী। আর আমিও ঐ মাযহাবের অনুসারী। জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ, ইমাম

সাদিককে (আঃ) চেন?

বলল ঃ হ্যাঁ।

বললাম ঃ তিনি কি রাসূলে খোদার (সাঃ) পরিবারের?

বলল ঃ হ্যাঁ।

বললাম ঃ তিনিই হচ্ছেন আমাদের মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। আর তিনিই বলেছেনঃ " কার্পেট ও শতরঞ্জির উপর সিজদা দেয়া জায়েয নয়, বরং অবশ্যই যমিন থেকে উৎপন্ন

এমন কোন জিনিষের উপর সিজদা দিতে হবে"।

ঐ ব্যক্তি কিছু সময় চিন্তা করে বলল ঃ দ্বীন তো একই এবং নামাযও তো একই।

বললাম ঃ যদি দ্বীন ও নামায একই হয়ে থাকে, তাহলে কেন তোমর সুন্নী মাযহাবের চার ফিরকার অনুসারীরা চার প্রকৃতিতে নামায আদায় করে থাকো? মালেকি ফিরকার লোকেরা তো হাত ছেড়ে নামায পড়ে থাকে, অন্য তিন ফিরকার লোকেরা কেউ বুকে হাত বেধে নামায পড়ে আবার কেউ নাভির উপর হাত বেধে নামায পড়ে থাকে। যদিও নামায একটিই এবং রাসূলে খোদা (সাঃ) এক পদ্ধতিতেই নামায আদায় করেছিলেন। আর তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলে থাকে যে, আবু হানিফা অথবা শা'ফেয়ী অথবা মালেক অথবা আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বাল এরূপ বলেছেন।

বলল ঃ হ্যাঁ, তারা এরূপ বলেছেন।

বললাম ঃ জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ, ইমাম সাদিক (আঃ) আমাদের মাযহাবের জনক। আর তুমি স্বীকারও করেছো যে, তিনি হচ্ছেন নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভূক্ত। তিনি আমাদেরকে এরূপে নামায পড়তে বলেছেন। কেননা (اهل البيت ادرى بما في البيت -বাড়ীর সদস্যগণ ঐ বাড়ীতে যা কিছু আছে সে ব্যাপারে বেশী অভিজ্ঞ) রাসূলে খোদার (সাঃ) আহ্‌লে বাইত তাঁর নির্দেশে সকল বিষয়ে অন্যদের থেকে বেশী জ্ঞাত। সেহেতু ইমাম সাদিকের (আঃ) জ্ঞান ও বিজ্ঞতা নবীর (সাঃ) নির্দেশে আবু হানিফার থেকে কম নয় বরং অনেক বেশী। আর তিনি বলেছেন ঃ অবশ্যই নামায আদায়ের সময় যমিন থেকে উৎপন্ন জিনিষের উপর সিজদা দিতে হবে শুধুমাত্র পশম ও তুলা ব্যতীত। আমাদের মধ্যে বিরোধটা অনুরূপ তোমাদের নিজের মধ্যকার বিরোধের (হাত বাধার বিষয়টির) মতই। আর তা এ মত পার্থক্য হচ্ছে ফুরুয়ে দ্বীনের মধ্যে, উসূলে দ্বীনের মধ্যে নয়। আর তা শির্‌কের সাথে কোন প্রকার সম্পর্কই রাখে না।

আমাদের আলোচনা এ পর্যায়ে পৌছালে আহ্‌লে সুন্নাতের উপস্থিত সকলেই আমার দেয়া যুক্তিকেই উপযুক্ত বলে স্বীকৃতি দিল। তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে (যে শিয়া ব্যক্তির মোহ্‌র কেড়ে নিতে যাচ্ছিল) রাগান্বিত হয়ে বললাম ঃ রাসূলে খোদার (সাঃ) কাছে কি তোমরা লজ্জিত নও। কেননা তাঁর পবিত্র কবরের পাশে একজন মুসলমানের উপর হামলা করে তার নামাযকে বাতিল করে দাও। সে তো তার মাযহাবের নির্দেশ অনুযায়ী নামায আদায় করছে। আর উক্ত মাযহাবটি হচ্ছে এই পবিত্র কবরে যিনি শায়িত তাঁর পরিবারের।

الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً

- তাঁরা এমনই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের থেকে সব ধরনের অপবিত্রতা দুরিভূত

এবং তাদেরকে পবিত্র করেছেন[১]।

উপস্থিত সকলেই ঐ দু'জনকে অপদস্থ করে বলল ঃ কেন এই মুসলমান ব্যক্তিকে, যে তার নিজের মাযহাবের আক্বীদা মতে নামায আদায় করছিল তার উপর চড়াও হয়েছিলে? এ কথার পরে ঐ দু'জন ব্যক্তি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে[২]।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়া'ত ও ওহাবী আলেমগণের এ কাজটি কতই না আশ্চর্যের যে, তারা সাধারণ মানুষকে বলে থাকেন মাটির মোহ্‌র, পাথর খণ্ড ও কাঠ বা যমিন থেকে উৎপন্ন যে কোন জিনিষের উপর সিজদা করা হচ্ছে শির্‌ক। এখন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ঃ

পাথর খণ্ড অথবা মোহ্‌র যা মাটি দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে তার সাথে কার্পেট বা পাটির এমন কি পার্থক্য রয়েছে যে, আপনারা কার্পেট বা পাটির উপর সিজদা দেয়াকে শির্‌ক মনে করেন না, অথচ পাথর খণ্ড বা মোহ্‌রের উপর সিজদা দেয়াকে শির্‌ক মনে করেন?

যারা কার্পেট বা পাটির উপর সিজদা করলো তারা কি উক্ত কার্পেট বা পাটির ইবাদত করে থাকে?

আপনারা যে, শিয়াদেরকে শির্‌ক করার দোষে দোষী করে থাকেন, কেন একটু ভেবে দেখেন না যে, শিয়ারা নামায আদায়কালে সিজদাতে তিনবার বলে থাকে ঃ (سبحان الله) (আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্ত্বা সব ধরনের ত্রুটি ও শির্‌ক থেকে পবিত্র) অথবা (سبحان ربي الاعلى و بحمده) (আমার প্রভু হচ্ছে পাক ও পবিত্র এবং সমস্ত হামদ ও প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁর জন্যেই)।

আপনারা যেহেতু আরবী খুবভাল জানেন, সেহেতু এই দুটি বাক্যের পার্থক্যকে খুব ভাল করেই জানবেন (السجود عليه) (তার উপরে সিজদা করা) এবং (السجود له) (তার জন্য সিজদা করা)।

যদি কোন কিছুর উপর সিজদা করে থাকি তবে তার অর্থ এই নয় যে, ঐ জিনিষকে উপসনা করে থাকি, বরং এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র সামনে সর্বপরি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকি।

আপনারা জানেন যে, মূর্তি পুজারীরা তাদের মূর্তিকে মাটিতে রেখে তাতে সিজদা করার জন্য তার উপর কপাল রাখে না বরং মূর্তিকে তাদের সামনে রেখে তার উদ্দেশ্যে

---

[১]। আহ্‌যাব ঃ ৩৩ নং আয়াতে এই বিষয়েরই প্রমাণ করে।

[২]। আল্ ইহ্‌তিজাজাতুল আ'শারাতু মায়া'ল উ'লামা ফিল মাক্কাতি ওয়াল মাদীনাহ্, পৃঃ- ১৩-১৫।

মাটিতে সিজদা করে থাকে। আর সে কারণেই আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, তারা ঐ মূর্তিকে সিজদা করছে। আর তা কখনোই এমন নয় যে, যা কপালের নিচে রাখা হয় (পাথর খণ্ড ....) তার উপসনা করছে।

ফলাফল ঃ কার্পেট বা পাটি বা পাথর খণ্ড বা মোহ্‌রের উপর সিজদা দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা সেগুলোকে মা'বুদ হিসেবে কেউ মনে করেন না। বরং সিজদা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যেই।

পার্থক্য শুধু এত টুকুই যে, আমাদের মাযহাবের জনক নবীর (সাঃ) উত্তরসূরী ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ যমিন থেকে উৎপন্ন জিনিষের উপর (যেমন ঃ পাথর খণ্ড, মাটি দিয়ে তৈরী মোহ্‌র অথবা কাঠের টুকরো) সিজদা করতে হবে। যেমন আপনাদের চার ফিরকার ইমামগণ (যেমন আবু হানিফা, শা'ফেয়ী ....) বলেছেন ঃ কার্পেট বা অনুরূপ কিছুর উপর সিজদা দেয়া জায়েয।

এখন আমাদের কাছে আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে, কেন আমরা কার্পেট বা অনুরূপ কিছুর উপর সিজদা দেই না বরং মাটির উপর বা অনুরূপ কিছুর উপর সিজদা করি?

উত্তর ঃ রাসূলে খোদার (সাঃ) সিজদা দেয়ার স্থান কার্পেট বা অনুরূপ কিছু ছিল না। বরং তিনি মাটি বা বালির উপর সিজদা দিতেন। তাঁর সাথে সাথে ঐ সময়ের সকল মুসলমান মাটি বা বালির উপর সিজদা করতেন। আমরাও তাদেরকে অনুসরণ করে মাটি বা বালির উপর সিজদা দিয়ে থাকি[১]।

হ্যাঁ, হয়তো কিছু রেওয়ায়েত এমন আছে যে, প্রচণ্ড গরমের কারণে অনুমতি ছিল যে, কাপড়ের বা পোশাকের উপরে সিজদা দেয়া যাবে। যেমন আনাস ইবনে মালেক উল্লেখ করেছেন ঃ

كنا نصلي مع النبى (ص) فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود

- আমরা নবীর (সাঃ) নামায পড়ছিলাম, সিজদা দেয়ার স্থান প্রচণ্ড গরম থাকায় আমাদের মধ্যে কয়েকজন সিজদা দেয়ার সময় কপালকে নিজেদের পোশাকের এক কোনা ব্যবহার করেছিল[২]।

এ ধরনের রেওয়ায়েত থেকে এটা বুঝা যায় যে, প্রয়োজনের তাগিদে কার্পেট বা অনুরূপ কিছুর উপর সিজদা দেয়াতে অসুবিধা নেই। তবে রাসূলে খোদা (সাঃ) প্রচণ্ড

---

[১]। আত্তাজুজ জামেয়', খণ্ড-২, পৃঃ- ১৯২ (সহীহ্ সিত্তার আবওয়াবুস সুজুদ খণ্ডের প্রথম অংশ লক্ষ্যণীয়)।

[২]। আত্তাজুজ জামেয়', খণ্ড-২, পৃঃ- ১৯২ (সহীহ্ সিত্তার আবওয়াবুস সুজুদ খণ্ডের প্রথম অংশ লক্ষ্যণীয়)।

গরমের কারণেও কার্পেট, কাপড় বা অনুরূপ কিছুর উপর সিজদা দিয়েছেন কি না তা এ ধরনের রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না বা তার কোন দলিলও নেই।

আর যদি যমিন থেকে উৎপন্ন জিনিষের উপর সিজদা দেয়া শির্‌ক হয়ে থাকে তবে অবশ্যই বলতে হয় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশ্‌তাগণ আদমকে (আঃ) সিজদা করেছিলেন তা হচ্ছে শির্‌ক এবং নামায আদায়কারীগণ যে, কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করে থাকে তাও শির্‌ক। আর শির্‌ক উক্ত দু'ব্যাপারে আরো বেশী প্রবল। কেননা ফেরেশ্‌তাগণ আদমকে (আঃ) সিজদা করেছিলেন, আদমের (আঃ) উপরে সিজদা করেন নি। আর মুসলমানগণ কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করে, কা'বার উপর নামায আদায় করেন না।

যদিও কোন মুসলমান এ পর্যন্ত বলেন নি যে, আদমের (আঃ) উপর সিজদা দেয়া এবং কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করা হচ্ছে শির্‌ক। কেননা সিজদার প্রকৃত রূপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর জন্য সর্বোচ্চ পরিমানে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। সুতরাং কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করা এবং সিজদা দেয়া হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশে অতএব উক্ত সিজদা দানও তাঁর জন্যেই। আর আদমকে (আঃ) সিজদা দেয়াটা প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার এবং দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্যে। এই দৃষ্টিকোণে মোহ্‌র বা পাথর খণ্ডের উপর সিজদা দেয়াও আল্লাহ্‌র জন্যেই।

৫৩- আ'মিরিণ বে মা'রুফ প্রতিষ্ঠানের আরেক প্রধানের সাথে শিয়া আলেমের মুনাযিরা

মদীনায় আ'মিরিণ বে মা'রুফ প্রতিষ্ঠানে একটি কাজের জন্য একজন শিয়া আলেম সেখানে যায়। সেখানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে শিয়াদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আলোচনা উত্থাপিত হয় ঃ

প্রধান ঃ আপনারা কি কারণে নবীর (সাঃ) কবরের পাশে নামায পড়ে থাকেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নামায পড়া তো শির্ক?

শিয়া আলেম ঃ আমরা নবীর (সাঃ) জন্য নামায পড়ি না, বরং আল্লাহ্র জন্য নামায পড়ে থাকি। আর তার ছওয়াবকে নবীর (সাঃ) উপর উৎসর্গ করে থাকি।

প্রধান ঃ কবরের পাশে নামায পড়া তো শির্ক।

শিয়া আলেম ঃ যদি কবরের পাশে নামায পড়া শির্ক হয়ে থাকে তাহলে কা'বার পাশে নামায পড়াও তো শির্ক। কেননা 'হিজরে ইসমাঈলে' হাজার (হযরত ইসমাঈলের মা) ও ইসমাঈলের কবর এবং আরো অন্যান্য নবীগণের (আঃ) কবর রয়েছে। (শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবই এটা বিশ্বাস করেন যে, সেখানে অনেক নবীরই কবর রয়েছে)।

আপনার কথা মত তো হিজরে ইসমাঈলে নামায আদায় করা শির্ক। কিন্তু সেখানে সমস্ত (হানাফি, মালেকি, শা'ফেয়ী ও হাম্বালী) মাযহাবের আলেমগণ এবং এ ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেকেই নামায আদায় করে থাকে। সুতরাং কবরের পাশে নামায আদায় করা শির্ক নয়[1]।

তাদের একজন বলল ঃ নবী (সাঃ) কবরের পাশে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

শিয়া আলেম ঃ নবীর (সাঃ) ব্যাপারে এটা একটি মিথ্যা কথা। কেননা তিনি যদি সত্যই কবরের পাশে নামায পড়তে নিষেধ করে থাকেন

এবং তা হারাম করে থাকেন, তবে বিশ্বের মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান হজ্জের সময় কেন তাঁর কথার অবাধ্যতা করে থাকে এবং এই হারাম কাজকে তাঁর মসজিদে তাঁরই মাজারের পাশে এবং আবু বকর ও ওমরের কবরের পাশে আঞ্জাম দিয়ে থাকে[2]?

---

[1]। মুনাযিরাতি ফিল হারামাইনিশ্ শারাফাইনি -সাইয়্যেদ আলী বাতহায়ী (এই বইয়ের ৫ নং মুনাযিরাহ্)।

[2]। মুনাযিরাতি ফিল হারামাইনিশ্ শারাফাইনি -সাইয়্যেদ আলী বাতহায়ী (এই বইয়ের ৫ নং মুনাযিরাহ্)।

আবার অনেক রেওয়ায়েত উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণও কবরের পাশে নামায আদায় করেছেন। যেমনঃ

সহীহ্ বুখারীতে[১] উল্লেখ হয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সাঃ) কুরবানীর ঈদের দিনে বাকি কবরস্থানে দুই রাকায়া'ত নামায আদায় করেছেন এবং নামায আদায় শেষে বলেছেন ঃ এই দিনের সর্ব প্রথম করণীয় হচ্ছে নামায আদায় করা এবং তারপর আলিঙ্গন করা ও কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করলো সে আমার সুন্নতের পক্ষে আমল করলো।

এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, রাসূলে খোদা (সাঃ) কবরের পাশে নামায আদায় করেছেন কিন্তু আপনারা কেন কবরের পাশে নামায আদায় করতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ ইসলাম এটাকে জায়েয করে নি। যদি ইসলাম বলতে আপনারা নবীর (সাঃ) শরিয়তকে বুঝিয়ে থাকেন তবে এই শরিয়তের পিতা মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই কবরস্থানে বাকিতে নামায আদায় করেছেন। আর নবীর (সাঃ) মদীনায় প্রবেশের সময় থেকে আজোবধি বাকি, কবরস্থান হিসেবেই বর্তমান রয়েছে। সুতরাং রাসূলে খোদার (সাঃ) কাছে এবং যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের মতে কবরের পাশে নামায আদায় করা জায়েয। কিন্তু আপনারা নবীর (সাঃ) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কবরের পাশে নামায আদায় করাকে নিষেধ করে থাকেন।

এই বিষয়ে একটি দুঃখজনক গল্প ঃ

ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তিজানী সুন্নী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে শিয়া মাযহাব গ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন ঃ

'আমি মদীনায় বাকি কবরস্থানে যিয়ারতের জন্য গিয়েছিলাম। আর সেখানে দাড়িয়ে আহ্লে বাইতের (আঃ) উপর দরুদ পাঠ করছিলাম। আমার পাশে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি দাড়িয়ে কাঁদছিল। তাকে কাঁদতে দেখে বুঝলাম যে, সে হচ্ছে শিয়া। সে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়তে শুরু করলো, হটাৎ সৌদি আরবের এক পুলিশ তার দিকে ছুটে এল (বলা চলে যে, অনেকক্ষণ থেকেই তাকে লক্ষ্য করছিল)। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তখন সিজদাতে ছিল। ঐ পুলিশ তার বুট-জুতা দিয়ে এমনভাবে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে লাথি দিল যে, সে অসহায়ের মত ছিটকে আরেক দিকে পড়ে গেল এবং বিহুশ হয়ে গেল। কিন্তু তারপরও ঐ পুলিশ তাকে লাথি মারতেই থাকলো এবং গালাগালি করতে থাকলো।

আমার অন্তর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য ভারাক্রান্ত হল। আমি তো ভেবেছিলাম যে, সে হয়তো ইন্তেকাল করছে। আমি অত্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে ঐ পুলিশকে বললাম ঃ আল্লাহ্ তোমার এই কাজে খুশি হন নি। নামায পড়া অবস্থায় কেন তাকে মারলে?

---

[১]। খণ্ড-৮, পৃঃ-২৬।

সে আমাকে অভদ্রতার সাথে বলল ঃ তুই চুপ কর, যদি এ ব্যাপারে কথা বলতে আসিস তবে তোকেও ঐরূপ করবো। কিছু প্রদর্শনকারী সেখান থেকে যেতে যেতে বলল ঃ সে মার খাওয়ারই যোগ্য, কেন সে কবরের পাশে নামায পড়ছিল?

আমি রাগান্বিত হয়ে বললাম ঃ কে কবরের পাশে নামায পড়াকে হারাম করেছে? তারপর অনেক কথা-বার্তা হওয়ার পর বললাম ঃ যদি ধরেও নেই যে, কবরের পাশে নামায পড়া হচ্ছে হারাম; তবে কি তা অসংগতিপূর্ণ আচরণ করে বন্ধ করতে হবে নাকি সংগতিপূর্ণ আচরণ করে, কোনটি? লক্ষ্য করুন আপনাদেরকে এক মরুবাসীর ঘটনা বলছি ঃ নবীর (সাঃ) যুগে লজ্জা-শরমহীন এক মরুবাসী তাঁর সম্মুখে মসজিদে প্রস্রাব করলো। এক সাবাহা তলোয়ার হাতে তাকে হত্যা করার জন্য উঠে দাড়ালো। নবী (সাঃ) তার পথ রোধ করে দাড়িয়ে বললেন ঃ তাকে কষ্ট দিও না, বরং এক বালতি পানি নিয়ে এসো এবং এই প্রস্রাবের উপর ঢেলে দাও যাতে করে স্থানটি পাক হয়ে যায়। তোমরা মানুষের কাজসমূহকে সহজ করার নিমিত্তে সৃষ্টি হয়েছো, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য নয়। তোমাদের অবশ্যই আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকা উচিৎ না বিকর্ষণের। সাহাবাগণ নবীর (সাঃ) উক্তি মোতাবেক আমল করলো। অতপর নবী (সাঃ) ঐ মরুবাসীকে নিজের কাছে ডেকে তাঁর পাশে বসিয়ে তাকে স্বাগতম জানালেন। তাকে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে, এটা আল্লাহ্র ঘর আর সে ঘরকে অপবিত্র করা উচিৎ নয়। ঐ মরুবাসী ততক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল। পরবর্তীতে তাকে কখনই অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন পোশাক নিয়ে মসজিদে আসতে দেখা যায় নি।

হারাম শরিফের চৌকিদারগণের কি এরূপ ব্যবহার করা উচিৎ যা সে পুলিশ ঐ বৃদ্ধের সাথে করেছে, নাকি মানুষের সাথে ব্যবহার করার জন্য নবীর (সাঃ) ব্যবহারকে আদর্শ হিসেবে স্থান দেয়া?[১]

---

[১]। ইকতিবাস 'ছুম্মাহ্ তাদাইতু' গ্রন্থ থেকে, পৃঃ- ১১১ থেকে ১১৩।

৫৪- হযরত ফাতিমার (সালাঃ) মযলুম অবস্থা কেন?

মদীনায় আ'মিরিণ বে মা'রুফ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে একজন শিয়া আলেমের যে মুনাযিরা হয়েছিল তার এক অংশ পূর্বের মুনাযিরাতে উল্লেখ হয়েছে, এখানে উক্ত মুনাযিরার দ্বিতীয় অংশকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

প্রধান ঃ কেন আপনারা রাসূলে খোদার (সাঃ) কবরের পাশে বসে জিকির করার ন্যায় বলে থাকেন যে, السلام عليك ايتها المظلومة -সালাম তোমাকে হে অত্যাচারীত নারী। কে নবীর (সাঃ) কন্যার উপর অত্যাচার করেছিল?

শিয়া আলেম ঃ হযরত ফাতিমার (সালাঃ) অত্যাচারীত হওয়ার ঘটনা তো আপনাদের গ্রন্থসমূহেই উল্লেখ আছে।

প্রধান ঃ কোন গ্রন্থে?

শিয়া আলেম ঃ ইবনে কুতাইবাহ্ লিখিত 'আল ইমামাতু ওয়াস সাইয়্যাসাহ্' গ্রন্থের ১৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

প্রধান ঃ এরূপ গ্রন্থ আমাদের কাছে নেই।

শিয়া আলেম ঃ আমি এই গ্রন্থটিকে বাজার থেকে কিনে আপনার কাছে নিয়ে আসবো।

প্রধান আমার কথা মেনে নিলেন। আমি বাজারে গিয়ে উক্ত গ্রন্থটি ক্রয় করলাম এবং তার কাছে নিয়ে এলাম। ঐ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৯ নং পাতাটি খুলে তাকে পড়তে বললাম। ঐ পাতায় এরূপ লেখা ছিলঃ

'জনাব আবু বকর, একদল লোক যারা তার সাথে বাইয়াত করে নি তাদেরকে খুজে বেড়াচ্ছিল। তারা আলীর (আঃ) ঘরে একত্রি হয়েছিল। সে জনাব ওমর ইবনে খাত্তাবকে তাদের নিকট পাঠালো। ওমর আলীর (আঃ) বাড়ীর সামনে এসে চিৎকার ধ্বনিতে আলী (আঃ) এবং যারা সেখানে একত্রিত হয়েছিল তাদেরকে জনাব আবু বকরের হাতে বাইয়াত করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলল। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করলো। জনাব ওমর আগুন ধরানোর জন্য কাঠ আনতে বলে তাদের উদ্দেশ্যে বলল ঃ যার হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম! তোমরা অবশ্যই বাইরে আসবে আর যদি না আসো তবে এই ঘরের সবাইকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো।

উপস্থিতদের মধ্যে কেউ কেউ ওমরকে বলল ঃ হযরত ফাতিমা (সালাঃ) এই ঘরে রয়েছেন।

জনাব ওমর বলল ঃ এই ঘরে যদি ফাতিমাও থেকে থাকে, তথাপিও আগুন

লাগাবো।

এমতাবস্থায় আলী (আঃ) ব্যতীত অন্য সকলেই বাইরে বেরিয়ে এলো[১]।

উক্ত গ্রন্থের ১৯ নং পৃষ্ঠার নিচে লেখা ছিল যে, যখন জনাব আবু বকর মৃত্যুর পরওয়ানা শুণছিল তখন বলেছিল ঃ হায়! যদি আলীর (আঃ) সাথে বিরুদ্ধাচরণ না করতাম, এমনকি যদি সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করতো।

তখন শিয়া আলেম ঐ প্রধানকে বলল ঃ আবু বকরের উক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করুণ। সে মৃত্যুর সময় কিভাবে আফসোস প্রকাশ করেছে ও অনুতপ্ত হয়েছে!

প্রধান উক্ত ঘটনা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ এই গ্রন্থের লেখক শিয়াদের পক্ষপাতিত্ব করেছে[২]।

শিয়া আলেম ঃ যদি ইবনে কুতাইবাহ্ শিয়াদের পক্ষপাতিত্ব করে থাকে তবে আপনি সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারীর লেখকদ্বয়কে কি বলবেন। যারা উভয়ই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছে যে, হযরত ফাতিমা (সালাঃ) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু বকর ও ওমরের উপর রাগান্বিত ছিলেন এবং এই রাগ নিয়েই তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন।

এ ব্যাপারে সহীহ্ মুসলিমের পঞ্চম খণ্ডের ১৫৩ নং পৃষ্ঠা (মিশর প্রিন্ট) এবং সহীহ্ বুখারীর পঞ্চম খণ্ডের ১৭৭ নং পৃষ্ঠা (শো'য়েব প্রিন্ট) লক্ষ্যণীয়[৩]।

---

[১]। و ان ابا بكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند على كرم الله وجهه فبعث اليهم عمر، .... فقيل له يا ابا حفص ان فيها فاطمه؟ فقال : و ان، فخرجوا فبايعوا الا عليا..........................

[২]। মুনাযিরাতু ফিল হারামাইনিস সারিফাইনি, নং-৯।

[৩]। শারহি নাহজুল বালাগাহ্ -ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড-৬, পৃঃ-৪৬।

৫৫- ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাজারের মাটি দিয়ে তৈরী মোহ্রের উপর সিজদা দেয়ার ব্যাপারে মুনাযিরা

শেইখ মুহাম্মদ মারয়ী' আনতাকী নামে সুন্নী মাযহাবের এক আলেম আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে। সে ছিল সিরিয়ার আধিবাসী। সে কোন এক বিষয়ে গবেষণা করতে করতে শিয়া মাযহাব গ্রহণ করে। তার লিখিত (لماذا اخترت مذهب الشيعه) নামে এক গ্রন্থে শিয়া হওয়ার যুক্তি ভিত্তিক কারণ উল্লেখ করেছে। এখানে আমরা তার সাথে এক সুন্নী মাযহাবের আলেমের ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাজারের মাটি দিয়ে তৈরী মোহ্রের উপর সিজদা করার ব্যাপারে সংঘটিত মুনাযিরাকে তুলে ধরছি, তা লক্ষ্য করুন ঃ

মুহাম্মদ মারয়ী' তার বাড়ীতে ছিল। সুন্নী মাযহাবের কয়েকজন আলেম তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার পুরাতন বন্ধুও ছিল তারা তাকে দেখতে আসলো। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত আলোচনা হয় ঃ

তারা ঃ শিয়ারা ইমাম হুসাইনের মাজারের মাটি দিয়ে তৈরী মোহ্রের উপর সিজদা দিয়ে থাকে। আর যেহেতু তারা এই কাজ করে তাই তার হচ্ছে মুশরিক।

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ মাটির উপর সিজদা করা শির্ক নয়। কেননা শিয়ারা মাটির উপর আল্লাহ্র জন্য সিজদা করে থাকে। এরূপ নয় যে, তারা মাটিকে সিজদা করে। যদি তোমরা মনে করে থাকো যে, এই মাটির মধ্যে অন্য কিছু আছে এবং তারা তার জন্য সিজদা করে থাকে তবে এরূপ ধারনার করণে তা শির্ক বটে। কিন্তু শিয়ারা তাদের মা'বুদের জন্য সিজদা করে থাকে। আর সিজদা শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই এ ভেবেই তারা সিজাদা দিয়ে থাকে।

হামিদ নামে উপস্থিত একজন বলল ঃ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যে, তুমি অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি ও ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টিকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছো। তথাপিও এ ব্যাপারে আমাদের আরো প্রশ্ন আছে যে, তোমরা শিয়ারা হুসাইনের (আঃ) মাজারের মাটি দিয়ে তৈরীকৃত মোহ্রের উপর সিজদা দেয়ার ব্যাপারে এত পিড়াপীড়ি কর কেন? আর অন্যান্য যে সবের

উপর সিজদা দেয়া যায় তার ব্যাপারে এত পিড়াপীড়ি করো না কেন?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ আমরা যে মাটির উপর সিজদা করে থাকি এটা হাদীসের ভিত্তিতে। যে হাদীসটি ইসলামের সকল ফিরকার কাছে গ্রহণীয়। নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مسجداً و طهوراً

- যমিন আমার জন্য সিজদার স্থান ও পবিত্র জিনিষ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য পবিত্র মাটিতে সিজদা দেয়া হচ্ছে জায়েয। আর এই কারণেই আমরা মাটির উপর সিজদা দিয়ে থাকি।

হামিদ ঃ কিভাবে মুসলমানগণ এই হাদীসের প্রতি ঐক্যবদ্ধ?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ যখন রাসূলে খোদা (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখন তিনি সর্ব প্রথম মসজিদ নির্মানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখনকি ঐ মসজিদে কার্পেট বিছানো ছিল?

হামিদ ঃ না, সেখানে কার্পেট বিছানো ছিল না।

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ সুতরাং নবী (সাঃ) ও মুসলমানগণ কিসের উপর সিজদা দিতেন?

হামিদ ঃ ঐ যমিনের উপর সিজদা করতো, যে যমিন কার্পেটের ন্যায় ছিল।

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ রাসূলে খোদার (সাঃ) ইন্তেকালের পরে আবু বকর ও ওমরের যুগে মুসলমানগণ কিসের উপর সিজদা দিত? তখন কি মসজিদে কার্পেট বিছানো থাকতো?

হামিদ ঃ না, কার্পেট বিছানো থাকতো না। তারাও পূর্বের ন্যায় মসজিদের মাটিতে সিজদা করতো।

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ সুতরাং তোমার কথা মত নবী (সাঃ) নিজেও সব সময় নামাযে যমিনের উপর সিজদা দিতেন। আর তদ্রূপ সেই সময়কার মুসলমানগণও এবং পরবর্তী সময়েও। আর এই দৃষ্টিকোণে অবশ্যই মাটির উপর সিজদা দেয়া হচ্ছে সঠিক।

হামিদ ঃ আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে, শিয়ারা শুধুমাত্র মাটির উপর সিজদা করে থাকে। আর ঐ মাটি হচ্ছে এরূপ যে, যমিন থেকে নিয়ে মোহ্রাকারে করে তা পকেটে রাখে এবং নিজের সাথে বহন করে থাকে। আর সিজদা দেয়ার সময় তা যমিনের উপর রেখে তার উপর সিজদা দেয়।

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ প্রথমতঃ শিয়াদের দৃষ্টিতে যমিনের উপর সিজদা দেয়া তা সে পাথরের হোক অথাব মাটির, জায়েয।

দ্বিতীয়তঃ শর্ত হচ্ছে সিজদার স্থান অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। সুতরাং অপবিত্র যমিনে অথবা মাটির উপর সিজদা দেয়া জায়েয নয়। আর এ কারণেই মাটিকে কাঁদা বানিয়ে তা থেকে মোহ্র তৈরী করে (যা পবিত্র মাটি দিয়ে তৈরী) রোদে শুকিয়ে তারা নিজের সাথে বহন করে থাকে। যাতে করে নামাযের সময় পবিত্র মাটির উপর সিজদা দিতে পারে। যদিও তারা কোন যমিন বা মাটি অপবিত্র কি না জানা না থাকলে তার উপর সিজদা দেয়া জায়েয বলে জানে।

হামিদ ঃ যদি শিয়ারা মনে করে থাকে যে, সিজদা পবিত্র মাটির উপর হতে হবে তবে কেন তারা নিজেদের সাথে কিছু পরিমান মাটি বহন করে না, বরং মোহ্‌র বহন করে থাকে?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ মাটি বহন করার ক্ষেত্রে তা পোশাকে লেগে যেতে পারে। আর তা যেখানেই রাখা হবে অন্য কিছুর সাথে লেগে যাওয়ার সম্ভাবণা রয়েছে। তাই শিয়ারা এই মাটিকেই পানির সাথে মিশ্রণ করে কাঁদা বানিয়ে মোহ্‌রাকৃতি করে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নেয়। যাতে বহনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়।

হামিদ ঃ কেন তোমরা মাটি ব্যতীত অন্য কিছুর উপর যেমন মাদুর, গালিচা ও শতরঞ্জি .... উপর সিজদা দাও না?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ আগেই বলেছি যে, সিজদার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি সর্ব শেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন। আর এই যে মাটির উপর সিজদা দেয়ার কথা বলছি তা কখনো মোহ্‌রের উপর হোক আর কখনো নরম কিছুর উপরেই হোক না কেন তা আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিমান নির্ণয় করে থাকে। কেননা আমরা আমাদের শরীরের সর্বোচ্চ অঙ্গকে (কপাল) সব থেকে তুচ্ছ জিনিষের (মাটি) উপর রেখে সিজদা করি। যাতে সর্ব শেষ পর্যায়ের ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারি। আর সিজদার সময় কপাল ও নাক মাটিযুক্ত হওয়াটা হচ্ছে মুসতাহাব। সুতরাং মাটি দিয়ে তৈরী একটি ছোট্ট মোহ্‌রের উপর সিজদা দেয়া অন্যান্য সকল কিছুর (যা উপর সিজদা দেয়া জায়েয) উপর সিজদা দেয়া থেকে উত্তম। কেননা যদি মানুষের সিজদা দেয়ার স্থানটি রৌপ্য ও স্বর্ণে অথবা এরূপ অতি মুল্যের কিছুর উপর হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিমান কমবে বৈ বাড়বে না। আর তা আল্লাহ্‌ সম্মুখে ক্ষুদ্র বান্দা হিসেবে সিজদা দেয়ার ক্ষেত্রে কোন অর্থই বয়ে আনবে না।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি মোহ্‌রের উপর সিজদা করে আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকে তবে সে মুশরিক বা কাফের হয়ে যাবে? আর যে ব্যক্তি উচ্চ মুল্যের গালিচা বা কার্পেটের উপর সিজদা দিয়ে থাকে সে আল্লাহ্‌র অতি নিকটে পৌছে যাবে?! যে কেউ এরূপ ধারনা করে থাকে তার ধারনা সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং যুক্তিহীন।

হামিদ ঃ শিয়ারা যে মোহ্‌রের উপর সিজদা করে থাকে তাতে যে শব্দগুলো লেখা থাকে তা কি?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ প্রথমতঃ সব মোহ্‌রেই লেখা নেই। বরং অধিকাংশই মোহ্‌র লেখা বিহীন।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন মোহ্‌রে লেখা আছে যে, 'সুবহানা রাব্বি আল আ'লা ওয়া বিহামদিহ্' আর এটা তো সিজদার জিকির। আর কোন কোন মোহ্‌রে লেখা আছে যে, 'এটা মোহ্‌র কারবালার মাটি দিয়ে তৈরী'। তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি যে, বল এই

লেখাগুলো কি শির্‌ক? আর এই লেখাগুলো কি ঐ মোহ্‌রকে (যা মাটি দিয়ে তৈরী এবং যার উপর সিজদাহ্‌ দেয়া সঠিক) মাটি থেকে পরিবর্তন করে অন্য কিছুতে রূপান্তরীত করে দেয়?

হামিদ ঃ না, তাতে কোন শির্‌ক নেই বা তা সিজদা দেয়ার অনুপোযুক্ত করে না। কিন্তু আমার আরো একটি প্রশ্ন আছে তা হচ্ছে কারবালার মাটির কি বিশেষত্ব রয়েছে যে, শিয়ারা চেষ্টা করে তার উপর

সিজদা দিতে?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ এর গোপন ভেদ হচ্ছে যে, নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের ইমামগণের কাছ থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম হুসাইনের মাজারের মাটি দিয়ে তৈরী মোহ্‌রের উপর সিজদা দেয়া অন্য সব মাটির থেকে উত্তম।

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ

السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع

- ইমাম হুসাইনের মাটি দিয়ে তৈরী মোহ্‌রের উপর সিজদা সাত প্রকার পর্দাকে ছিড়ে ফেলে[১]।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, "আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে অধিক ক্ষুদ্র ও ছোট করার নিমিত্তে ইমাম সাদিক (আঃ) সব সময় ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাটির উপর সিজদা দিতেন[২]।

সুতরাং ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাটিতে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য মাটিতে নেই।

হামিদ ঃ ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাটির উপর সিজদা দেয়াতে কি নামায কবুল হয়ে যাবে যদিও ঐ নামায বাতিল নামায হয়ে থাকে?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ শিয়া মাযহাব বলে থাকে ঃ যে নামায তার সঠিক হওয়ার একটি শর্তকে পরিহার করলো তা হচ্ছে বাতিল নামায এবং তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না। যদি নামাযের সকল শর্ত পালন এবং সিজদা ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাটির উপর দেয়া হয়ে থাকে তবে তা কবুল ও অনেক ছওয়াবের অধিকারী হবে।

হামিদ ঃ কারবালার যমিন কি সমস্ত যমিন, এমনকি মক্কা ও মদীনার যমিনের থেকেও উত্তম, যাতে করে বলা হয়েছে তার উপর নামায পড়া হচ্ছে সব যমিনের উপর নামায পড়া থেকে উত্তম?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ কি অসুবিধা আছে, আল্লাহ্‌ যদি এমন বৈশিষ্ট্য কারাবালার মাটিতে দিয়ে থাকেন।

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৮৫, পৃঃ-১৫৩।

[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৮৫, পৃঃ-১৫৮ ও ইরশাদুল কুলুব, পৃঃ-১৪১।

হামিদ ঃ মক্কার যমিন তো সেই হযরত আদমের (আঃ) সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কা'বার যমিন বলে পরিচিত। আর মদীনার যমিনে নবীর (সাঃ) পবিত্র দেহ মুবারক দাফন হয়ে আছে তথাপিও কারবালার যমিন উত্তম? এটা তো আশ্চর্যের বিষয়। হুসাইন (আঃ) কি তাঁর নানা নবীর (সাঃ) থেকেও উত্তম?

মুহাম্মদ মারয়ী' ঃ না, তা কখনোই নয়। বরং ইমাম হুসাইনের (আঃ) সম্মান ও মর্যাদা তো নবীর (সাঃ) সম্মান ও মর্যাদার কারণেই। কিন্তু কারবালার মাটিকে বিশেষত্ব দেয়ার গোপন তত্ব হচ্ছে এটাই যে, ইমাম হুসাইন (আঃ) ঐ মাটিতে তাঁর নানার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে শহীদ হয়েছেন যা রিসালতেরই অংশ। কেননা তিনি তো নিজে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ও দ্বীনের স্তম্ভকে দৃঢ় করার জন্যে এবং তাকে অশুভ থাবার হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন বিলিন করেছেন। আর সে কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা ইমাম হুসাইনকে (আঃ) তিনটি বিশেষত্ব দিয়েছেন ঃ

১- তাঁর মাজারের গুম্বুজের নিচে বসে দোয়া করলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণীয় হবে।

২- ইমামগণ তাঁর বংশ থেকেই হবেন।

৩- আর তাঁর মাজারের মাটিতে রয়েছে মুক্তি।

ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাটিতে এমন বিশেষত্ব দান করায় কি কোন অসুবিধা আছে? আর তোমরা চাও যে, আমরা বলি কারবালার যমিন মদীনার যমিনের থেকে উত্তম যাতে করে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বলবে যে, আমরা বলেছি ইমাম হুসাইন (আঃ) নবীর (সাঃ) থেকেও উত্তম। তাই নয় কি? বরং ঘটনাটি হচ্ছে সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সুতরাং ইমাম হুসাইনের (আঃ) মাটির সম্মান দেয়াটা হচ্ছে তাকে সম্মান দেয়া আর তাকে সম্মান দেয়াটা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর নানা নবীকে (সাঃ) সম্মান দেয়া।

যখন তাদের কথা-বার্তা এ পর্যায়ে পৌছালো, তখন তারা সবাই সন্তুষ্ট হয়েগিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন উঠে আমার আলোচনার প্রশংসা করলো এবং আমার কাছে শিয়াদের গ্রন্থাদি চাইলো। সে আরো বলল ঃ তোমার উপযুক্ত আলোচনা আমাকে সন্তুষ্ট করেছে। আমি তো ভেবেছিলাম যে, শিয়ারা ইমাম হুসাইনকে (আঃ) রাসূলে খোদার (সাঃ) থেকে উত্তম বলে মনে করে। এখন আমি সত্যকে উপলব্দি করতে পারলাম। তোমার আলোচনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এখন থেকে আমিও কারবালার মোহ্‌রের উপর নামায আদায় করবো। আর যেখানেই যাবো তা আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো[১]।

---

[১]। ইকতিবাস মুহাম্মদ মারয়ী'র গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছে, পৃঃ-৩৪১ থেকে ৩৪৮।

৫৬- যদি নবী মুহাম্মদের (সাঃ) পর আর কোন নবী আসতেন তবে তিনি কে হতেন?

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ আল উ'যমা সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ্ সিরাযী (রহঃ) (একজন বিশিষ্ট মার্জায়ে তাকলীদ) বলেছেন ঃ আমি মক্কায় বাবুস সালামের নিকটবর্তী এক বই বিক্রয়ের দোকানে গিয়েছিলাম কোরআন কিনতে। সেখানে এক বিশিষ্ট সুন্নী আলেম আমাকে শিয়া আলেম হিসেবে চিনে ফেললো। সে আমাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো। যার প্রথমটি ছিল এরূপঃ

আপনারা এই হাদীসের ব্যাপারে কি বলে থাকেন, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ لو كان نبي غيري لكان عمر -যদি আমার পরে আর কোন নবী আসতো তবে সে হতো ওমর ইবনে খাত্তাব।

বললাম ঃ নবী (সাঃ) কখনোই এরূপ হাদীস বলেন নি। আর এই হাদীসটি হচ্ছে জাল হাদীস এবং দারুণ মিথ্যা কথা।

সে বলল ঃ এ ব্যাপারে আপনার দলিল-প্রমাণ কী?

বললাম ঃ 'হাদীসে মানযিলাত'-এর ব্যাপারে আপনার মতামত কী? এই হাদীসটি কি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে মুতাওয়াতির নয়? যা নবী (সাঃ) আলীর (আঃ) উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

يا علي انت مني بمنـــزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي

- হে আলী! আমার সাথে তোমার সম্পর্ক হচ্ছে ঐরূপ যেরূপ সম্পর্ক ছিল হারুণ ও মুসার (আঃ) ভিতরে। শুধুমাত্র পার্থক্য হল আমার পরে আর কোন নবী আসবে না[1]।

সে বলল ঃ আমাদের দৃষ্টিতে এই হাদীসটি হচ্ছে মুতাওয়াতির (সঠিক)।

বললাম ঃ এই হাদীস থেকে এটা প্রতীয়মাণ হয় যে, যদি নবীর (সাঃ) পরে আর কোন নবী আসতেন তবে তিনি অবশ্যই আলী (আঃ) হতেন। আর এই হাদীসের কারণেই আমার কাছে যে হাদীসটি আগে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য।

ঐ ব্যক্তি আমার উত্তর শুনে চুপ হয়ে গেল[2]।

---

[1]। সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড-৩, পৃঃ-২৩৬, সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-২, পৃঃ-১৮৫, মুসনাদ আহ্মাদ ইবনে হাম্বাল, খণ্ড-১, পৃঃ-৯৮, ১১৮ ও ....।

[2]। আল ইহ্তিজাজাতুল আশারাহ্ , পৃঃ-১৬।

৫৭- (মুতয়া') অস্থায়ী বিয়ে যে জায়েয সে বিষয়ে মুনাযিরা

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ আল উ'যমা সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ্ সিরাযী (রহঃ) বলেছেন ঃ সে তার দ্বিতীয় প্রশ্নটি এরূপে বর্ণনা করলো ঃ আপনারা শিয়ারা অস্থায়ী বিয়েকে জায়েয মনে করেন কী?

বললাম ঃ হ্যাঁ।

সে বলল ঃ কোন দলিলের ভিত্তিতে?

বললাম ঃ জনাব ওমর ইবনে খাত্তাবের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ঃ

متعتان محللتان في زمن رسول الله و انا احرمهما

- দুইটি মুতয়া'কে (হজ্জে তামাত্তু ও অস্থায়ী বিয়ে) যা রাসূলে খোদার (সাঃ) যমানায় হালাল ছিল, কিন্তু আমি তা হারাম করলাম।

অন্যান্য জায়গায় উক্ত বাক্যটি এরূপে উল্লেখ হয়েছে ঃ

متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما؛ متعة الحج و متعة النساء

- দুইটি মুতয়া' রাসূলে খোদার (সাঃ) যমানায় বৈধ ছিল, কিন্তু আমি ঐ দুটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলাম এবং যারা এই দুটি আঞ্জাম দিবে তারা শাস্তি পাবে। ঐ দুটি হচ্ছে হাজ্জে তামাত্তু ও অস্থায়ী বিয়ে[১]।

এই বক্তব্যটিই হচ্ছে উপযুক্ত দলিল যে, মুতয়া' রাসূলে খোদার (সাঃ) সময় হালাল ছিল, কিন্তু ওমর তা হারাম করেছে। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, কার অনুমতিতে ওমর তা হারাম করেছে? সে কি রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে নবী হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাকে নির্দেশ দিয়েছিল তা হারাম করতে? অথবা তার উপর ওহী নাযিল হয়েছিল কি? কোন দলিলের ভিত্তিতে সে মুতয়া'কে হারাম করেছে, যখন কিনা বলা হয়েছে ঃ

حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة

- মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছুকে হালাল করেছেন তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত হালাল

---

[১]। তফসিরে ফাখরে রাযী, সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

থাকবে আর তিনি যা হারাম করেছে তাও কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে।

এই ধরনের পরিবর্তন এক ধরনের বিদয়া'ত নয় কি? কেননা রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ "সকল বিদয়া'তেই গোমরাহী রয়েছে, আর সব গোমরাহীই হচ্ছে দোযখের আগুনে প্রবেশের কারণ। সুতরাং কোন দলিলের ভিত্তিতে মুসলমানগণ ওমরের বিদয়া'তকে অনুসরণ করে এবং নবীর (সাঃ) সুন্নত থেকে দূরে থাকে[১]?

সে আমার বক্তব্যের পর চুপ হয়ে গেল।

লেখকের কথা ঃ ফীকাহ্ শাস্ত্রে এই বিষয়ের ব্যাপারে অনেক আলোচনাই রয়েছে। আর সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতটি হচ্ছে মুতয়া'র বৈধতার ব্যাপারে উপযুক্ত দলিল।

এখানে শুধুমাত্র এই রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই আলোচনার সমাপ্তি করবো, যা ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

ان المتعة رحمة، رحم الله بها عباده، و لو لانهى عمر ما زنى الا شقي

- মুতয়া' (অস্থায়ী বিয়ে) হচ্ছে আল্লাহ্র রহমত স্বরূপ, কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের উপর দয়া করেছেন। আর যদি ওমর তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী না করতো তাহলে কোন খারাপ লোক ব্যতীত অন্য কেউ যেনা করতো না[২]।

---

[১]। আল ইহ্তিজাজাতুল আশারাহ্, পৃঃ-৭।

[২]। তফসিরে ছায়া'লাবি ও তফসিরে তাবারী, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

৫৮- একজন শিয়া আলেম ও এক খৃষ্টান কর্মমর্তার মধ্যে মুনাযিরা

পবিত্র কোরআনের সূরা আবাসার এক ও দুই নং আয়াতে পড়ে থাকবো যে ঃ

عبس و تولى – ان جائه الاعمى

- চেহারায় বিকট ভঙ্গি করে এবং মুখ ঘুরিয়ে নেয়- এ কারণে যে, অন্ধ ব্যক্তিটি তার কাছে এসেছিল।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের গ্রন্থে এই আয়াতের শানে নুযুলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ঃ নবী (সাঃ) একদল কুরাইশদের সাথে আলোচনা করছিলেন যাতে করে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া যায়। এমন সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাকতুম নামে এক গরীব অন্ধ মু'মিন ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বারংবার তাকে অনুরোধ করছিল যে ঃ হে রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! আমাকে কোরআনের আয়াত শিক্ষা দিন।

নবী (সাঃ) তার প্রতি রাগান্বিত হল এবং চেহারায় বিকট ভঙ্গি করলো। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা সুরা আবাসার শুরুতেই তাকে এরূপে ধিক্কার দিলেন[১]।

কিন্তু শিয়াদের রেওয়ায়েত মতে এই আয়াতটি উসমানের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধিক্কার দেয়া হয়েছে। কেননা সে অন্ধ গরীব ব্যক্তিটিকে অবহেলা করেছিল[২]। এখানে আমরা এক শিয়া আলেম ও এক খৃষ্টান আলেমের মধ্যে সংঘটিত মুনাযিরাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

খৃষ্টান আলেম ঃ আমাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) থেকে উত্তম। কেননা তোমাদের নবী একটুখানি বদ স্বভাবের ছিল। অন্ধ লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতো এবং তাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। কিন্তু আমাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) এমন উত্তম স্বাভাবের ছিলেন যে, যখনই কোন অন্ধকে দেখতে পেতেন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তো দূরে থাক বরং তাকে শাফা দান করতেন।

শিয়া আলেম ঃ আমরা শিয়ারা বিশ্বাস করি যে, এই সূরাটি উসমানের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কেননা নবী (সাঃ) মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দেখানোর লক্ষ্যে এমনকি কাফেরদের সাথেও তিনি কখনো রূঢ় ভাষায় কথা বলেন নি, আর মু'মিনদের ব্যাপারে তো কথাই নেই।

---

[১]। আসবাবুন নুযুল সূয়ূতী, সুরা আবাসার ব্যাখ্যায়।

[২]। তফসিরে বুরহান ও তফসিরে নূরুস সাকালাইন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

আর এই কোরআনেই আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর (সাঃ) শানে বলেছেন উল্লেখ করেছেন ঃ انك لعلى خلق عظيم - হে নবী! তুমি উত্তম স্বভাব-চরিত্রে বলিষ্ট [১]।

অন্য আরেক স্থানে বলেছেন ঃ و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين -আমরা তোমাকে মানুষের মাঝে তাদের জন্য রহমত ও মেহেরবানীর উৎস ব্যতীত অন্য কিছু করে পাঠাই নি [২]।

খৃষ্টান আলেম ঃ আমি এই বিষয়টি নিজে থেকে বলছি না বরং বাগদাদের এক সমজিদের খুতবায় এরূপ শুনেছি।

শিয়া আলেম ঃ আমাদের শিয়াদের কাছে বিষয়টি এরূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত যে, আয়াতটি উসমানের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। বনি উমাইয়্যাদের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া কয়েকজন রাবি যাতে করে উসমানের সম্মান টিকে থাকে তাই বিষয়টিকে নবীর (সাঃ) উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সুরা আবাসায় বলা হয়নি যে ঐ অন্ধ লোকটি কে ছিল। আর সুরা কালামের ৪ নং এবং আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতের উপস্থিতিতে এটা পরিস্কার যে, নবীর (সাঃ) ব্যাপারে তা নাযিল হয় নি।

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ সুরা আবাসা বনি উমাইয়্যার এক লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আর সে ব্যক্তি নবীর (সাঃ) সম্মুখে উপস্থিত ছিল এবং যখন ঐ অন্ধ ব্যক্তিকে দেখলো তখন সে তার চেহারায় বিকট ভঙ্গি করেছিল এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল [৩]।

এ কথা শোনার পর খৃষ্টান আলেম চুপ হয়ে গেল এবং আর কোন কথা বলল না।

---

[১]। কালাম ঃ ৪।

[২]। আম্বিয়া ঃ ১০৭।

[৩]। এই হাদীসটি মাজমাউল বায়ানের ১০ নং খণ্ডের ৪৩৭ পৃষ্ঠায়, উল্লেখ আছে। অনেকেই এই সূরাটি নবীর (সাঃ) জন্য নাজিল হয়েছিল মনে করে থাকেন। আর সে কারণেই সৃষ্ট সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এরূপ বলে থাকেন ঃ 'ইবনে উম্মে মাখতুম, মজলিসের আদপ-কায়দা রক্ষা না করার কারণে এটাই উপযুক্ত ছিল যে, ততক্ষণাৎ তার উপর আপত্তি করা। আর তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত আয়াতে বলছেন যে, যদিও এ ধরনের আদপ সেখানো নবীর (সাঃ) দায়িত্ব কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষ যেন বলতে না পারে যে, নবী (সাঃ) গরীব ও দুস্থ মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং ধনী লোকদের দিকে ফিরেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা আবাসাতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এমন কোন সঠিক কাজেরও আঞ্জাম দিও না যা শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করে দেয়। আর যদি তা করে থাকো তবে 'তারকে আওলা' করলে।

৫৯- কাজী আব্দুল জাব্বারের সাথে শেইখ মুফিদের মুনাযিরা

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নু'মান নামে শিয়া মাযহাবের এক বিশিষ্ট আলেম ছিল। তিনি শেইখ মুফিদ নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। তিনি ৩৩৬/৩৩৮ হিজরীর ১১ই যিলহাজ্জ তারিখে সুবাকাহ্ নামে বাগদাদের এক গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি পিতার সাথে বাগদাদে আসেন এবং লেখা-পড়া চালিয়ে যান। পববর্তীতে তিনি শিয়া মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম হিসেবে পরিচিতি পান। আল্লামা হিল্লি তার ব্যাপারে বলেন ঃ তিনি হচ্ছেন শিয়া মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম। যারা তার পরে এসেছেন তারা তার জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়েছেন[১]।

ইবনে কাছির শামি তার 'আলবিদায়াতু ওয়ান নিহায়াহ্ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ শেইখ মুফিদ হচ্ছে শিয়া মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম ও উচ্চমানের লেখক। তার ক্লাসে বিভিন্ন মাযহাবের আলেমগণ অংশ গ্রহণ করতো[২]।

শেইখ মুফিদ (রহঃ) বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় দুইশত বই লিখেছেন। নাজ্জাসি (রিজাল শাস্ত্র পন্ডিত) তার নিজের লেখা বইতে শেইখ মুফিদের ১৭০ টি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন[৩]।

শেইখ মুফিদ (রহঃ) রোজ শুক্রবার দিবাগত রাতে ৪১৩ হিজরীর ৩রা রামাযান বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তার কবরটি ইরাকের কাযেমাঈনে ইমাম জাওয়াদের (আঃ) কবরের পাশে সমাধিস্থ রয়েছে।

শেইখ মুফিদ (রহঃ) মুনাযিরার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শি ছিলেন। বিভিন্ন বইতে তার অর্থবহ অনেক মুনাযিরা উল্লেখিত হয়েছে[৪]। আমরাও এখানে তার একটি মুনাযিরা (যে মুনাযিরাতে তিনি শেইখ মুফিদ লাকাব পেয়েছিলেন) তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

তার সময়কালে বাগদাদে একজন সুন্নী আলেমের ক্লাস হত। ঐ শিক্ষকের নাম

১। রিজালে নাজ্জাসি, পৃঃ-৩১১।

২। আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াহ্, খণ্ড-১২, পৃঃ- ১৫।

৩। আওয়ায়েলুল মাকালাতের ভুমিকা, তাবরীয, ১৩৭১ হিজরী।

৪। শেইখ মুফিদের দৃষ্টিতে মুনাযিরার গুরুত্ব ও প্রাধান্যতা এত অধিক ছিল যে, তিনি বলেছেন ঃ বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়া ফকীহ্গণ জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে মুনাযিরাহ্তেও বিশেষ পারদর্শি ছিলেন। আর বর্তমানে যারা উক্ত বিশ্বাসের উপর জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত রয়েছেন তারাও তাদের পূর্ব পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছেন। আর তারা এই পদ্ধতিকে বিপক্ষদেরকে পরাভূত করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে মনে করেন। (আল ফুসুলুল মুখতার, খণ্ড-২, পৃঃ-১১৯)।

ছিল কাজী আব্দুল জাব্বার। একদিন কাজী আব্দুল জাব্বার ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তার শিয়া সুন্নী অনেক ছাত্রই উপস্থিত ছিল। এমতাবস্থায় শেইখ মুফিদও ঐ ক্লাসে অংশ গ্রহণ করলেন। শিক্ষক এর আগে শেইখ মুফিদকে কোন দিন দেখেনি বা চিনেন না, কিন্তু তার কথা অনেকের মুখে শুনেছিলেন।

কিছু সময় পর শেইখ মুফিদ কাজীর দিকে ফিরে বলল ঃ আপনি আমাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিবেন কি? উপস্থিত বিজ্ঞদের সামনে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

কাজী ঃ হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা কর।

শেইখ ঃ এই হাদীসটি যা শিয়ারা বলে থাকে যে, গাদীর দিবসে মুরুভুমির মধ্যে নবী (সাঃ) আলী (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

من كنت مولاه فعلي مولاه

- অমি যার মাওলা বা অভিভাবক আমার পরে এই আলীও তার মাওলা বা অভিভাবক।

এটা কি সত্য নাকি শিয়ারা তা মিথ্যা বানিয়ে বলে থাকে?

কাজী ঃ এই রেওয়ায়েতটি সত্য।

শেইখ ঃ এই রেওয়ায়েতে "মাওলা" শব্দটির অর্থ কি?

কাজী ঃ অর্থ হচ্ছে বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সকল ক্ষেত্রে বা সব কিছুতে অগ্রাধিকার পাবে।

শেইখ ঃ যদি তাই হয়ে থাকে তবে নবীর (সাঃ) উক্তি মোতাবেক আলী (আঃ) হচ্ছে বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সকল ক্ষেত্রে বা সব কিছুতে অগ্রাধিকার পাবে। তাহলে শিয়া ও সুন্নীর মাঝে এত বিভেদ বা শত্রুতা কিসের?

কাজী ঃ হে ভাই! এই হাদীসটি হচ্ছে (গাদীর) রেওয়ায়েত। কিন্তু আবু বকরের খেলাফত হচ্ছে দিরায়াতের (চিন্তা-ভাবনার) মাধ্যমে হয়েছে। আর বিবেকবান মানুষ রেওয়ায়েতের কারণে দিরায়াতকে দুরে সরিয়ে দেয় না!!

শেইখ ঃ আলীর (আঃ) উদ্দেশ্যে নবীর (সাঃ) এই হাদীসের ব্যাপারে আপনার মন্ত ব্য কি?

يا علي حربك حربي و سلمك سلمي

- হে আলী! তোমার যুদ্ধ হচ্ছে আমার যুদ্ধ আর তোমার সন্ধি হচ্ছে আমার সন্ধি।

কাজী ঃ এই হাদীসটিও সত্য।

শেইখ ঃ সুতরাং যারা সেদিন আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে জাঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) ঘটিয়েছিল (তালহা, যুবাইর ও আ'য়েশা ....), এই হাদীসের ভিত্তিতে এবং আপনার স্বীকারোক্তি মোতাবেক অবশ্যই তারা সেদিন নবীর (সাঃ) সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং কাফির হয়েগিয়েছিল।

কাজী ঃ হে ভাই! তারা (তালহা, যুবাইর, আ'য়েশা ও...........) পরবর্তীতে তওবা করেছিল।

শেইখ ঃ জাঙ্গে জামাল হচ্ছে দিরায়াত সম্পন্ন কিন্তু যাদের দ্বারা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তারা পরবর্তীতে তওবা করেছিল এটা তো হচ্ছে রেওয়ায়েত বা শোনা কথা। তোমার কথা মত দিরায়াতের জন্য রেওয়ায়েতকে দুরে সরিয়ে দিতে হবে এবং বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি রেওয়ায়েতের জন্য দিরায়াতকে দুরে সরিয়ে দেয় না।

আমার এই কথায় কাজী যেন একেবারে বোবা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বলল ঃ তুমি কে?

শেইখ ঃ আমি তোমার খাদেম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নু'মান।

কাজী সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে শেইখের হাত ধরে তার স্থানে বসালো এবং বললঃ انت المفيد حقاً - তুমি সত্যই মুফিদ (ফয়দা দানকারী)।

উপস্থিত আলেমগণ কাজীর আচরণে দারুণভাবে রাগান্বিত হল। কাজী তাদেরকে বলল ঃ আমি এই শেইখ মুফিদের প্রশ্নের কাছে হেরে গেছি, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে উঠে দাড়াও। এ কথা শোনার পরে কেউ উঠে দাড়ালো না। আর এভাবেই শেইখ মুফিদ জয় লাভ করলেন এবং 'মুফিদ' লাকাবে ভূষিত হলেন। এরপর থেকে মানুষ তাকে মুফিদ নামেই সম্বোধন করতো[১]।

---

[১]। মাজালিসুল মু'মিনিন, খণ্ড-১, পৃঃ-২০০ ও ২০১।

৬০- হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে স্বপ্নে শেইখ মুফিদের মুনাযিরা

পবিত্র কোরআনে সূরা তওবার ৪০ নং আয়াতে আমরা পড়ে থাকিঃ

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه و ايّده بجنودٍ لم تروها...............

- যদি নবীকে (সাঃ) সাহায্য না কর, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে সাহায্য করবে (যেমনভাবে অত্যন্ত দূরূহ সময়ে তাকে একা ছেড়ে দেন নি) ঐ সময় যখন (হিজরতের সয়ম) কাফিররা তাকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল, তখন তারা দুইজন ছিল। আর তারা তখন হীরা গুহায় অবস্থান করছিল। আর তিনি তার সফর সঙ্গীকে বলছিলেনঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সহায় আছেন। ঐ সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের প্রশান্তিকে তাঁর (নবীর) উপর পাঠিয়েছিল। আর শত্রু পক্ষের থেকে তাকে আড়াল করে সাহায্য করেছিল।

সুন্নী মাযহাবের আলেমগণ এই আয়াতটিকে আবু বকরের ফযিলত মনে করে থাকেন। আর তারা আবু বকরকে হীরা গুহার সাহায্যকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং তার খেলাফতের দলিল হিসেবে এই আয়াতকে নির্দেশ করে থাকে। আর তাদের সাহিত্যিকগণও এই পদবীতে তার উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা করে থাকে যেমন ঃ

হে সাইয়্যেদ, সিদ্দিক ও রাহ্বারের হীরা গুহার সাথী
তুমি তো সমস্ত ফযিলত ও সুন্দর্যের ধন-ভান্ডার
সকলেই সাহায্যকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ
কিন্তু তুমি যত উচ্চে তেমনভাবে নয়[১]।

এখন উপরোল্লিখিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত শেইখ মুফিদের উক্ত মুনাযিরাহ্টি তুলে ধরবো ঃ

আল্লামা তাবরাসী ইহ্তিজাজ গ্রন্থে এবং কারাজিকি কানযুলুল উম্মাল গ্রন্থে শেইখ আবু আলী হাসান ইবনে মুহাম্মদ রিক্কির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শেইখ মুফিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ এক রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেখানে দেখলাম যে, একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং যেতে যেতে হটাৎ একদল লোকের দিকে আমার নজর পড়ল। তারা সবাই এক ব্যক্তিকে ঘিরে বসেছিল। আর ঐ ব্যক্তি তাদের জন্যে গল্প

---

[১]। বুসতানে সা'দী।

বলছিল। জিজ্ঞাসা করলাম ঐ ব্যক্তি কে? কেউ বলল ঃ সে হচ্ছে ওমর ইবনে খাত্তাব।

আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম তার সাথে একজন কথা বলছে। কিন্তু আমি তাদের কথা বুঝতে পারছিলাম না। তাদের কথার মধ্যে আমি ওমরকে বললাম ঃ আমাকে বল যে, গারের আয়াতে আবু বকরের বিশিষ্টতা কিসে?

ওমর বলল ঃ ছয়টি বিষয় এই আয়াতে নিহিত আছে যা আবু বকরের ফযিলতকে বর্ণনা করে। তারপর সে ঐ ছয়টি বিষয়কে উল্লেখ করলো ঃ

১- আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা তওবার ৪০ নং আয়াতে নবীর (সাঃ) ব্যাপারে কথা বলেছেন। আর আবু বকরকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২- আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত আয়াতে ঐ দু'জনকে (নবী ও আবু বকর) পাশা পাশি একই স্থানে উল্লেখ করেছেন। আর এটা হচ্ছে তাদের দু'জনে মধ্যে বন্ধন স্বরূপ।

৩- আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত আয়াতে আবু বকরকে নবীর (সাঃ) সাহেব (সাথী) হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা আবু বকরের জন্য একটি উচ্চ স্থান।

৪- আল্লাহ্ তা'য়ালা আবু বকরের প্রতি নবীর (সাঃ) মেহেরবানী থাকার ব্যাপারে খবর দিয়েছেন। আয়াতে উল্লেখ আছে যে, নবী (সাঃ) আবু বকরকে বলেছেন ঃ দুশ্চিন্ত াগ্রস্ত হয়ো না।

৫- নবী (সাঃ) আবু বকরকে খবর দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্
তা'য়ালা আমাদের দু'জনের সমান পরিমানে সাহায্যকারী।

৬- আল্লাহ্ তা'য়ালা আবু বকরকে এই আয়াতে প্রশান্তি নাযিল হওয়ার খবর দিয়েছেন। কেননা নবী (সাঃ) সব সময় প্রশান্তিতে ছিলেন তাঁর জন্য প্রশান্তি পাঠানোর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

শেইখ ঃ আমি তাকে বললাম ঃ সত্যই আবু বকরের সাথে বন্ধুত্বের অধিকারটি আদায় করেছো। কিন্তু আমি আল্লাহ্র সাহায্যে ঐ ছয়টি বিষয়ের প্রত্যেকটির উত্তর দিবো। যেমনভাবে তুফানী হাওয়া সব কিছুকে এলোমেল করে দেয়।

১- দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে আবু বকরকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে তার কোন ফযিলত নেই। কেননা মু'মিন মু'মিনের সাথে এবং মু'মিন কাফিরের সাথে এক স্থানে মিলিত হয় তখন যদি কেউ তাদের মধ্যে একজনকে উল্লেখ করতে চায় তখন বলে থাকে ঐ দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

২- নবীর (সাঃ) পাশে আবু বকর থাকাটাও কোন ফযিলতের বিষয় নয়। কেননা আগেই বলেছি যে, একত্রি হওয়াটা কোন উত্তম হওয়াকে বুঝায় না। কারণ মু'মিন ও কাফির এক স্থানে একত্রিত হতে পারে। যেমনভাবে মসজিদে নব্বী (সাঃ) -যার মর্যাদা ছুর গুহার থেকেও অনেক বেশী- সেখানে মু'মিন ও মুনাফিক .... একত্রিত হয়ে পাশা পাশি আলোচনা করতো। পবিত্র কোরআন সূরা মিয়া'রাজের ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতে

বলেছে ঃ

فمال الذين كفروا قبلك مهطعين – عن اليمين و عن الشمال عزين

- এই কাফিররা কি হয় যে, বাম ও ডান দিক থেকে দলে দলে অতি দ্রুতার সাথে তোমার কাছে আসে।

আর নূহের (আঃ) নৌকায় নবীও ছিল আবার শয়তানও ছিল এবং পশু-পাখিও ছিল। সুতরাং এক স্থানে একত্রিত হওয়াটা কোন ফযিলত নয়।

৩- আর মাসাহেবের ব্যাপারটি এটিও কোন ফযিলতের বিষয় নয়। কেননা মাসাহেবের অর্থ হচ্ছে পথ সঙ্গী। আর কাফিরও কোন মু'মিনের পথ সঙ্গী হতে পারে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

قال له صاحبه و هو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ....

- ঈমানদার বন্ধু তার বে-ঈমান বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে বলল ঃ যে খোদা তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছে (তাঁর কথা না শুনে) কাফির হয়ে গেলে[১]।

৪- আর এই যে, নবী (সাঃ) আবু বকরকে বলেছেন ঃ দুশ্চিন্তগ্রস্ত হয়ো না। এটা আবু বকরের ভুলের কারণে না তার ফযিলতের ব্যাপারে। কেননা আবু বকরের কাজ ছিল হয় সে নবীর (সাঃ) কথা মেনে চলবে নয়তো গোনাহ্ করবে। যদি সে তাঁর কথা মেনে চলতো তাহলে তিনি তাকে নিষেধ করতেন না। সুতরাং সে গোনাহ্ করেছে তাই তিনি তাকে নিষেধ করেছেন।

৫- আর এই যে, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। এই কথার অর্থ এই নয় যে, দু'জনের সাথেই তিনি আছেন। বরং তা শুধু নবীর (সাঃ) জন্যেই। নবী (সাঃ) নিজের কথাকে বহুবচনে বলেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বহুবচনে কথা বলেছেন ঃ

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

- আমরা কোরআনকে পাঠিয়েছি এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষক[২]।

৬- আর এই যে, বলেছো আবু বকরের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়েছিল। তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। কেননা আয়াতের শেষের কথা অনুযায়ী প্রশান্তি তাঁর উপরে নাযিল হয়েছে আল্লাহ্র অদৃশ্য সৈন্য যার সাহায্যে এসেছিল আর তিনি হচ্ছেন নবী (সাঃ)। যদি চাও বলতে যে, ঐ দুটিই (প্রশান্তি ও আল্লাহ্র অদৃশ্য সৈন্য দল) আবু বকরের সাহায্যে এসেছিল তবে নবীকে (সাঃ) তাঁর নবুওয়াতী পদ থেকে সরিয়ে দিলে। সুতরাং প্রশান্তি নবীর (সাঃ) উপর পাঠানো হয়েছিল। কেননা ঐ গুহায় তিনিই একমাত্র

---

[১]। কাহ্ফ ঃ ৩৭।

[২]। হিজর ঃ ৯।

ব্যক্তি ছিলেন যিনি প্রশান্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু পবিত্র কোরআন অন্য ক্ষেত্রে মু'মিনও যে নবীর (সাঃ) প্রশান্তিতে শরিক ছিল সে ব্যাপারে সূরা ফাতহের ২৬ নং আয়াতে বলছেঃ

فانزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين

- আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের প্রশান্তিকে তাঁর রাসূলের ও মু'মিনগণের উপর পাঠিয়েছেন।

সুতরাং যদি এই গারের আয়াতটিকে তোমার বন্ধুর ফযিলতের ব্যাপারে দলিল হিসেবে পেশ না কর তবে তা হবে অতি উত্তম।

শেইখ মুফিদ বলেন ঃ সে (ওমর) আর অন্য কোন দলিল আনতে পারলো না এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। দেখলাম যারা একত্রি হয়েছিল তারা সবাই তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এ পর্যায়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল[১]।

---

[১]। ইহ্তিজাজ তাবরাসী, খণ্ড-২, পৃঃ- ৩২৬-৩২৯।

৬১- আয়াতে গারের (গুহা) ব্যাপারে এক সুন্নী আলেমের সাথে মা'মুনের মুনাযিরা

সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা মা'মুন তার প্রশাসনিক বিচারক ইয়াহিয়া ইবনে আকছামকে একটি নির্দিষ্ট দিন ও খনে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়া'তের বিশিষ্ট আলেমগণকে মুনাযিরা করার জন্য দাওয়াত করতে নির্দেশ দিল। সে নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো। সভার আয়োজন হল। মা'মুন সেখানে প্রধান অতিথির আসনে বসে ছিল। সে আলেমগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে বলল ঃ আমি তোমাদেরকে এখানে দাওয়াত করেছি এ জন্য যে, স্বাধীনভাবে ইমামত প্রসঙ্গে আলোচলা করবে এবং এ ব্যাপারে একটি ফলাফলে পৌছাবে।

উক্ত সভায় আলেমগণ রাসূলে খোদার (সাঃ) খলিফা হওয়ার জন্য জনাব আবু বকর ও জনাব ওমরের উপযুক্ততা বিশেষভাবে তুলে ধরলো। তারা এভাবেই বলে যাচ্ছিল আর মা'মুন তাদের দলিলসমূহকে একটির পর একটি খণ্ডন করছিল। এভাবে আলোচনা চলতে চলতে ইসহাক ইবনে হাম্মাদ ইবনে যাইদ উক্ত সভায় উপস্থিত হল। কিছু সময় আলোচনার পর সে মা'মুনকে বলল ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা তওবার ৪০ নং আয়াতে জনাব আবু বকরের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

.... ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه..........

- (নবী (সাঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছিলেন, তখন মক্কার নিকটে এক গুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন) ঐ সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিও সেখানে ছিল (আবু বকর ছিল) তারা উভয়েই ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন। নবী (সাঃ) তাঁর সঙ্গীকে (আবু বকরকে) বললেন ঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সাথে আছেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের প্রশান্তিকে তাঁর (নবীর) উপর পাঠালেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াতে জনাব আবু বকরকে নবীর (সাঃ) সফর সঙ্গী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

মা'মুন ঃ দারুণ আশ্চর্যের বিষয় তো! তোমরা কোরআনের অভিধান সম্পর্কে এত কম জ্ঞান রাখ। কাফের কখনো মু'মিন ব্যক্তির সফর সঙ্গী হতে পারে না? আর সেক্ষেত্রে সেই সফর সঙ্গীর কি মুল্য আছে? যেমনভাবে সূরা কাহ্‌ফের ৩৭ নং আয়াতে পবিত্র কোরআন বলছে ঃ

قال له صاحبه و هو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب

- ঈমানদার বন্ধু তার বে-ঈমান বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে বলল ঃ যে খোদা তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, (তাঁর কথা না শুনে) কাফির হয়ে গেলে।

এই আয়াতের দৃষ্টিতে মু'মিন ও কাফিরকে একে অপরের বন্ধু বা সঙ্গী বর্ণনা করা হয়েছে।

আরবের বিভিন্ন কবিতাতেও কখনো কখনো মানুষ ও পশু উভয়কে একে অপরের বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং এই বন্ধু বা সঙ্গী হওয়াটা কোন গর্বের বিষয় নয়।

ইসহাক ঃ নবী (সাঃ) এই আয়াতে জনাব আবু বকরকে শান্তনা দিয়ে বলেছেনঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না।

মা'মুন ঃ আমাকে বল দেখি, জনাব আবু বকরের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়াটা কি গোনাহ্ ছিল না আনুগত্য ছিল? যদি বল আনুগত্য তাহলে ধরে নিচ্ছ যে, নবী (সাঃ) আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন (তাঁর ব্যাপারে এরূপ কথা বলা অনুচিৎ), আর যদি বল যে, গোনাহ্ ছিল তবে একজন গোনাহ্কারীর কি কোন গর্ব হতে পারে?!

ইসহাক ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত আয়াতে নিজের প্রশান্তিকে জনাব আবু বকরের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। আর তার জন্য এটা একটা বড় ধরনের গর্বের বিষয়। উক্ত প্রশান্তি জনাব আবু বকরের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল, কেননা নবীর (সাঃ) জন্য তা পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল না।

মা'মুন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা তওবার ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الارض

بما رحبت ثم و ليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين.

- আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধেও সাহায্য করেছেন।

হে ইসহাক! তুমি কি জান যে, মু'মিনগণ সে দিন পালিয়ে যায় নি এবং নবীর (সাঃ) সাথে হুনাইনের যুদ্ধে থেকে গিয়েছিল তারা কারা ছিল?

ইসহাক ঃ না, জানি না।

মা'মুন ঃ হুনাইনের যুদ্ধে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান, এই যুদ্ধটি হিজরতের সপ্তম সালে সংঘটিত হয়েছিল) ইসলামের সৈন্যরা প্রায় পরাজিত হয়ে পড়ে এবং তারা সকলেই যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। শুধুমাত্র নবী (সাঃ) ও বনী হাশিম গোত্রের সাতজন ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিল। আলী (আঃ) তাঁর জুলফিক্কার দিয়ে লড়াই করছিলেন,

আব্বাস (নবীর চাচা) নবীর (সাঃ) সৈন্য বাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং আরো পাঁচজন[1] নবীকে (সাঃ) ঘিরে রেখেছিল, যাতে শত্রুরা তাঁর উপর কোন হামলা করতে না পারে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীকে (সাঃ) বিজয়ী করলেন। (এখানে আল্লাহ্ নিজের প্রশান্তিকে নবীর (সাঃ) ও মু'মিনদের উপর পাঠিয়েছিলেন, সুতরাং নবীরও (সাঃ) এলাহী প্রশান্তির প্রয়োজন হয়)।

হে ইসহাক! মু'মিনিন বলতে এই আয়াতে আলী (আঃ) ও বনী হাশিমের কয়েকজনকে বুঝানো হয়েছে। যারা সে দিন হুনাইন যুদ্ধের ময়দানে নবীর (সাঃ) সাথে থেকে গিয়েছিলেন। সুতরাং কারা হচ্ছে উত্তম? যারা সে দিন নবীর (সাঃ) সাথে হুনাইন যুদ্ধে ময়দানে ছিল এবং আল্লাহ্র প্রশান্তি নবী (সাঃ) ও তাদের উপর নাজিল হয়েছিল তারা, নাকি যে সে দিন নবীর (সাঃ) সাথে হেরা গুহায় ছিল?!

হে ইসহাক! উত্তম কে, যে নবীর (সাঃ) সাথে গুহায় ছিল নাকি যিনি নবীর (সাঃ) বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন এবং নিজের জীবনকে তাঁর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন? যখন নবী (সাঃ) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করবেন তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক তিনি আলীকে (আঃ) বললেন ঃ আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকো এবং আমার জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত কর।

আলী (আঃ) বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! যদি আমি আপনার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকি তবে কি আপনি নিরাপদে থাকবেন?

নবী (সাঃ) ঃ হ্যাঁ।

আলী (আঃ) ঃ سمعاً و طاعةً (ঠিক আছে, অনুগত্য করছি)।

তারপর আলী (আঃ) নবীর (সাঃ) বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁর চাদরটি নিজের গায়ের উপর টেনে নিলেন। মুশরিকরা রাতের অন্ধকারে ঐ বিছানার উপর দৃষ্টি রেখেছিল। ঐ বিছানায় যে নবী (সাঃ) ঘুমিয়ে আছেন তাতে তাদের কোন সন্দেহই ছিল না। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে অগ্রসর হয়ে নবীর (সাঃ) উপর আঘাত হানবে। আর যদি নবী (সাঃ) নিহত হয় তবে তা যেন একজনের উপর না বর্তায় এবং বনী হাশিম যেন তাদের উপর প্রতিশোধ না নিতে পারে।

আলী (আঃ) মুশরিকদের কথার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। মৃত্যু অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রকার ভয় পান নি। কিন্তু এদিকে জনাব আবু বকর গুহার মধ্যে ভয় পাচ্ছিলো, যদিও নবী (সাঃ) তার পাশেই ছিল। কিন্তু আলী (আঃ) যদিও তিনি একা ছিলেন তারপরও অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সাথে দৃঢ়তা ধারন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা

---

[1]। ঐ পাঁচজন ব্যক্তি হচ্ছে যথাক্রমে ঃ ১- আবু সুফিয়ান ইবনে হারিছ (নবীর চাচাতো ভাই), ২- নাওফিল ইবনে হারিছ, ৩- রাবিয়াতু ইবনে হারিছ, ৪- ফাযল ইবনে আব্বাস, ৫- আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর। (আ'লামুল ওয়ারী, পৃঃ- ১১৯, কামিল ইবনে আছির, খণ্ড-২, পৃঃ-২৩৯)।

ফেরেশ্‌তাগণকে তাঁর কাছে পাঠান, যাতে তারা যেন তাকে কুরাইশদের কুমতলব থেকে রক্ষা করে। আলী (আঃ) এরূপভাবে নিজের জীবনকে বাজি রেখে নবীর (সাঃ) জীবনকে রক্ষা করলেন, যা তাঁর সম্পূর্ণ জীবদ্দশাতে একটি গর্বের বিষয় হয়ে রইলো। আর এ কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হলেন এবং এই সম্মান

ও মর্যাদা নিয়েই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন[১]।

[১]। ইকতিবাস বিহারুল আনোয়ার থেকে, খণ্ড-৪৯, পৃঃ-১৯৪ থেকে ২০০।

৬২- ইবনে আবিল হাদীদের সাথে এক লেখকের কাল্পনিক মুনাযিরা

ইবনে আবিল হাদীদ হচ্ছে সুন্নী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম ও ইতিহাস বেত্তা। তার আসল নাম হচ্ছে আব্দুল হামিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আবিল হাদীদ। কিন্তু সে ইবনে আবিল হাদীদ নামেই বিশেষ পরিচিত। তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হচ্ছে "শারহে নাহ্জুল বালাগ্বাহ্" নাহ্জুল বালাগ্বাহ্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ধর্মী একটি গ্রন্থ। বর্তমানে তা ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সে বাগদাদে ৬৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করে।

সে তার শারহে নাহ্জুল বালাগ্বার ষষ্ঠ খণ্ডে নবীর (সাঃ) ইন্তেকাল পরবর্তী উত্তেজনাকর পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়ার পর লিখেছে যে, জনাব ওমর কিছু সংখ্যক লোকজন নিয়ে হযরত ফাতিমার (সালাঃ) বাড়ীর উপর হামলা করে। আর সে সময় হযরত ফাতিমা (সালাঃ) চিৎকার ধ্বনিতে বলে ওঠেন যে, "আমার বাড়ীর থেকে দুর হয়ে যাও"। তারপর সে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলে ঃ

فهجرته فاطمة و لم تكلّمه في ذلك حتى ماتت فدفنها علي ليلًا و لم يودن بها ابابكر

- হযরত ফাতিমা (সালাঃ) আবু বকরকে এড়িয়ে চলতেন এবং তার সাথে কথা বলতেন না, আর এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। আলী (আঃ) হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) রাতের অন্ধকারে দাফন করেন এবং এই ঘটনাটিকে আবু বকরকে জানান নি[১]।

তারপর সে জনাব আবু বকর ও জনাব ওমরের মান-সম্মান রক্ষার লক্ষ্যে তাদের এ কাজের একটি ছোট্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে ঃ

ثبت انه خطالم يكن كبيرة، بل كان من باب الصغائر التي لا فان هذا لو تقتضي التبري، و لا توجب زوال التولي

- যদিও এটা প্রমাণ হয় যে, হযরত ফাতিমার (সালাঃ) সাথে আবু বকর ও ওমরের ঐরূপ আচরণটি হচ্ছে গোনাহ্র শামিল তথাপিও তা তাদের কবিরাহ্ গোনাহ্ নয়, বরং তা হচ্ছে ছগিরাহ্ গোনাহ্। আর এর কারণে তাদের মধ্যে রাগারাগি বা বন্ধুত্বের অবষান হতে পারে না!!

---

[১]। শারহি নাহ্জুল বালাগ্বাহ্, ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড-৬, পৃঃ-৪৬,৪৭।

যদি ইবনে আবিল হাদীদ বলে, যে তাদের কাছে উক্ত ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণ হয় নি; তবে তাতে অতি আশ্চর্য হবো না। কিন্তু সে তো তার বক্তব্যে ঘটনাটি যে সত্য বা প্রমাণিত তাই উল্লেখ করেছে। তাহলে কিভাবে সে এ কথা বলতে পারে? সে কি কবিরা ও ছগিরা গোনাহ্‌র পাথক্য জানে না?

কেন ইবনে আবিল হাদীদ ও অন্যান্য সুন্নী আলেমগণ কি এটা উল্লেখ করেন নি? যে, নবী (সাঃ) হযরত ফাতিমার (সালাঃ) ব্যাপারে বলেছেনঃ

ان الله يغضب لغضب فاطمة و يرضي لرضاها

- ফাতিমা (সালাঃ) রাগান্বিত হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাগান্বিত হন, আর তাঁর খুশিতে তিনি খুশি হন।

এবং আরো বলেছেন ঃ

فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله

- ফাতিমা (সালাঃ) হচ্ছে আমার দেহের অংশ, যে তাকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়[১]।

সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তি নিশ্চয়ই হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) কষ্ট দিয়েছিল। আর তাকে রাগান্বিত করার কারণই হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল রাগান্বিত হওয়া। অতএব, এক্ষেত্রে হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) কষ্ট দেয়া কি ছগিরাহ্ গোনাহ্? আর যদি ছগিরাহ্ গোনাহ্ হয়ে থাকে তবে কবিরাহ্ গোনাহ্ কোনটি?

আল্লাহ্ তা'য়ালা কি পবিত্র কোরআনে বলেন নি ঃ

ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و اعد لهم عذابا مهيناً

- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া আখিরাতে তাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হয় এবং তাদের জন্য অপমান জনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন[২]।

যে ব্যক্তি ছগিরাহ্ গোনাহ্ করে থাকে সে কি কখনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের লানতের স্বীকার হয়?

এ ব্যাপারে তোমার আরো বিভিন্ন হাদীস পড়া উচিৎ।

---

[১]। সহীহ্ বুখারী, বৈরুত প্রিন্ট, খণ্ড-৭, পৃঃ-৪৭, এবং খণ্ড-৯, পৃঃ-১৮৫ এবং অন্যান্য তথ্য সূত্র ফাযায়েলুল খামসা গ্রন্থের ৩ নং খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে।

[২]। আহ্যাব ঃ ৫৭।

৬৩- নাছ্ছের (অকাট্য ভাষ্যের) বিপরীতে ইজতিহাদের ব্যাপারে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে এবং নবীর (সাঃ) হাদীস থেকে পরিস্কারভাবে যা বুঝা যায়, সে মোতাবেক পালণ করাই হচ্ছে শ্রেয়। আর যদি সেগুলোর বিপরীতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি এবং তা ইজতিহাদ নাম দিয়ে থাকি তবে এই ইজতিহাদ হবে নাছ্ছের বিপরীতে। আর এ ধরনের ইজতিহাদ অবশ্যই বাতিল বলে গন্য হবে। কেননা এ ধরনের ইজতিহাদ হচ্ছে বিদয়াত বৈ অন্য কিছুই নয়, যা আমাদেরকে গোমরাহ্ করবে।

কিন্তু সঠিক ইজতিহাদ হচ্ছে যখন কোন বিষয়ের ব্যাপারে কোন সঠিক আদেশ-নিষেধ বা সনদ না থাকে, তখন মুজতাহিদ ইজতিহাদের সূত্র মোতাবেক ঐ বিষয়ের আদেশ-নিষেধকে দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণ করে থাকে। আর এ ধরনের ইজতিহাদ একজন বিষিষ্ট মুজতাহিদের পক্ষ থেকে তার অনুসরণকারীদের ব্যাপারে হুজ্জাত বলে গন্য হবে। এই দৃষ্টিকোণে নিম্নের মুনাযিরাহ্‌টি লক্ষ্যণীয় ঃ

মালেক শাহ্ সালাজুকি একটি সভার আয়োজন করেছিল। উক্ত সভায় সে এবং তার উজির (খাজা নিজামুল মুলক) উপস্থিত ছিল। সেখানে সুন্নী মাযহাবের আব্বাস নামে একজন বিশিষ্ট আলেমের সাথে আলাভী নামে এক শিয়া আলেমের সাথে অন্যান্য আলেমগণের উপস্থিতিতে মুনাযিরাটি সংঘটিত হয় যা নিম্নরূপ ঃ

আলাভী ঃ আপনাদের মুল্যবান গ্রন্থসমূহে এসেছে যে, ওমর ইবনে খাত্তাব রাসূলে খোদার (সাঃ) সময়কার প্রচলিত (ইসলামের অতি প্রয়োজনীয়) বিভিন্ন দ্বীনি আদেশ-নিষেধের (আহ্কাম বা মাসয়ালা মাসায়েল) পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

আব্বাস ঃ কোন আহ্কামকে পরিবর্তন করেছে?

আলাভী ঃ উদাহরণ স্বরূপ ঃ

১- তারাবীর নামায ঃ তারাবী নামায যা রামাযান মাসে পাড়া হয়ে থাকে তা হচ্ছে মুসতাহাব নামায। জনাব ওমর সেই নামাযকে জামায়া'তের সাথে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে[১]। যদিও মুসতাহব নামায জামায়া'তের সাথে পাড়া ঠিক নয়। কেননা রাসূলে খোদার (সাঃ) সময়ে শুধুমাত্র ইসতিসকার নামায (মুসতাহাব) ব্যতীত অন্য কোন মুসতাহাব নামায জামায়া'তের সাথে পাড়া হত না।

২- জনাব ওমরের নির্দেশে আযানে حي على خير العمل (হাইয়্যা আলা

---

[১]। সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-২, পৃঃ-২৫১ এবং কামিল ইবনে আছির, খণ্ড-২, পৃঃ-৩১।

খাইরিল আমাল) এর স্থানে বলা হয়ে থাকে و الصلوة خير من النوم (ওয়াস সালাতু খাইরু মিনান নাউম)[১]।

৩- হাজ্জে তামাত্তু ও

৪- মুতয়া'তু নিসা (অস্থায়ী বিয়ে) হারাম ঘোষণা করেছে[২]।

৫- যাকাত বন্টনের ক্ষেত্রে "মুয়াল্লিফাতুল কুলুব"-এর অংশকে বন্ধ করে দেয়। যদিও তাদের এই অংশ দেয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে পরিস্কারভাবে নির্দেশ রয়েছে। আরো অন্যান্য আহ্‌কামের ক্ষেত্রেও, তবে এখানে শুধুমাত্র এই পাঁচটি তুলে ধারা হল।

মালেক শাহ্‌ ঃ সত্যই কি ওমর ইবনে খাত্তাব এই আহ্‌কামসমূহের পরিবর্তন ঘটিয়েছে?

খাজা নিজামুল মুলক ঃ হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো সুন্নী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও মুল্যবান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

মালেক শাহ্‌ ঃ তাহলে কিভাবে আমরা এই ধরনের ব্যক্তি যারা বিদয়াত স্থাপন করেছে তাদেরকে অনুসরণ করবো?

কুশচি[৩] ঃ যদি জনাব ওমর হাজ্জে তামাত্তু অথবা মুতয়া'তু নিসাকে

এবং আযানে হাইয়্যা আলা খাইরিল আমাল বলার ব্যাপারে নিষেধ করে থাকে তবে সে ইজতিহাদ করেছে। আর ইজতিহাদ তো বিদয়াত নয়।।[৪]

আলাভী ঃ পবিত্র কোরআন ও নবীর (সাঃ) পরিস্কার নির্দেশের বিপরীতে কি ইজতিহাদ করা যায়? নাছ্ছের বিপরীতে ইজতিহাদ করা কি জায়েয? আর যদি জায়েয হয়ে থাকে তাহলে সব মুজতাহিদের অধিকার আছে ঐরূপ করার। আর এমনই যদি হয়ে থাকে তবে যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আহ্‌কামের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং ইসলামের চিরন্তণতা ধ্বংশ হয়ে যাবে। এমনটি নয় কি, যা কোরআন বলেছে ঃ

ما آتاكم الرسول فخذوه و ماهاكم عنه فانتهوا

- যা কিছু রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছে তাই গ্রহণ কর, আর যা কিছুকে নিশেধ করেছে তা পরিহার কর[৫]।

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من

---

[১]। মুওয়াত্তা মালিকের ব্যাপারে যারকানির ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ, খণ্ড-১, পৃঃ-২৫।

[২]। তফসিরে ফাখরে রাজি, সুরা নিসার ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

[৩]। কুশচি হচ্ছে সুন্নী মাযহাবে একজন বিশিষ্ট আলেম তাকে 'ইমামুল মুতাকাল্লিমিনও' বলে থাকে।

[৪]। শারহি তাজরিদে কুশচি, পৃঃ-৩৭৪।

[৫]। হাশ্‌রঃ ৭।

امرهم

- ঈমাদান কোন নারী-পুরুষের অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর নবী কোন বিষয়ে নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন মনে করবেন, সে ব্যাপারে তাদের কোন মতামত থাকবে না[১]।

এরূপ নয় কি, যা নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة

- মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছুকে হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল থাকবে আর যা কিছুকে হারাম করেছেন তা মিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে[২]।

ফলাফল ঃ ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আহ্কামকে পরিবর্তন করা কখনোই উচিৎ নয়[৩]। স্বয়ং নবী (সাঃ) এমনটি করতে পারেন না। কেননা পবিত্র কোরআন নবীর (সাঃ) ব্যাপারে বলছে ঃ

و لو تقول علينا بعض الاقاويل، لا خذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من احد عنه حاجزين

- যদি সে (নবী) আমাদের ব্যাপারে মিথ্যা বলতো তবে আমারা তাকে আমাদের ক্ষমতাবলে ধরে ফেলতাম এবং তার কল্বের শিরাগুলোকে কেটে দিতাম, আর সেক্ষেত্রে তোমাদের কারো পক্ষে তা বন্ধ করার কোন ক্ষমতাই থাকতো না এবং তাকে সাহায্য করারও[৪]।

---

[১]। আহ্যাব ঃ ৩৬।

[২]। মুকাদ্দিমায়ে দারিমি, পৃঃ-৩৯ এবং উছুলে কাফী, খণ্ড-১, পৃঃ-৬৯।

[৩]। ইকতিবাস বাগদাদে সত্যের সন্ধানে কিতাব থেকে, পৃঃ-১২৭ থেকে ১২৯।

[৪]। হাক্কা ঃ ৪৪ থেকে ৪৭।

ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তিজানীর কয়েকটি মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী, তিউনিসিয়া প্রদেশের কাফাসাহ্ নামক শহরের অধিবাসী। তিনি তার এলাকার ও পরিবারের লোকজনের ন্যায় সুন্নী মাযহাবের মালেকি ফিরকার অনুসারী ছিলেন। তিনি লেখা-পড়া শেষে যখন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পেলেন তখন ইসলামী মাযহাবসমূহের মধ্যে কোনটি সঠিক সে ব্যাপারে বিশেষ গবেষণা করেন। আর সে কারণে তিনি বিভিন্ন শহর-দেশ ভ্রমণও করেছিলেন। যেমন নাজাফে আশরাফে আয়াতুল্লাহ্ আল উ'যমা খুই (রহঃ) ও শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকির সাদ্‌রের (রহঃ) সাক্ষাত করেন। তিনি যথেষ্ট পরিমানে গবেষণার পরে শিয়া মাযহাবকে সত্য, প্রকৃত ও সঠিক ইসলাম হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তার এই দীর্ঘ সময়ের গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্পর্কিত (ثُمَّ اهْتَدَيْتُ)[১] একটি বইও লিখেন। এর সাথে সাথে তিনি আরো অন্যান্য বই লিখেছেন। যেমন ঃ (مع الصادقين) (সত্যবাদীদের সাথে)। এই বইতে তিনি বিভিন্ন আলোচনা ও দলিলের মাধ্যমে শিয়া মাযহাবের সত্যতাকে প্রমাণ করেছেন।

উক্ত বইয়ের আলোচনা অনুসারে নিম্নে কয়েকটি মুনাযিরা তুলে ধারার চেষ্টা করবো।

১। উক্ত বইটি বাংলা ভাষায় "অবশেষে আমি সত্য পথের সন্ধান পেলাম" নামে অনূদিত হয়েছে।

৬৪- তাওয়াস্সুলের ব্যাপারে শহীদ আয়াতুল্লাহ্ বাকির সাদ্রের সাথে ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তিজানীর মুনাযিরা

ডঃ তিজানী প্রথমে যেহেতু সুন্নী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তাই গবেষণার উদ্দেশ্যে তিউনিসিয়া থেকে ইরাকের নাজাফে আশরাফে গিয়েছিলেন। আর সেখানে তার বন্ধুর মাধ্যমে শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ বাকির সাদ্রের[১] সাথে পরিচিত হন। তার সাথে আলোচনাকালে তিনি এরূপ প্রশ্ন করেন ঃ

সৌদি আরবের আলেমগণ বলে থাকেন, পবিত্র ব্যক্তিদের কবরে হাত বুলানো ও তাদের প্রতি তাওয়াচ্ছুল করা বা তাবার্রুক নেয়া হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরিক করা। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

আয়াতুল্লাহ্ সাদ্র বলেন ঃ যখন কেউ মনে করবে যে, উক্ত কবরে শায়িত ব্যক্তি, আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে পারবে এমন নিয়তে উক্ত কবরে হাত বুলাবে বা তাওয়াছ্ছুল করবে তখন তা শির্ক হবে। কিন্তু মুসলমানগণ এক আল্লাহ্র উপাসনা করে থাকে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্ই এমন শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। যিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আর এটা জেনে তারা আল্লাহ্র অলি-আউলিয়াগণকে নিজেদের উছিলা হিসেবে নির্ণয় করে থাকে। সুতরাং এই উছিলা নির্ণয় করাটা কোন শির্কের ব্যাপার হতে পারে না।

সকল মুসলমানগণ (শিয়া ও সুন্নী উভয়ই) রাসূলে খোদার (সাঃ) সময় থেকে আজোবধি এই বিষয়ের প্রতি ঐক্যমত পোষণ করে আছে, শুধুমাত্র ওহাবী ও সৌদি আরবের আলেমগণ ব্যতীত। যাদের অস্তিত্ব খুব বেশী দিনের নয়[২]। তারা

---

[১]। হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উ'যমা শহীদ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকির সাদ্র (রহঃ) ১৩৫৩ হিজরীতে ইরাকের কাযেমাইনে জন্ম গ্রহণ করেন। যুবক বয়েসেই তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতায় উন্নীত হন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেমন ফীকাহ্ শাস্ত্র, উছুল শাস্ত্র, ইসলামী যুক্তি বিদ্যা, দর্শন ও আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর আনুমানিক ২৪ টি বই লিখেছেন। ইরাকী অত্যাচারী শাষক সাদ্দামের বিরুদ্ধে কলমের মাধ্যমে জিহাদ করেন এবং অবশেষে তিনি ১৩৫৯ ফার্সী সনে ৪৭ বছর বয়সে তার ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বোন বীনতুল হুদা সহ হিজাজে সাদ্দামের অত্যাচারী বাহিনীর হাতে শাহাদত বরণ করেন।

[২]। ওহাবী ফিরাকার জনক হচ্ছে শেইখ মুহাম্মদ, আব্দুল ওহাবের সন্তান। সে ১১১৫ হিজরীতে নাজদ প্রদেশের উ'ইইনাহ্ শহরে জন্ম গ্রহণ করে। তার পিতা ঐ শহরের বিচারক ছিল।
সে ১১৫৩ হিজরীতে ওহাবী আক্বীদা-বিশ্বাসকে প্রকাশ করে। একদল তাকে আনুগত্য করলো। ১১৬০ হিজরীতে নাজদ প্রদেশের দারিয়াহ্ শহরের গভর্ণর মুহাম্মদ ইবনে সুয়ূ'দের (আলে সুয়ূ'দের পিতামহ) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপণ করে এবং তারা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, ওহাবী আক্বীদা-বিশ্বাসকে প্রচার করবে

মুসলমানগণের ঐক্যমতের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং মুসলমানগণের রক্তকে মুবাহ্ মনে করে থাকে এবং তাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করছে। আর কবরের উপর হাত বুলানো ও তাওয়াছ্ছুল করাকে শির্ক মনে করে থাকে। তারপর বললেন ঃ

জনাব সাইয়্যেদ শারাফুদ্দিন (একজন বিশিষ্ট গবেষক ও আল মুরাজিয়া'ত গ্রন্থের প্রণেতা) শিয়া মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম। তিনি আব্দুল আ'যিয সৌদির শাসনামলে একবার মক্কায় যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেন। কুরাবাণী ঈদের দিনে অন্যান্য আলেমগণের সাথে তিনিও বাদশাহের দরবারে দাওয়াত পেলেন। নিয়ম অনুযায়ী উচ্চ পদস্থ সকলে বাদশাকে ঈদ মুবারক জানায়। তিনিও ঈদ মুবারক জানাতে দরবারে গেলেন। যখন তার পালা আসলো তখন তিনি চাতুরাতার সাথে ছাগলের চামড়া দিয়ে বাধাই করা একটি কোরআন বাদশাহ্র হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিলেন। বাদশাহ্ উপহারটি স্বাদরে গ্রহণ করে তাতে চুম্বণ করলো এবং কপালে ছোয়ালো ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলো। জনাব শারাফুদ্দিন এই উপযুক্ত সময়টিকে হাত ছাড়া করলেন না। তিনি হ্টাৎ বলে উঠলেন ঃ

হে বাদশাহ্! কেন আপনি এর উপর চুম্বণ দিলেন এবং বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন? এটা তো ছাগলের চামড়া বৈ অন্য কিছুই নয়।

বাদাশাহ্ বলল ঃ আমার এই মলাটের উপর চুম্বন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মলাটের মধ্যে যে কোরআন রয়েছে তাতে চুম্বন দেয়া, এই মলাটকে চুম্বন দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

জনাব শারাফুদ্দিন তড়িৎ বেগে বললেন ঃ অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে হে বাদশাহ্! আমরা শিয়ারাও যখন নবীর (সাঃ) মাজারে চুম্বন দিয়ে থাকি ঠিক এমনই চিন্তা করে। যদিও আমরা জানি যে, মাজারের চার পাশে যে লোহার বেষ্টনি দেয়া আছে তাতে চুম্বন দেয়ায় কোন ফয়দা নেই। তাথাপিও তাতে চুম্বন দিয়ে থাকি শুধুমাত্র নবীকে (সাঃ) সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনের লক্ষ্যে। যেমনভাবে আপনি এই মলাটকে চুম্বন দেন নি বরং তার মধ্যে যে কোরআন রয়েছে সেই কোরআনের সম্মানে এই মলাটের উপর চুম্বন দিয়েছেন।

(আইনে ওহাবীয়াত, পৃঃ-২৬,২৭)। আর এভাবেই এই ভ্রান্ত ধারনাটি ইসলামী চিন্তা-চেতনায় প্রবেশ করলো। ১২ শতাব্দিতে আলে সুয়ূ'দের ক্ষমতাবলে তা ব্যাপক আকারে পরিচিত লাভ করে।

শেইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব ১২০৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পরে তার অনুসারীগণ তার রেখে যাওয়া পথ ধরে এগুতে থাকলো। ১২১৬ হিজরীতে সৌদি আরবের ওহাবী আমির ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালার উপর হামলা করে এবং সেখানে প্রায় ৫ হাজারের মত লোককে হত্যা করে (তারিখে কারবালা, পৃঃ-১৭২)।

উপস্থিত সকলেই তাকে খুব বাহ্! বাহ্! জানালো এবং তার যুক্তিকে মেনে নিল। এই পরিস্থিতিতে মালেক আব্দুল আ'যিয উপায়হীন হয়ে সকল হাজীগণকে রাসূলে খোদার (সাঃ) পবিত্র মাজার শরিফ থেকে তাবারুক নেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তার পরবর্তী বাদশাহ্ এই আইনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সুতরাং কোন শির্কই এর মধ্যে নেই। ওহাবীরা এই নিয়ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তকে মুবাহ্ করতে চায় এবং তাদের ক্ষমতাকে মুসলমানদের উপর টিকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ইতিহাস হচ্ছে কালের স্বাক্ষী যে, তারা মুহাম্মদের (সাঃ) উম্মতের উপর কি অত্যাচারই না করেছে[১]।

---

[১]। ইকতিবাস, অবশেষে সত্য পথের সন্ধান পেলাম বইয়ের মূল আরাবী থেকে, পৃঃ-৯২,৯৩।

৬৫- আযানে আলীর (আঃ) নামে সাক্ষ্য দেয়া

ডঃ সামাভী ঃ কেন শিয়ারা আযান ও ইকামতে সাক্ষ্য দেয় যে, আলী (আঃ) আল-াহ্‌র অলি?

আয়াতুলাহ্ সাদ্‌র ঃ আমিরুল মু'মিনিন আলী (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র একজন বান্দা। যাকে আলাহ্ তা'য়ালা অন্য সকলের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। যাতে করে তিনি নবুওয়াতের পরে ইমামতের গুরু দায়িত্বকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে পারেন। আর তিনি হচ্ছেন নবীর (সাঃ) ওয়াসি ও স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু সকল নবীরই একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তেমনই আলী (আঃ) হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) প্রতিনিধি। আর আমরা তাকে অন্যান্য সকল সাহাবীর থেকে উচ্চে স্থান দিয়ে থাকি। কেননা আলাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তাকে মর্যাদা দিয়েছেন। এই বিষয়টি কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন আক্‌লী (বিবেক সম্মত) ও নাকলী (বর্ণনাকৃত) দলিল আমাদের হাতে রয়েছে। আর এই দলিলসমূহে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা তা আমাদের পক্ষ থেকেই শুধু মুতাওয়াতির নয় বরং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের কাছেও তা মুতাওয়াতির বলে বিবেচিত[১]।

এই বিষয়ের উপর আমাদের আলেমগণ প্রচুর পরিমানে বই লিখেছেন। আর যেহেতু খিলাফতে বনি উমাইয়্যা এই নিগুড় ও অটুট সত্যকে ধ্বংশ করার লক্ষ্যে আলী (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল, তাদেরকে হত্যা করেছিল; মিম্বারের উপরে তাঁর ব্যাপারে লানত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল এবং মুসলমানদেরকে তা বলার জন্য তাদের উপর উপরর্যপরী চাপ সৃষ্টি করেছিল তাই শিয়ারা ও তাঁর অনুসারীগণ আযানে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, তিনি হচ্ছেন আলাহ্‌র অলি। আর এটা উচিৎ নয় যে, মুসলমান আলাহ্‌র অলির উপর লানত প্রদান করবে। এটা ছিল অত্যাচারী বনি উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে শিয়াদের এক ধরনের যুদ্ধ। যাতে করে আলাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং মু'মিনগণের ইজ্জত সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর তা যেন একটি ঐতিহাসিক বিষয় হয়ে থাকে এবং এ থেকে আগামী প্রজন্ম আলীর (আঃ) প্রকৃত

---

[১]। অর্থাৎ এত অধিক পরিমানে তার বয়ান হয়েছে যে, তা যে নবীর (সাঃ) কাছ থেকে এসেছে এ ব্যাপারে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারবে।

অধিকারের ব্যাপারে ও তাঁর শত্রুদের গোমরাহীর পথ সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

আর এই কারণেই আমাদের ফকীহ্গণ (যারা ফীকাহ্ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী) এই প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে আলীর (আঃ) বিলায়তকে আযান ও ইকামতে সংযোজন করেছিলেন। যদিও তা আযান ও ইকামতে বলাটা হচ্ছে মুসতাহাব বা আযান ও ইকামতের কোন অংশ নয়। সুতরাং যখনই কেউ আযান বা ইকামত দেয় তখন সে যদি এই মর্মে নিয়ত করে সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আযান বা ইকামতের একটি অংশ তবে তার আযান ও ইকামত বাতিল বলে গন্য হবে[১]।

---

[১]। ইকতিবাস, অবশেষে সত্য পথের সন্ধান পেলাম বইয়ের মূল আরাবী থেকে, পৃঃ-৮৮, ৮৯।

৬৬- হযরত আয়াতুলাহ্ আল উ'যমা খুইর (রহঃ) সাথে ডঃ তিজানী সামাভীর মুনাযিরা

ডঃ তিজানী সামাভী বলেন ঃ যখন আমি সুন্নী ছিলাম এবং সবে মাত্র ইরাকের নাজাফে আশরাফে পা রেখে ছিলাম তখন আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে হযরত আয়াতুলাহ্ আল উ'যমা সাইয়্যেদ আবুল কাসেম খুইর (রহঃ) সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধুটি তার কানে কানে কি যেন বলল, তারপর আমাকে আয়াতুলাহ্র পাশে বসতে ইঙ্গিত করলো। আমার বন্ধুটি অনেক পীড়াপীড়ি করলো যে, আমি যেন শিয়াদের সম্পর্কে তিউনিসিয়ার জনগণের অভিমতকে আয়াতুলাহ্র কাছে বয়ান করি।

বললাম ঃ আমাদের জনগণের কাছে শিয়া হচ্ছে ইয়াহুদী ও নাসারাদের থেকেও অনেক খারাপ একটি মাযহাব। কেননা ইয়াহুদী ও নাসারা আল্লাহ্র উপাসনা করে এবং মুসা ও ঈসার (আঃ) উপর বিশ্বাসী। কিন্তু আমরা শিয়া সম্পর্কে যা জানি তা হচ্ছে তারা আলীকে (আঃ) উপাসনা ও তার ইবাদত করে থাকে। সাথে সাথে তাকে পুজাও করে থাকে। আর শিয়াদের মধ্যে এমন অনেক দল আছে যারা আল্লাহ্র উপাসনা করে ঠিকিই কিন্তু আলীর (আঃ) মর্যাদাকে নবীর (সাঃ) উপরে মনে করে থাকে। তারা বলে যে, জিব্রাঈল (আঃ) পবিত্র কোরআনকে আলীর (আঃ) নিয়ে আসবে এটা নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু সে তা না করে পবিত্র কোরআনকে নবীর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেছে। তারা আরো বলে থাকে যে, জিব্রাঈল আমিন খিয়ানত করেছে।

আয়াতুল্লাহ্ খুই, কিছু সময় মাথা নিচের দিকে রেখেই বললেন ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রাসূল (শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর)। আর আলী (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্যান্য বান্দাদের মত একজন বান্দা। তারপর তিনি উপস্থিতদের দিকে ফিরে আমাকে ইশারা করে বললেন ঃ

এই অসহায়দের দিকে লক্ষ্য কর, দেখ তারা কিভাবে মিথ্যা অপবাদের সম্মুখে ধোকা খেয়ে থাকে। এটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কেননা

এর থেকেও আরো বেশী কিছু অন্যের কাছ থেকে শুনেছি।

لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআন পড়েছো?

বললাম ঃ তখনও আমার দশ বছর বয়স পূর্ণ হয় নি অর্ধেক কোরআন মুখস্ত

ছিলাম।

তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান যে, ইসলামী সব দলগুলো তাদের মাযহাবী কোন্দল ব্যতীরেকে কোরআন যে সত্য সে ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে। আর যে কোরআন আমাদের কাছে আছে সেই কোরআন তোমাদের কাছেও আছে।

বললাম ঃ হ্যাঁ, এটা জানি।

তিনি বললেন ঃ এই আয়তটি কি পড়েছো?

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

- আর মুহাম্মদ (সাঃ) রাসূল ব্যতীত অন্য কিছুই নয় যেমন তাঁর আগে আরো অনেক নবী এসেছিলেন[১]।

অনুরূপ এই আয়াতটি ঃ

محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار.........

- মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল এবং যারা তার সাথে আছেন তারা কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ়[২]।

অনুরূপ এই আয়াতটি ঃ

ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين

- মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কারো পিতা ছিলেন না, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও সমস্ত নবীর শেষ নবী ছিলেন[৩]।

এই আয়াতগুলো পড়েছো কি?

বললাম ঃ জি হ্যাঁ, এ আয়াতসমূহ পড়েছি।

তিনি বললেন ঃ এই আয়াতসমূহের মধ্যে আলী (আঃ) কোথায়? [দেখছো তো এখানে শুধু নবীর (সাঃ) রিসালতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, আলীর (আঃ) ব্যাপারে নয়। আর আমরা ও তোমরা দুই দলই কোরআনকে গ্রহণ করি]। সুতরাং কিভাবে আমাদের উপর অপবাদ দিতে পার যে, আমরা আলীকে (আঃ) নবীর (সাঃ) উপরে স্থান দিয়ে থাকি?

আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। আমার কাছে কোন জবাবই ছিল না।

তিনি আরো বললেন ঃ জিব্রাঈলের (আঃ) খিয়ানতের ব্যাপারে যে অপবাদ আমাদেরকে দিচ্ছ তা প্রথম অপবাদের থেকে বেশী লজ্জাজনক। কেননা জিব্রাঈল (আঃ) যখন নবীর (সাঃ) কাছে এসেছিলেন তখন আলীর (আঃ) বয়স কি ১০ বছরের

---

[১]। আলে ইমরান ঃ ৪৪।

[২]। ফাতহ্‌ ঃ ২৯।

[৩]। আহ্‌যাব ঃ ৪০।

কম ছিল না? তাহলে কিভাবে তিনি ভুল করলেন? তিনি কি মুহাম্মদ (সাঃ) ও আলীর (সাঃ) মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি?

আমি পুনরায় চুপ হয়ে গেলাম। কেননা এ বারও আমার কাছে কোন জবাব ছিল না। কারণ তার কথা ছিল সত্য ও যুক্তিসংগত।

তিনি আরো বললেন ঃ এখন তোমাকে বলছি যে, ইসলামের অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র শিয়া মাযহাবই আছে যারা নবীগণ ও ইমামগণের (আঃ) ব্যাপারে বিশেষ ইজ্জত সম্মান দিয়ে থাকে। অবশ্যই জিব্রাঈল (আঃ) হচ্ছেন 'রুহুল আমিন' এবং সমস্ত ধরনের ভুল থেকে তিনি নিষ্পাপ।

বললাম ঃ তাহলে এই গুজবসমূহ কি?

তিনি বললেন ঃ এগুলো হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ। মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে এই মিথ্যা রটনা করেছে। তুমি তো আল্লাহ্‌র রহমতে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি সে কারণে ভাল-মন্দকে দ্রুত বুঝতে পার। এখন এই বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গবেষণা করে দেখ তো, আমাদের মধ্যে এসব কিছু আছে কিনা?

আমি নাজাফে আশরাফে বেশ কিছু দিন ছিলাম এবং সেখানকার দ্বীনি শিক্ষালয়গুলো প্রদর্শণ করেছিলাম। কিন্তু ঐ অপবাদ ও গুজব যা

শিয়াদের সম্পর্কে দেয়া হয়ে থাকে তার কিছুই সেখানে দেখতে পাই নি[১]।

---

[১]। ইকতিবাস ও অবশেষে সত্য পথের সন্ধান পেলাম আরবী বইয়ের সংকলন, পৃঃ-৭৬,৭৮।

৬৭- যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একত্রে পড়ার ব্যাপারে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ আমরা জানি যে, আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়া'ত যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একত্রে পড়াকে বৈধ নয় বলে মনে করে থাকে এবং বলে থাকে ঃ ওয়াজিব হচ্ছে উক্ত চারটি নামাযকে তার নিজস্ব সময়ে পড়া এবং যোহ্‌র ও আছর এবং মাগরিব ও এ'শার নামাযের মধ্যে সময়ের দূরুত্ব বজায় রাখতে হবে।

ডঃ তিজানী সামাভী বলেন ঃ আমি যখন সুন্নী ছিলাম তখন এরূপেই নামায পড়তাম এবং এক সঙ্গে পড়াটাকে বৈধ মনে করতাম না।

যখন নাজাফে আশরাফে প্রবেশ করলাম এবং আমার বন্ধুর পরামর্শে যখন আয়াতুল্লাহ্‌ শহীদ মুহাম্মদ বাকির সাদ্‌রের (রহঃ) সাক্ষাতে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন যোহ্‌রের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। জনাব সাদ্‌র মসজিদের দিকে রওনা হলেন। আমি এবং উপস্থিত সকলেই মসজিদের দিকে গেলাম। নামায পড়তে শুরু করলাম। দেখলাম জনাব সাদ্‌র যোহ্‌রের নামায শেষে কিছু সময় অতিক্রান্ত করে আছরের নামায পড়তে শুরু করলেন। আমি এমন এক স্থানে ছিলাম যেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারছিলাম না। তাই প্রথমবারের মত যোহ্‌রের নামাযের পরে আছরের নামায আদায় করলাম। কিন্তু অত্যন্ত মানষিক চাপ অনুভব করছিলাম এ ভেবে যে, আমার আছরের নামায কি সঠিক হল?

সে দিনটি শহীদ সাদ্‌রের (রহঃ) মেহমান হয়েছিলাম। সুযোগ হাতে আসায় জনাব সাদ্‌রকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

এটা কি কোন মুসলমানের ঠিক হবে যে, তার কোন জরুরী অবস্থা কারণে দুটি ওয়াজিব নামাযকে একসঙ্গে আদায় করবে?

শহীদ সাদ্‌র ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্যই বৈধ হবে। এমনকি কোন জরুরী অবস্থা না থাকলেও যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামাযকে একসঙ্গে পড়তে পারবে।

জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনার এই উক্তির পিছনে কি যুক্তি আছে?

শহীদ সাদ্‌র ঃ কেননা রাসূলে খোদা (সাঃ) মদীনায় থাকা

অবস্থায় এবং কোন প্রকার ভয়ের কারণ ছাড়াই অথবা বৃষ্টি হওয়া ব্যতীরেকে বা অন্য কোন জরুরী অবস্থা না থাকাতেও যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামাযকে

একসঙ্গে আদায় করেছেন। আর আমাদের কষ্ট কম হওয়ার জন্যই তিনি এ কাজটি করেছেন। এই বিষয়টি আমাদের কাছে ইমামগণের (আঃ) মাধ্যমে প্রমাণিত এবং তোমরা আহ্‌লে সুন্নাতের অনুসারীদের কাছেও (সুন্নাতের মাধ্যমে) প্রমাণিত।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এটা কিভাবে সম্ভব। আমাদের কাছে কিভাবে তা প্রমাণিত হতে পারে। কেননা সে দিন পর্যন্ত কারো কাছে জানতে পারি নি যে, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের লোকেরা এরূপ করে থাকে। বরং তারা এর বিপরীতে বলে থাকে যে, যদি আযানের এক মিনিট আগেও নামায আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নামায হচ্ছে বাতিল। আর আছরের আযানের কত আগে তা আদায় করা হচ্ছে এটা তো অসম্ভব। এমন কাজ আমাদের কাছে অপিরিচিত এবং বাতিল বলে গন্য।

জনাব সাদ্‌র, আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন আমি আশ্চর্যিত হয়েছি যে; কিভাবে যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একসঙ্গে আদায় করা সম্ভব? তিনি তার এক ছাত্রকে ইশারা করলেন। সে উঠে গিয়ে দুটি বই আমার সামনে আনলো। দেখলাম যে, সে দুটি বই হচ্ছে সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারী। জনাব সাদ্‌র আমাকে উক্ত নামযাসমূহ একত্রে পড়ার হাদীসগুলো দেখিয়ে দেয়ার জন্য ঐ ছাত্রটিকে নির্দেশ দিলেন।

আমি ঐ দুটি বইতে দেখলাম এবং পড়লাম যে, রাসূলে খোদা (সাঃ) যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায কোন প্রকার ভয়ের কারণ বা বৃষ্টি হওয়া বা কোন জরুরী অবস্থা ছাড়াই একত্রে আদায় করেছেন। আর সহীহ্ মুসলিমে এই বিষয় সম্পর্কে একটি অধ্যায় আমি দেখতে পেলাম। আমি আরো আশ্চর্যিত হয়ে পড়লাম। হে আল্লাহ্ আমি এ কি দেখছি। আমার অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হল, হয়তো এই দুটি বই আসল নয়। মনে মনেই বললাম, যখন তিউনিসিয়ায় ফিরে যাবো তখন সেখানে এই বই দুটিকে দেখবো। অবশ্যই এই বিষয়টিকে আমার জানা অতি প্রয়োজন।

এই সময় জনাব সাদ্‌র আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই জলন্ত প্রমাণ দেখার পরে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

বললাম ঃ আপনি সত্য পথে আছেন এবং সত্য বলেছেন।

জনাব সাদ্‌রকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে গেলাম। কিন্তু আমার মন সন্তুষ্ট হল না। আমি দেশে ফিরে সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারীতে খুব ভালভাবে ঐ বিষয়টির প্রতি গবেষণা করলাম। উক্ত বই দুটি দেখার পরে আমার অন্তর প্রশান্তিতে ভরে গেল, সেখানে লেখা ছিল যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায কোন জরুরী অবস্থা ছাড়াই একত্রে পড়া জায়েয এবং রাসূলে খোদা (সাঃ) এমনটি করেছেন।

দেখলাম ইমাম মুসলিম নিজের[১] সহীহাতে (দুই নামাযকে সফরে থাকা ব্যতীত একত্রে পড়ার ব্যাপারে) ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে, নবী (সাঃ) যোহ্র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একত্রে আদায় করেছেন।

এবং সাথে সাথে তিনি মদীনায় যোহ্র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামাযকে কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকা অথবা বৃষ্টি হওয়া ছাড়াই একত্রে আদায় করেছেন। ইবনে আব্বাসের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কেন নবী (সাঃ) এরূপ করলেন? সে উত্তরে বলল ঃ

كي لا يحرج امته (যাতে করে তাঁর উম্মতের উপর বোঝা না হয়)[২]।

আর সহীহ্ বুখারীতেও (খণ্ড-১, পৃঃ-১৪০) "ওয়াকতুল মাগরিব" অধ্যায়ে দেখলাম যে, সেখানেও ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে নবী (সাঃ) যোহ্র-আছরের আট রাকা'য়াত নামাযকে এবং মাগরিব-এ'শার সাত রাকা'য়াত নামাযকে একত্রে আদায় করেছেন।

তদ্রূপ মুসনাদ ইবনে হাম্বালেও[৩] দেখলাম যে, সেখানেও এই একই বিষয় উল্লেখ হয়েছে।

এবং তদ্রূপ ইবনে মালিকের[৪] "আলমুয়াত্তাতেও" দেখলাম যে, সেখানে ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে ঃ

صلى رسول (ص) : الظهر و العصر جميعاً و المغرب و العشاء جميعاً في غير خوف و لا سفر

- রাসূলে খোদা (সাঃ) যোহ্র ও আছরের এবং মাগরিব ও এ'শার নামাযকে কোন প্রকার ভয়ের কারণ ও সফরে আছেন এরূপ অবস্থা ছাড়াই একত্রে আদায় করেছেন।

ফলাফল ঃ যেহেতু এই ধরনের বিষয় দিনের আলোর মতো পরিস্কার তথাপিও আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের ভাইয়েরা গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে, কেন এই বিষয়ের[৫] ব্যাপারে আমাদের ভুল ধরে থাকেন?!

তাদের নিজেদের গ্রন্থসমূহে এর জবাব থাকা সত্ত্বেও তারা তা থেকে বে-খাবার[৬]।

---

[১]। সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড-২, পৃঃ-১৫১ (বাবুল জাময়ে' বাইনাস সালাতাইন ফিল হাযার)।

[২]। ঐ, পৃঃ-১৫২।

[৩]। মুসনাদ ইবনে হাম্বাল, খণ্ড-১, পৃঃ-২২১।

[৪]। মুয়াত্তা আল ইমাম মালিক (শারহুল হাওয়ালিক), খণ্ড-১, পৃঃ- ১৬১।

[৫]। অর্থাৎ যোহ্র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একত্রে আদায়ের বিষয়টি।

[৬]। মায়া'স সাদিকিন, লেখক ডঃ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী, বৈরুত প্রিন্ট, পৃঃ-২১০ থেকে ২১৪।

৬৮- আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়া'তের এক মসজিদের ইমামের সাথে যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একত্রে পড়ার ব্যাপারে মুনাযিরা

ডঃ তিজানী বলেন ঃ যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায যে একত্রে আদায় করা যায় যা সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারীতে দেখেছিলাম (এ মুনাযিরাটি আগে উল্লেখ হয়েছে) তা তিউনিসিয়ায় আমার কয়েকজন বন্ধুর মাঝে উত্থাপন করলাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিষয়টির সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হল। আর এই বিষয়টি আমাদের এলাকার একটি মসজিদের ইমাম সাহেবের কানে পৌছালো। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেছিল ঃ যারা এরূপ মনে করে থাকে, তারা নতুন এক দ্বীন আনায়ন করেছে যা কোরআনের সাথে বিরোধীতা রাখে। কেননা পবিত্র কোরআন বলেছে ঃ

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً

- প্রকৃতপক্ষে নামায মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে স্থাপন করা হয়েছে[১]।

আর ঐ ইমাম সাহেব যারা এই বিষয়ের প্রতি সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিল তাদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলল।

যারা এই বিষয়ের প্রতি সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিল তাদের একজন আমার বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুটি আমার কাছে এসে ইমাম সাহেবের অপমান অপদস্থমূলক কথা-বর্তার বর্ণনা তুলে ধরলো। আমি ঐ দুটি বই (সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারী) তার সামনে তুলে ধরলাম এবং তা পড়ে দেখতে বললাম। সে পড়ার পরে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হল। আমার ঐ বন্ধুটি গতানুগতিক ধারায় ঐ মসজিদে নামায পড়তে গেল। জামায়া'তের নামায শেষে সে ঐ ইমাম সাহেবের পাশে বসলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একত্রে পড়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ইমাম সাহেব ঃ এটা শিয়াদের একটি বিদয়া'ত।

আমার বন্ধুটি ঃ উক্ত বিষয়ের সত্যতার পক্ষে সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারীতে প্রমাণ রয়েছে।

---

[১]। নিসা ঃ ১০৩।

ইমাম সাহেব ঃ না, তা হতেই পারে না। ঐ দুটি বই সম্পর্কে এমন কথা বলা উচিৎ নয়।

আমার বন্ধুটি ঐ দুটি বই ইমাম সাহেবের সামনে তুলে ধরলো। আর তিনি (দুই নামায একত্রে পড়ার অধ্যায়টি) পড়লেন। যখন তিনি উপস্থিত সকলের সামনে তা পাঠ করলেন এবং বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি বই দুটিকে আমার কাছে দিয়ে বললেন ঃ দুই নামায একত্রে আদায় করাটা শুধুমাত্র নবীর (সাঃ) জন্য বৈধ ছিল বা তাঁর বিশেষত্ব। তুমি যদি নবী হও তখন তোমার জন্য এরূপে নামায আদায় করা বৈধ হবে।

আমার বন্ধুটি বলল ঃ ইমাম সাহেবের এরূপ উত্তরের কারণে বুঝতে পারলাম যে, তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। আর সে দিন কসম করেছিলাম যে, তার পিছনে আর নামায পড়বো না।

এখানে একটি গল্প বলা দরকার ঃ দুই ব্যক্তি শিকার করতে গিয়েছিল। তারা হটাৎ দুরে একটি কালো রংয়ের কিছু দেখতে পেল। তাদের একজন বলল এই কালো রংয়ের বস্তুটি হচ্ছে কাক, কিন্তু দ্বিতীয়জন বলল না তা হচ্ছে ছাগল। তারা নিজেরদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু করলো। যখন তারা উভয়ই ঐ কালো রংয়ের বস্তুটির কাছে পৌছালো তখন একটি কাক তাদের সামনে উড়ে যেতে দেখলো।

প্রথম ব্যক্তিটি বলল ঃ দেখেছো আমি বলেছিলাম না যে, তা ছিল কাক।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নিজের কথাই যে সত্য তা প্রমাণ করার জন্য বলল ঃ আশ্চর্যের বিষয় ছাগল আবার উড়তেও পারে!!

ডঃ তিজানী আরো বলেন ঃ আমি আমার বন্ধুটিকে ডেকে বললাম যে, ঐ ইমাম সাহেবের কাছে যাও এবং তাকে সহীহ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারী দেখিয়ে বল যে, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক ও আরো অনেক সাহাবাই নবীর (সাঃ) ইমামতিতে যোহ্‌র-আছর ও মাগরিব-এ'শার নামায একত্রে আদায় করেছেন। আর একত্রে নামায আদায় করা শুধুমাত্র নবীর (সাঃ) বিশেষত্ব নয়। আমাদের জন্য কি এটাই উচিৎ নয় যে, নবীকে (সাঃ) আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবো।

আমার বন্ধু আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল ঃ এ কাজে কোন লাভ নেই। কেননা ইমাম সাহেব হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি তাকে যদি স্বয়ং রাসূলে খোদাও (সাঃ) এসে বলেন তবুও সে তা গ্রহণ করবে না[১]।

---

[১]। ইকতিবাস "মায়া'স সাদিকিন" কিতাব থেকে, পৃঃ-২১৪, ২১৫।

৬৯- তাত্হীরের আয়াত পর্যালোচনার পর মদীনার বিচারকের চরম দুরবস্থা

ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তিজানী বলেন ঃ আমি যখন মদীনায় তখন মসজিদে নব্বীতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেলাম যে, একজন খতিব বেশ কিছু সংখ্যকের মাঝে বক্তৃতা করছে। তার বক্তৃতা শোনার জন্য বসলাম। সে কোরআনের কয়েকটি আয়াতের তফসির করলো। উপস্থিত লোকদের কাছে জানতে পারলাম সে হচ্ছে মদীনার বিচারক। সে তার বক্তৃতা শেষে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। মসজিদ থেকে বাইয়ে যাওয়ার সময় তার সামনে গেলাম এবং তার পথ রোধ করে দাড়িয়ে বললাম ঃ জনাব আমাকে বলে দিন যে, আহ্লে বাইতের অর্থ এই আয়াতে কি? যেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেনঃ

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً

- আল্লাহ্ তা'য়ালা এটাই চান যে, হে আহ্লে বাইত তোমাদের থেকে সমস্ত ধরনের অপবিত্রতা ও গোনাহ্ দুর হোক এবং তোমরা সম্পূর্ণরূপে পাক ও পবিত্র হয়ে যাও [১]।

বিচারক দ্রুত উত্তর দিল ঃ এই আহ্লে বাইতের অর্থ হচ্ছে নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণ। যেনমভাবে এই আয়াতের প্রথমে নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

- হে নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণ! তোমরা তোমাদের বাড়ীর মধ্যে থাকবে এবং অজ্ঞ-মূর্খদের মত (মানুষের মধ্যে) নিজেদেরকে প্রকাশ করো না এবং ....।

বললাম ঃ শিয়া আলেমগণ বলেন, এই আয়াতটি আলী (আঃ), ফাতিমা (সালাঃ), ইমাম হাসান ও হুসাইনের (আঃ) জন্য নাজিল হয়েছে। তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে, এই আয়াতটি শুরু থেকে নবীর (সাঃ) স্ত্রীদের সম্বন্ধে কথা বলেছে এবং এই আয়াতের পূর্বের আয়াতেও নির্দিষ্ট করে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

يا نساء النبي ....

- হে নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণ ....।

---

[১]। আহ্যাব ঃ ৩৩।

তারা আমাকে এর উত্তরে বললেন ঃ যদিও এই আয়াত ও পূর্বের আয়াতে নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণের ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং স্ত্রী লিঙ্গের বহুবচনে তা বলা হয়েছে। যেমনঃ

لستن، فلا تخضعن، بيوتكن، لا تبرجن، اقمن، آتين، اطعن،

কিন্তু এই আয়াতের শেষের দিকে তার রূপের বা ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। তার সর্বনামগুলো পুংলিঙ্গের বহুবচনে ব্যবহারিত হয়েছে। যেমন ঃ (عنكم) ও (يطهركم)।

বিচারক নিজের চশমাকে উপরে উঠিয়ে (যুক্তিসঙ্গত উত্তর না দিয়ে) আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ঃ শিয়ারা যেভাবে মহিলাদের ব্যাপারে বিষাক্ত চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক সেভাবেই তারা কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করে থাকে ....[১]।

এখানে আলোচনার ইতি টানার জন্য আল্লামা তাবাতাবাঈর (রহঃ) তফসিরে আল মিযানের থেকে কিছু বক্তব্য তুলে ধরবো ঃ আমাদের হাতে এমন কোন দলিল নেই যে উক্ত আয়াতটি (ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ ....) যা সূরা আহ্‌যাবের ৩৩ নং আয়াতের শেষের দিকে এসেছে তা পূর্বের বা পরের আয়াতের সাথে নাযিল হয়েছে। বরং রেওয়ায়েত পরিস্কারভাবে আমাদেরকে বলছে যে, এই আয়াতটি আলাদাভাবে নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু নবীর (সাঃ) যুগে কোরআন সংকলনের সময় এই আয়াটিকে উক্ত দুই আয়াতের মধ্যে স্থান দেয়া হয়েছে[২]।

এ ছাড়াও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের একাধিক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতটি আলী (আঃ), ফাতিমা (সালাঃ), ইমাম হাসান ও হুসাইনের (আঃ) ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

এমনকি নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণ যেমন ঃ উম্মে সালামা ও আ'য়েশা

এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে, এই আয়াতটি আলী (আঃ), ফাতিমা (সালাঃ), ইমাম হাসান ও হুসাইনের (আঃ) উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে[৩]।

---

[১]। ছুম্মা আহ্‌তাদাইতু, পৃঃ-১১৪ ও ১১৫।

[২]। আল মিযান, খণ্ড-১৬, পৃঃ-৩৩।

[৩]। সাওয়াহিদুত তানযিল, খণ্ড-২, পৃঃ-১১, ২৫ এবং ইহকাকুল হাক, খণ্ড-২।

৭০- নবীর (সাঃ) পরিবারবর্গের উপর দুরুদ ও ছালাম পাঠ করার ব্যাপারে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ আমরা এটা জানি যে, আহ্লে সুন্নাত যখন ইমাম আলীর (আঃ) নাম উচ্চারণ করে থাকে তখন তারা তাঁর নামের পরে "আলাইহিস সালাম" বলার স্থানে "কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু" (আল্লাহ্‌ তার সম্মানজনক স্থান দান করুন) বলে থাকে। আর অন্যান্য সাহাবাদের ক্ষেত্রে বলে থাকে "রাযিআল্লাহু আনহু" (আল্লাহ্‌ তাদের উপর রাজি খুশি হোক)। কেননা তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে যে, আলী (আঃ) কোন গোনাহ্‌ করেন নি যাতে করে তাঁর ব্যাপারে বলবে "রাযিআল্লাহু আনহু"। বরং আলীর (আঃ) ব্যাপারে অবশ্যই বলা উচিৎ যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যেন তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন"। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, কেন আলীর (আঃ) নামের শেষে তারা "আলাইহিস সালাম" বলে না? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে নিচের মুনাযিরাটি লক্ষ্যণীয় ঃ

ডঃ তিজানী সামাভী যিনি প্রথমে সুন্নী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তিনি কায়রো থেকে ইরাকে আসার সময় জাহাজে একজন জ্ঞানী বন্ধু পেয়েছিলেন। তার নাম ছিল উস্তাদ মুনই'ম। তিনি একজন শিয়া পণ্ডিত ও ইরাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তারা জাহাজে অনেক আলোচনাই করলো। এর পরবর্তীতেও ডঃ তিজানী সামাভী উস্তাদ মুনই'ম বাগাদদে অনেক বার আলোচনা করেছে। তাদের মধ্যকার একটি আলোচনা এরূপ ছিল ঃ

ডঃ সামাভী ঃ আপনারা আলীর (আঃ) মর্যাদাকে এত উপরে উঠিয়ে থাকেন যা নবীর (সাঃ) সমপর্যায়ের। কেননা তাঁর নামের শেষে "কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর" পরিবর্তে "আলাইহিস সালাম" বলে থাকেন। যদিও সালাম ও ছালাওয়াত হচ্ছে শুধুমাত্র নবীর (সাঃ) জন্য।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً

- আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ও ফেরেশ্‌তাগণ নবীর (সাঃ) উপর দরুদ পাঠিয়ে থাকেন। তোমরা যারা ঈমান এনেছো তারা তাঁর উপর দরুদ পড় ও তাকে সালাম দাও এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পন করবে (আহ্‌যাব ঃ ৫৬)।

উস্তাদ ঃ হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা যখন আমিরুল মু'মিনিন আলীর (আঃ) নাম উচ্চারণ করে থাকি তখন তাঁর নামের শেষে এবং অন্যান্য ইমামগণের (আঃ) নামের শেষেও "আলাইহিস সালাম" বলে থাকি। কিন্তু এটা এই অর্থে নয় যে, তাদেরকে নবীর (সাঃ) সমমানের মনে করি।

ডঃ তিজানী ঃ তাহলে কোন কারণে আপনারা তাদের উপর দরুদ ও সালাওয়াত পাঠ করে থাকেন?

উস্তাদ ঃ উপরোল্লিখ আয়াতের ভিত্তিতে। এই আয়াতের তফসির আপনার জানা আছে কি? যার ব্যাপারে সুন্নী ও শিয়া মুফাস্সিরগণ ঐক্যমত পোষণ করেছে ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন একদল সাহাবা নবীকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপর সালাম ও দরুদ দেয়ার বিষয়টি বুঝেছি কিন্তু কিভাবে তা করবো তা বুঝতে পারি নি।

নবী (সাঃ) এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন ঃ

اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم في العالمين انّك حميدٌ مجيد

- হে আল্লাহ্! দরুদ ও রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেভাবে ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দুরুদ ও রহমত পাঠিয়েছিলে, তুমি তো প্রশংসিত ও দোয়া কবুলকারী [১]।

তিনি আরো বললেন ঃ لا تصلوا عليَّ الصلاة البتراء -কখনো আমার উপর অসম্পূর্ণ দরুদ পাঠ করো না।

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলো ঃ অসুম্পূর্ণ দরুদ কোনটি?

তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা শুধুমাত্র "সাল্লি আলা মুহাম্মদ বল" এবং এর বাকী অংশটা না বল তখন সেটা হবে অসুম্পূর্ণ দরুদ। বরং তোমরা বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ"। কেননা এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ দরুদ বা সালাওয়াত[২]।

অনেক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তোমরা পরিপূর্ণ দরুদ বা সালাওয়াত পাঠ করবে এবং তার শেষে "আলে মুহাম্মদ" কথাটি বাদ দিবে না। এমনকি নামাযের তাশাহুদে সালাওয়াত পড়াটাকে শিয়া মাযহাবের ফকিহ্গণ ওয়াজিব বলেছেন। আর সুন্নী মাযহাবের ইমাম শাফেয়ী' তা নামাযের দ্বিতীয় তাশাহুদে পড়া ওয়াজিব মনে করেন[৩]।

১। সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-৬, পৃঃ-১৫১, সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড-১, পৃঃ-৩০৫।

২। আসসাওয়ায়েকুল মাহ্রিকুহ্, পৃঃ- ১৪৪।

৩। শারহে নাহাজুল বালাগাহ্ -ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড-৬, পৃঃ-১৪৪।

আর তারা এর ভিত্তিতে একটি কবিতাও বলে থাকে ঃ

يا اهل بيت رسول الله حبكم — فرض من الله في القرآن انزله
كفاكم من عظيم القدر انكم — من لم يصل عليكم لاصلاة له

- হে নবীর আহ্‌লে বাইত! তোমার প্রতি ভালবাসাকে নামাযেও ওয়াজিব করা হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ করেছেন।

আর তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট, যে ব্যক্তি নামাযে তোমাদের উপর দরুদ বা সালাওয়াত পাঠ করা হয় না সে নামায বাতিল বলে গন্য হয়[১]।

ডঃ তিজানী এ কথা শোনার পরে হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বিষয়টি তার অন্তরে দারুণভাবে স্থান করে নিল। তিনি বললেন ঃ আপনার এ কথাটিকে গ্রহণ করলাম যে, আলে মুহাম্মদ, মুহাম্মদের (সাঃ) সাথে দরুদ পাওয়ার অংশিদার। আর যখন আমরা তাঁর উপর দরুদ পাঠাবো তখন তাঁর সাহাবদেরকেও তাদের মধ্যে শামিল করবো। কিন্তু এটা তো গ্রহণীয় নয় যে, শুধুমাত্র আলীর (আঃ) নাম উচ্চারীত হবে তখন তাঁর নামের শেষে

বলবো "আলাইহিস সালাম"[২]।

উস্তাদ ঃ আপনি কি সহীহ্ বুখারীকে গ্রহণ করেন?

ডঃ তিজানী ঃ হ্যাঁ, কেননা এই গ্রন্থটিকে আহ্‌লে সুন্নাতের একজন উচ্চ পর্যায়ের ইমাম লিখেছেন। আর কোরআনের পরেই এই গ্রন্থের মর্যাদা।

---

[১]। আল মাওয়াহিবু যুরকানী, খণ্ড-৭, তাযকিরাহ্ আল্লামাহ্, খণ্ড-১, পৃঃ-১২৬।

[২]। লেখকের কথা ঃ পবিত্র কোরআনে সূরা সাফ্‌ফাতের ১৩০ নং আয়াতে পড়ে থাকবো যে, "সালামু আলা আলে ইয়াসিন" (আলে ইয়সিনের উপর সালাম), ইবনে আব্বাসের থেকে উল্লেখ হয়েছে যে, আলে ইয়াসিন বলতে আলে মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝানো হয়েছে। সুতরাং রেওয়ায়েত অনুযায়ী উচিৎ হচ্ছে যে, আলে মুহাম্মদের প্রতিটি ইমামের নাম উল্লেখ করার সময় বলল যে, "আলাইহিস সালাম"।

এমন কি আহ্‌লে সুন্নাতের বিশিষ্ট আলেম ইবনে রুযবাহান যিনি সমস্যার উদ্রেক বলে পরিচিত তিনিও এটা কাবুল করেন যে, আলে ইয়াসিন বলতে আলে মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝানো হয়েছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, সূরা সাফ্‌ফাতে আরো অন্যদের উপর সালাম পাঠানো হয়েছে উল্লেখ আছে যেমন ঃ হযরত নূহের উপর (আয়াত নং ৭৯), হযরত ইব্রাহীমের উপর (আয়াত নং ১০৯), হযরত মুসা ও হারুনের উপর (আয়াত নং ১২০) এবং সমস্ত মুরসালিনদের উপর (আয়ত নং ১৮১)। আর এই বিষয় থেকে এটা পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, আলে মুহাম্মদ (সাঃ) নবীগণদের সারিতে অবস্থান করছেন এবং উল্লেখিত আয়াতটি আলে মুহাম্মদের (সাঃ) ইমামগণের উচ্চ মর্যাদারই বহিঃপ্রকাশ। (দালায়েলুছ ছিদক, খণ্ড-২, পৃঃ- ৩৯৮)।

উস্তাদ নিজের ঘর থেকে সহীহ্ বুখারীটি আনলেন। বইটির একটি স্থানে আমাকে পড়ে দেখার জন্য দিলেন। আমি দেখলাম সেখানে লেখা আছে যে, "ওমুক আমাকে ওমুকের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং ওমুক আলীর (আলাইহিস সালামের) উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে বলেছে"। আমি "আলাইহিস সালাম" লেখাটি দেখে আৎকে উঠলাম। মনে মনে ভাবলাম এই গ্রন্থটি হয়তো আসল নয়। তা ভেবে আমি খুব ভাল করে যাচাই করলাম এবং দেখলাম যে, না অন্য সহীহ্ বুখারীকে যেরূপে দেখেছিলাম এটাও তাই। আমার সন্দেহের অবসান হল।

উস্তাদ সহীহ্ বুখারীর অন্য একটি পৃষ্ঠা খুলে আমাকে পড়তে দিলেন। আমি তা পড়লাম। সেখানে লেখা ছিল যে, "আলী ইবনুল হুসাইন আলাইহিস সালাম এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন"। তা দেখার পরে আমার আর কোন জবাব ছিল না। শুধুমাত্র বললাম ঃ সুবহান আল্লাহ্! আমি আরো একবার ঐ সহীহ্ বুখারীটাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম যে, তা মিশরের হালাবী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। আর তখন সত্য গ্রহণ না করে আমার কোন উপায় ছিল না[১]।

---

[১]। ছুম্মাহ্ তাদাইতু ঃ অবশেষে আমি সত্য পথের সন্ধান পেলাম (আরবী), পৃঃ-৬৫-৬৭।

৭১- গাদীর সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে মুনাযিরা

ডঃ তিজানী সামাভী বলেন ঃ তিউনিসিয়াতে একজন সুন্নী আলেমের সাথে কথা বলছিলাম। তার সাথে কথা বলতে বলতে উক্ত বিষয়ে তার সাথে আমার একটি মুনাযিরাও হয়েছিল। আমি তাকে এরূপ বললাম ঃ

আপনি কি গাদীরের হাদীসকে গ্রহণ করেন? যা নবী (সাঃ) এক লক্ষের ও বেশী সাহাবার সামনে বলেছিলেন ঃ

من كنت مولاه فهذا علي مولاه

- আমি যার মাওলা বা অভিভাবক এই আলীও তার মাওলা বা অভিভাবক।

তিউনিয়াসিয়ার ঐ ব্যক্তি ঃ হ্যাঁ আমি এই হাদীসকে বিশ্বাস করি। এ হাদীসটি হচ্ছে সহীহ্ হাদীস। আমি কোরআনের তফসির লিখেছি। সেখানে সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াতের তফসিরে গাদীরের হাদীসটি তুলে ধরেছি। আর তাতে ঐ সত্যকে স্বীকার করেছি।

এরপর সে তার তফসিরটি আমাকে দেখালো। সে তার তফসিরে সত্যিই গাদীরের হাদীসটি উল্লেখ করেছে। দেখলাম সেখানে উক্ত হাদীসটি উল্লেখের পর এরূপ লেখা হয়েছে ঃ

"শিয়ারা মনে করে থাকে যে, এই হাদীসটি পরিস্কারভাবে নবীর (সাঃ) পরে আমাদের সাইয়্যেদ আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খেলাফতের ঘোষণা দিচ্ছে। কিন্তু সুন্নীদের দৃষ্টিতে তা হচ্ছে বাতিল। কেননা যদি তাই হয় তবে আবু বকর, ওমর ও উসমানের খেলাফতের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হবে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে এই হাদীসের পরিস্কার উক্তিটির থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তা অন্যভাবে অর্থ করবো[১]। আর বলবো যে, মাওলা শব্দের অর্থ নেতা বা পরিচালক নয় বরং তার অর্থ হচ্ছে বন্ধু ও বন্ধুত্ব। কেননা কোরআনে অনুরূপ শব্দের অর্থ বন্ধু ও বন্ধুত্ব রূপে এসেছে। আর খোলাফায়ে রাশেদিন (আবু বকর, ওমর ও উসমান) নবীর (সাঃ) বড় বড় সাহাবগণ এই শব্দ থেকে এরূপ বুঝেছিলেন এবং তাবেঈন ও ইসলামের বড় বড় আলেমগণও এই অর্থকেই

[১]। এখানে উক্ত তফসিরকারর স্বীকারোক্তি দিচ্ছে এভাবে যে, হাদীসে গাদীর ইমাম আলীর (আঃ) খেলাফতের ব্যাপারে জলন্ত প্রমাণ থাকা সত্বেও আমরা বাধ্য হয়েই তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে উক্ত হাদীসটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছি।। (আপনারা বিষয়টি লক্ষ্য করুণ)।

অনুসরণ ও গ্রহণ করেছে। অতএব, শিয়াদের কথার কোন মূল্যই নেই ....।

ডঃ তিজানী ঃ গাদীরে খুমের ঘটনা সত্যই ইতিহাসে ঘটেছে না ঘটে নি?

সে ঃ হ্যাঁ, ঘটেছে। আর যদি না ঘটে থাকতো তবে ওলামা ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ তা বর্ণনা করতো না[১]।

ডঃ তিজানী ঃ এটা কি যুক্তিসঙ্গত যে, নবী (সাঃ) এক লক্ষেরও বেশী লোক যাদের মধ্যে মহিলাও ছিল তাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে, প্রখর রোদের মধ্যে, একটি বিশাল লম্বা খুৎবা দিবেন, শুধুমাত্র এটা বলার জন্য যে, আলী (আঃ) তোমাদের বন্ধু? এমন ব্যাখ্যা প্রকৃত ঘটনাকে গোপন করার জন্য কি আপনি পছন্দ করবেন?

সে ঃ বিভিন্ন যুদ্ধের কারণে আলীর (আঃ) হাতে অনেকেই আহত হয়েছিল যারা পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা আলীর (আঃ) ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিল এবং অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতো। তাই নবী (সাঃ) গাদীরের ঘটনার মাধ্যমে চেয়েছিলেন যে, আলীর (আঃ) ব্যাপারে তাদের ক্ষুব্ধতা দূর হয়ে যাক এবং তারা তাঁর সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হোক। আর এরপর থেকে তাদের মধ্যে যেন আর কোন শত্রুতা না থাকে[২]।

ডঃ তিজানী ঃ আলীর (আঃ) সাথে বন্ধুত্ব করার কথা বলার জন্য এমনভাবে এক লক্ষেরও বেশী লোক একত্রি করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর যদি তাই হত তবে নবীর (সাঃ) ঐ বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে, উত্তপ্ত মরুভূমিতে, প্রখর রোদের মধ্যে, লম্বা খুৎবা দেয়ার প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং উক্ত বক্তব্যটি আলীর (আঃ) বেলায়াত বা রাহ্‌বার বা নেতৃত্ব বা পরিচালকের ব্যাপারে বলা হয়েছে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপানের জন্য নয়।

কেননা নবীর (সাঃ) সেদিনকার বক্তব্যের প্রথম বাক্যটির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, তিনি সেখানে বলেছেন ঃ

الست اولی بکم من انفسکم

- আমি কি তোমাদের জীবনের থেকেও তোমাদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নই?

---

[১]। এই হাদীসের সনদ ও দলিলসমূহ আহ্‌লে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও উল্লেখ হয়েছে, যেমন লক্ষ্য করুণঃ আল্ গাদীর, প্রথম খণ্ড।

[২]। এখানে তিউনিসিয়ার ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অবশ্যই বলতে হয় ঃ যদি আলীকে (আঃ) ভালবাসতে হয় তবে তা প্রমাণের একটি পথ হচ্ছে তাঁর কথা মেনে নেয়া। আর তাঁর কথাকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা। কিন্তু নবীর (সাঃ) পরে তিনি তাঁর ন্যায্য অধিকার দাবী করেছিল কিন্তু তারা তাঁর কথা গ্রহণ করেনি। বরং তাকে জোর করে হাতে পায়ে দড়ি বেধে নিয়ে গিয়েছিল আবু বকরের হাতে বাইয়াত করার জন্যে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেও অনেক অপমান অপদস্ত করেছিল। এমন কি সালমানে ফার্সিকে পিটিয়ে ছিল।

উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলো ঃ হ্যাঁ, আমাদের কাছে আপনার এমন বিশেষত্ব আছে। এখানে 'আউলা' শব্দটির অর্থ মাওলা যা হাদীসে গাদীরে এসেছে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর তার অর্থ হচ্ছে পরিচালক, অভিভাবক বা নেতা।

আর যদি আপনার বক্তব্যকে সত্য ধরে নেই। তবে এটা নবীর (সাঃ) অনেক সহজ ব্যাপার ছিল যে, যারা আলীর (আঃ) উপর ক্ষুব্ধ ছিল তিনি তাদেরকে ডেকে বলে দিতেন এখন থেকে আলীর (আঃ) সাথে বন্ধুত্ব রাখবে। তার জন্য তো আর ঐ উত্তপ্ত মরুভূমিতে, প্রখর রোদের মধ্যে, লম্বা খুৎবা দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আর তিনি এমন ছোট্ট একটি কথা বলার জন্য [আলী (আঃ) তোমাদের বন্ধু এবং তোমরা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রেখো] সবাইকে এত কষ্ট দিতেন না।

অন্য দিকে আবু বকর ও ওমর উভয়েই এই "মাওলা" শব্দ থেকে আলীর (আঃ) নেতৃত্বের কথাই বুঝেছিলেন। তাই যখন গাদীরে খুমে আলীর (আঃ) মাওলাইয়াত বা বেলায়াত ঘোষনা হল তখন তারা এরূপ বলেছিল ঃ

بخ بخ لك يابن ابي طالب اصبحت مولاي و مولا كل مؤمن و مؤمنة

- স্বাগতম, স্বাগতম হে আবু তালেবের সন্তান আলী। তুমি আজ থেকে আমার এবং প্রতিটি মু'মিন নর-নারীর মাওলা হয়ে গেলে [১]।

এই হাদীসটি প্রশংসার হাদীস হিসেবে পরিচিত। আর এই হাদীসকে আহ্লে সুন্নাত ও শিয়াদের বড় বড় আলেমগণও গ্রহণ করে থাকে।

এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে, একটি সাধারণ বন্ধুত্বের জন্য আবু বকর ও ওমরের এমন কথা বলাটা নিশ্চয় ঠিক নয় অথবা বক্তব্য শেষে নবীর (সাঃ) সকল মুসলমানের উদ্দেশ্যে এটা বলাও ঠিক নয় যে, হে মুসলমানগণ! سلموا عليه بامرة المؤمنين -তোমরা সকলেই আলীকে (আঃ) তোমাদের নেতা হিসেবে সালাম দাও।

এ ছাড়াও নবী (সাঃ) গাদীরের ঘটনাটিকে সূরা মায়েদাহ্র ৬৭ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরে সম্পন্ন করেছেন।

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم بفعل فما بلغت رسالته

- হে নবী! যা কিছু তোমার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌছে দাও। আর যদি তা না কর তবে তুমি তোমার রিসালতের কোন কাজই আঞ্জাম দিলে না।

এই বন্ধুত্বের বিষয়টি কি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, নবী (সাঃ) যদি তা বয়ান না

---

[১]। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, খণ্ড-৪, পৃঃ- ২৮১।

করতেন তবে তাঁর রিসালতের কোন কাজই গ্রহণ করা হতো না?!

সে ঃ তাহলে কেন রাসূলে খোদা (সাঃ) ইন্তেকালের পরে মুসলিম সমাজ ও খলিফাগণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন নি? তারা কি তাহলে গোনাহ্ করেছে এবং রাসূলে খোদার (সাঃ) কথার বরখেলাপ করেছে? (এমন বলার জন্য) আসতাগফিরুল্লাহ্!

ডঃ তিজানী ঃ যখন আহ্‌লে সুন্নাতের বড় বড় আলেমগণ তাদের নিজস্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নবীর (সাঃ) ইন্তোকালের পর তাঁর সাহাবাগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশকে অবমাননা করেছিল[১], তখন তো আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণই থাকে না যে, তারা এই বিষয়ের প্রতিও তাঁর নির্দেশকে অবমাননা করেছে। আর শিয়া ও সুন্নী উভয়ই এই বিষয়ের উপর ঐক্যমত যে, নবী (সাঃ) উসামা ইবনে যাইদকে কয়েক মাসের জন্য সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি করেছিলেন তখন তার বয়স কম থাকার কারণে সকলেই বিরোধীতা করেছিল। সুতারাং তারাই আবার আলীর (আঃ) ৩৩ বছর বয়সে তাদের নেতা হয়ে যাওয়াটা যা ছিল একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য, কিভাবে মেনে নিতে পারে। আর আপনি আগে বলেছেন যে, সাহাবাগণ আলীর (আঃ) প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল বা শত্রুতা পোষণ করতো, তাহলে এ থেকে এটা প্রমাণ করে যে, সব সাহাবার অন্তর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না।

সে ঃ যদি আলী (আঃ) জেনেই থাকবেন যে, নবী (সাঃ) তাকে নিজের খলিফা নিযুক্ত করে গেছেন তবে তাঁর ইন্তেকালের পরে চুপ করে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং তাঁর যে শক্তি ও সাহস ছিল তা নিয়ে নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে প্রতিরোধ করতেন।

ডঃ তিজানী ঃ হে ভাই আমার! এটা একটি সম্পূর্ণ আলাদা আলোচনা। আর আমি সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না। যখন আপনি পূর্বের বিষয়ে উপযুক্ত দলিল থাকা সত্বেও তা বিশ্বাস করছেন না। সেক্ষেত্রে এই বিষয়ের আলোচনাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন।

সে মুচকি হেসে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম যে, আমি এমন এক ব্যক্তি যে আলীকে (আঃ) সকলের থেকে উচে স্থানে দেই। যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকতো তাহলে আলীকে (আঃ) অন্যান্য সকলের উপরে স্থান দিতাম। কেননা তিনি তো হচ্ছেন (مدينة العلم و اسد الله الغالب) (জ্ঞানের শহর এবং শেরে খোদা)। কিন্তু আল্লাহ্ এরূপ চান যে, কাউকে সামনে আনবেন আবার কাউকে পিছনে রাখবেন। আল্লাহ্‌র বিচারের

---

[১]। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম, হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির ব্যাপারে কিছু সাহাবা নবীর (সাঃ) বিরোধীতা করে বৃহস্পতিবার কি নিদারুণ উক্তিই না করেছিল, যেমন ওমর বলেছিল নবী (সাঃ) প্রলাপ বকছেন এবং .... উল্লেখ করেছে।

ব্যাপারে তো আর কারো কিছু বলার নেই।

আমিও একটু মুচকি হেসে বললাম ঃ আল্লাহ্‌র বিচার-ব্যবস্থাও হচ্ছে একটি আলাদা আলোচনা তা আমাদের উপরোল্লিখ আলোচনার সাথে কোন প্রকার সম্পর্কই রাখে না।

সে ঃ আমি আমার বিশ্বাসের উপর স্থির রয়েছি। আর তা কখনোই পরিবর্তীত হবে না।

হ্যাঁ, সে এই আলোচনা থেকে এভাবেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আর একটি আলোচনা শেষ না হতেই আরেকটি আলোচনার বিষয় উত্থাপন করছিল। এ ধরনের লোকেরাই দলিল প্রমাণ থেকে দূরে থাকতে চায় ....[১]

---

[১]। 'মায়া'স সাদিকিন' কিতাব থেকে ইকতিবাস, পৃঃ- ৫৮ থেকে ৬১ পর্যন্ত।

৭২- বারজন ইমাম বা বারজন খলিফার বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মুনাযিরা

ছাত্র ঃ ডঃ খালিদ নাউফিল নামে জর্দানের শরিয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়ার জন্য আসতেন। আমি একমাত্র ছাত্র ছিলাম যে, শিয়া মাযহাবের অনুসারী হয়েও তার ক্লাসে অংশ গ্রহণ করতাম। তিনি বিভিন্ন সময়ে শিয়া মাযহাবের ব্যাপারে তার অন্তরে যে গোড়ামী ছিল তা প্রকাশ করতো। একদিন তার সাথে নবীর (সাঃ) বারজন খলিফা ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। আপনারাও তা শুনুন ও বিচার করুন ঃ

শিক্ষক ঃ আসলে হাদীস গ্রন্থসমূহে এমন ধরনের কোন হাদীসই নেই যে, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার পরে আমার বারজন খলিফা আছে! এ ধরনের হাদীস পরবর্তীতে তৈরী করা হয়েছে।

ছাত্র ঃ প্রসঙ্গতঃ আহ্‌লে সুন্নাতের বিভিন্নি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এই হাদীসটি বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে এরূপে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

الخلفاء بعدي عشر بعدد نقباء بني اسرائيل و كلهم من قريش

- আমার পরের খলিফা হচ্ছেন, বনি ইসরাঈলে বারজন নুকবাগণের সংখ্যা অনুসারে আর তারা সকলেই হচ্ছেন কুরাইশ সম্প্রদায়ের থেকে[1]।

সুতরাং এই দলিলের ভিত্তিতে আপনাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহেই এই হাদীস এসেছে।

শিক্ষক ঃ যদি ধরে নেই যে, এই হাদীসটি গৃহীত হয়েছে। তাহলে তোমাদের শিয়াদের দৃষ্টিতে সেই বারজন খলিফা কারা?!

ছাত্র ঃ বিভিন্ন হাদীসের নির্ভরযোগ্য দলিল ও রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আমদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে ঃ

---

[1]। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আম্মারাহ্, খণ্ড-৪, পৃঃ- ৪৮২, মুসনাদে আহ্মাদ, খণ্ড-৫, পৃঃ- ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯২, মুসতাদরাকে সাহীহাইন, খণ্ড-৪, পৃঃ- ৫০১, মাজমায়ু হিইছামী, খণ্ড-৫, পৃঃ-১৯০ ও .... ।

১- আমিরুল মু'মিনিন আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)।
২- হাসান ইবনে আলী (আঃ)।
৩- হুসাইন ইবনে আলী (আঃ)।
৪- আলী ইবনুল হুসাইন (যয়নুল আবিদ্বীন) (আঃ)।
৫- মুহাম্মদ ইবনে আলী (আল বাকির) (আঃ)।
৬- জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ (আস্ সাদিক) (আঃ)।
৭- মুসা ইবনে জা'ফার (আল কাযিম) (আঃ)।
৮- আলী ইবনে মুসা (আর্ রেযা) (আঃ)।
৯- মুহাম্মদ ইবনে আলী (আল জাওয়াদ) (আঃ)।
১০- আলী ইবনে মুহাম্মদ (আল হাদী) (আঃ)।
১১- হাসান ইবনে আলী (আল আ'সকারী) (আঃ)।
১২- হুজ্জাত ইবনুল হাসান, ইমামে যামান হযরত মাহ্‌দী (আ'জ্জালাল্লাহ তা'য়ালা ফারাজাহুশ শারিফ)।

শিক্ষক ঃ হযরত মাহ্‌দী কি বর্তমানে জীবিত আছে?

ছাত্র ঃ হ্যাঁ, তিনি জীবিত আছেন। বিভিন্ন কারণে তিনি আমাদের চোখের অন্ত রালে রয়েছেন। যখন উপযুক্ত সময় আসবে তখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে আবির্ভূত হবেন এবং পৃথিবীর অন্যায়-অবিচার নির্মূল করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

শিক্ষক ঃ তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেছেন?

ছাত্র ঃ তিনি ২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে তাঁর বয়স হচ্ছে ১১৭০ বছর।

শিক্ষক ঃ এটা কিভাবে সম্ভব যে, একজন মানুষ এত বছর ধরে জীবন-যাপন করতে পারে? কেননা একজন মানুষ সর্ব শেষ ১০০ বছর পর্যন্ত বেচে থাকতে পারে।

ছাত্র ঃ আমরা মুসলমানরা আল্লাহ্‌র ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে র কারণে তিনি যদি এত বছর জীবন-যাপন করে থাকেন তবে তাতে সমস্যা কোথায়?

শিক্ষক ঃ আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বিষয়টি ঠিক আছে। কিন্তু এরূপ কিছু আল্লাহ্‌র সুন্নত বহির্ভূত বিষয়।

ছাত্র ঃ আপনারাও কোরআনের উপর বিশ্বাস রাখেন তদ্রুপ আমরাও। সূরা আনকাবুতের ১৪ নং আয়াতে কোরআন বলছে ঃ

و لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاماً

- আমরা নূহকে (আঃ) তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠিয়েছিলাম, আর সে তাদের মধ্যে এক হাজার থেকে পঞ্চাশ বছর কম জীবন-যাপন করেছে।

হযরত নূহ (আঃ) এই আয়াত অনুসারে ৯৫০ বছর তাঁর গোত্রের সাথে জীবন-

যাপন করেছিলেন। সুতরাং যদি আল্লাহ্ চান তবে অন্যান্য মানুষকেও এত পরিমান অথবা তার থেকেও বেশী পরিমান জীবিত রাখতে পারেন।

আর নবী (সাঃ) ইমাম মাহ্দীর (আঃ) ব্যাপারে প্রচুর বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন এমনই ইমাম যিনি পৃথিবীকে ন্যায়ে ভরে দিবেন। আর এ সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নীদের কাছে প্রচুর পরিমানে রেওয়ায়েতও রয়েছে যা অস্বীকার করার যো নেই। উদাহরণ স্বরূপ, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

المهدي من اهل بيتي يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً

- মাহ্দী আমার পরিবার থেকে, পৃথিবীর আনাচে-কানাচেতেও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে তদ্রূপভাবে যেভাবে তা দুর্নিতীতে পরিপূর্ণ ছিল[১]।

যখন তাদের আলোচনা এ পর্যায়ে পৌছালো তখন শিক্ষক মশাই ছাত্রের এই যুক্তিযুক্ত বক্তব্যের সম্মুখে চুপসে গেলেন। আর এই সুযোগে ছাত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, এখন আমরা আমাদের আলোচনার প্রথম পর্যায়ে ফিরে যাই। আপনি স্বীকার করেছেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

আমার পরে আমার খলিফাগণের সংখ্যা হচ্ছে বারজন এবং তারা সকলেই হবেন কুরাইশ বংশ থেকে। আর আমি আপনাকে ঐ বারজনের নাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলেছি। এখন আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে, আপনার দৃষ্টিতে এই বারজন কারা?

শিক্ষক ঃ উক্ত বারজন হচ্ছেন যথাক্রমে ঃ চারজন খলিফা (আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী)। তারপর হাসান (আঃ) ও মুয়া'বিয়া এবং ইবনে যুবাইর ও ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিয। মাহ্দী আব্বাসী (তৃতীয় আব্বাসীয় খলিফা) এবং তাহের আব্বাসীকেও উল্লেখ করা যেতে পারে। আসলে সত্যিকার অর্থে আমাদের কাছে এই বারজনের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আর এ ব্যাপারে আমাদের আলেমগণের কথা-বার্তাও এলো মেলো।

ছাত্র ঃ নবী (সাঃ) হাদীসে সাকালাইনে যা সকল মুসলমানই গ্রহণ করে থাকেন বলেছেন ঃ

اني تركت فيكم الثقلين : كتاب الله و عترتي، اهل بيتي

- আমি তোমাদের মাঝে দুটি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি, যার একটি হচ্ছে আল্লাহ্ কিতাব (কোরআন) ও অপরটি হচ্ছে আমার আহ্লে বাইত। যদি তোমরা এ দুটিকে

---

[১]। মুসনাদে আহ্মাদ, খণ্ড-৩, পৃঃ- ২৭।

আকড়ে ধর তবে কখনোই গোমরাহ্ হবে না [১]।

আর এটা পরিস্কার যে, আবু বকর, ওমর, উসমান এবং ইবনে যুবাইর, ওমর ইবনে আব্দুল আ'যিয ও মাহ্দী আব্বাসী নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতের মধ্যে গণ্য নয়। সুতরাং এই হাদীসের আলোকে বারজন খলিফার ব্যাপারে আমরা অন্ধকারের মধ্যে থাকবো। যারা নবীর (সাঃ) ইতরাতের মধ্যে গণ্য [শিয়াদের বিশ্বাস মতে হযরত আলী (আঃ) থেকে হযরত মাহ্দী (আঃ) পর্যন্ত] তারাই হচ্ছেন বারজন খলিফা।

শিক্ষক ঃ আমাকে সময় দাও। যাতে করে আমি এই বিষয়ের উপর গবেষণা করতে পারি। বর্তমান অবস্থায় আমার কাছে কোন উপযুক্ত দলিল নেই।

ছাত্র ঃ ঠিক আছে। আশা করি আপনি আপনার গবেষণায় সফলকাম হন। তবে আপনি অবশ্যই এটার উত্তর দিবেন যে, নবীর (সাঃ) বারজন খলিফা কাল কিয়ামত পর্যন্ত কারা?

কিন্তু কিছু দিন পরে ঐ শিক্ষকের সাথে ছাত্রের দেখা হলে, ছাত্র তার গবেষণা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে ঃ আহ্লে সুন্নাতের দৃষ্টিতে এই বিষয়ের উপর আমি কোন নির্দিষ্ট দলিল খুজে পাইনি।

অন্য একটি মুনাযিরাতে এক ছাত্র তার এক সুন্নী শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলো যে, নবীর (সাঃ) পরে তাঁর রেখে যাওয়া বারজন খলিফার যারা সকলেই হচ্ছেন কুরাইশ বংশের এ বিষয়টি বিশ্বাস করেন কি?

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ, এই বিষয়ে আমাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে অনেক রেওয়ায়েত উল্লেখ হয়েছে।

ছাত্র ঃ ঐ বারজন কারা?

শিক্ষক ঃ ১- আবু বকর, ২- ওমর, ৩- উসমান, ৪- আলী, ৫- মুয়া'বিয়া, ৬- ইয়াযিদ ইবনে মুয়া'বিয়া।

ছাত্র ঃ ইয়াযিদ কিভাবে নবীর (সাঃ) খলিফা হতে পারে। যে উন্মুক্তভাবে শারাব পান করতো এবং কারবালায় ইমাম হুসাইনকে (আঃ) নৃশংসভাবে হত্যা করেছে?!

তারপর ছাত্র তাকে বলল ঃ আপনাদের আরো ছয়জন খলিফার নাম বলুন। কিন্তু শিক্ষক তা বলতে অপারগ হল এবং বিষয়টি পাল্টে দিয়ে বলল ঃ তোমরা শিয়ারা নবীর (সাঃ) সাহাবাদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলে থাকো।

ছাত্র ঃ আমরা তো সকল সাহাবাদের বিরুদ্ধে এরূপ বলি না। আর আপনারা

---

[১]। মুসনাদে আহ্মাদ, খণ্ড-৪, পৃঃ- ৩৬৭, সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড-২, পৃঃ-২৩৮, সহীহ্ তিরমিযী, খণ্ড-৭, পৃঃ-১১২, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৭, পৃঃ-১১২ ও ....।

বলেন যে, সকল সাহাবাই ন্যায়পারায়ণ ছিলো। কিন্তু এটাও তো ঠিক নয়। কেননা পবিত্র কোরআনে প্রচুর আয়াত আছে যে, নবীর (সাঃ) সময়কার মুনাফিকদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। যদি বলি সকল সাহাবাই ন্যায়পারায়ণ ছিল তবে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের একটি বৃহত অংশ তা থেকে বাদ দিতে হবে।

শিক্ষক ঃ তুমি অবশ্যই সাক্ষ্য দিবে যে, আবু বকর, ওমর ও উসামানের ব্যাপারে রাজি আছো!

ছাত্র ঃ আমি তাদের ব্যাপারেই সাক্ষ্য দিবো যাদের প্রতি নবী (সাঃ), হযরত ফাতিমা (সালাঃ) রাজি ছিলেন। আমিও তাদের প্রতি রাজি আছি।

৭৩- উচ্চাস্বরে নবীর (সাঃ) মাজারের পাশে যিয়ারত পাঠ করা

একজন শিয়া আলেম বলেন ঃ আমি ৫০ জনের একটি দলের সাথে মদীনায় মসজিদে নব্বীতে গিয়েছিলাম। সেখানে নবীর (সাঃ) পবিত্র মাজারের পাশে যিয়ারত নামা পড়তে শুরু করলাম।

মাজার কমিটির প্রধান (শেইখ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালেহ্) আমার কাছে এসে অভিযোগ করে বলল ঃ তোমার কণ্ঠস্বরকে নবীর (সাঃ) মাজারের পাশে উচ্চে উঠিও না।

বললাম ঃ তাতে কি অসুবিধা আছে?

সে ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাতের ২ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون

- তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তারা নবীর (সাঃ) কণ্ঠের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচু করবে না এবং তাঁর সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলবে না। ঐ রূপ যেরূপ তোমরা একে অপরের সামনে করে থাকো। তার কারণে হয়তো তোমাদের আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তোমরা তা জানতেও পারবে না।

বললাম ঃ জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ [ইমাম সাদিক (আঃ)] এই স্থানেই চার হাজার ছাত্রকে দ্বীনি শিক্ষা দান করতেন। আর শিক্ষা দানের সময় তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর সমস্ত ছাত্রের কানে পৌছাতেন। তাহলে কি তিনি হারাম কাজ করেছেন?

আবু বকর ও ওমর এই স্থানেই উচ্চ স্বরে খুৎবা দান করতো এবং তকবিরের পর তকবির বলতো। তারা কি হারাম কাজ করেছে? আর বর্তমানেও আপনাদের খতিব এই স্থানে উচ্চ স্বরে খুৎবা দিয়ে থাকে এবং বারংবার উচ্চ স্বরে তকবির দিয়ে থাকে।

তাহলে কি কোরআনের বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে? কেননা কোরআন যেহেতু বলেছে ঃ হে মু'মিনগণ তোমরা নবীর (সাঃ) কণ্ঠের উপর কণ্ঠ উঠিও না।

প্রধান ঃ তাহলে এই আয়াতের অর্থ কি?

বললাম ঃ এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে অহেতুক উচ্চ স্বরে কথা বলা, যার মাধ্যমে রাসূলে খোদার (সাঃ) অসম্মান করা হয়ে থাকে। আর এই আয়াতটির শানে নুজুল হচ্ছে যা রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ বনি তামিমের একদল লোক মসজিদে এসে, যার অপর প্রান্তে ছিল নবীর (সাঃ) ঘর, চিৎকার ধ্বনি দিয়ে বলেছিল যে, يا محمد اخرج الينا -হে মুহাম্মদ! বাইরে এসো[১]।

এই কারণে রেওয়ায়েতে এসেছে যে, যখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন নবীর (সাঃ) খতিব "সাবিত ইবনে কাইস" বলল ঃ ঐ ব্যক্তি হচ্ছি আমি কেননা আমিই তো নবীর (সাঃ) সামনে উচ্চ স্বরে খুৎবা দিয়ে থাকি। অতএব এই আয়াতটি আমাকে ইশারা করে বলা হয়েছে। আমি ভাল কাজ করি নি এবং ধ্বংস হয়েছি।

এই কথা শোনার পর নবী (সাঃ) বললেন ঃ না, এরূপ নয়। সে (সাবিত ইবনে কাইস) হচ্ছে বেহেশ্তের অধিবাসী। কেননা সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমার প্রতি কোন অপমান হয় নি[২]।

এই কথা শোনার পর মাজার কমিটির প্রধান চুপ হয়ে গেল এবং আমাকে আর কিছু বলল না।

---

[১]। তফসিরে কুরতাবী, খণ্ড-৯, পৃঃ- ১২১, সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-৬, পৃঃ-১৭২।

[২]। মাজমায়ুল বায়ান, খণ্ড-৯, পৃঃ-১৩০, তাফসির ফি যালালি ওয়া মুরাগি, উক্ত আয়াতে।

৭৪-একজন সুন্নী আলেমের সাথে শেইখ বাহায়ীর পিতার বিভিন্ন মুনাযিরা

আল্লামা শেইখ হুসাইন ইবনে আব্দুস সামাদ আ'মিলি (রহঃ) দশম শতাব্দির একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি হচ্ছেন শেইখ বাহায়ীর পিতা।

তিনি ৯১৮ হিজরীতে মুহার্‌রম মাসের প্রথম দিকে আ'মিল শহরে ভূমিষ্ট হন এবং ৯৮৪ হিজরীতে ৬৬ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তিনি ৯৫১ হিজরীতে বর্তমান সিরিয়ার হালাব শহরে সফর করেন। আর সেখানে একজন সুন্নী আলেমের সাথে সত্য মাযহাব কোনটি এই বিষয়ের উপর কয়েকটি মুনাযিরাহ্ করেন। মুনাযিরার পরে ঐ সুন্নী আলেম শিয়া মাযহাব গ্রহণ করেন[১]। আমরা এখানে তার সে মুনাযিরাসমূহকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

১- কেন আপনারা ইমাম সাদিককে (আঃ) তাকলিদ করেন না?

হুসাইন ইবনে আব্দুস সামাদ বলেন ঃ হালাব শহরে প্রবেশ করলাম। সেখানে সুন্নী মাযহাবের এক আলেম আমাকে তার মেহ্মান হিসেবে নিয়ে গেল। তার সাথে কথা বলতে বলতে তাকলিদের বিষয়ে কথা উঠলো। আর এই বিষয়টিই আমাদের মুনাযিরার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারীত হল। মুনাযিরাটি ছিল এরূপ ঃ

হুসাইন ঃ আপনাদের দৃষ্টিতে কোরআনে বা নবীর (সাঃ) হাদীসে এমন কথা কি এসেছে যে, আবু হানিফার তাকলিদ করা আমাদের উপর ওয়াজিব?

সে ঃ না, এরূপ কথা কোরআনে বা নবীর (সাঃ) হাদীসে কোথাও বলা হয় নি।

হুসাইন ঃ তাহলে কি মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে এটা বলেছে যে,

আমরা আবু হানিফাকে অনুসরণ করে চলবো?

সে ঃ না, এমন ঘটনাও ঘটে নি।

হুসাইন ঃ তাহলে কোন দলিলের ভিত্তিতে আপনার উপর আবু হানিফাকে অনুসরণ করা জায়েয হয়েছে?

---

[১]। এই মুনাযিরাটি আরবী ভাষায় 'মুনাযিরাতুশ শেইখ হুসাইন বিন আব্দুস সামাদ .....' নামে একটি বই কায়েমে আলে মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সে ঃ আবু হানিফা মুজতাহিদ ছিল। আর আমি হচ্ছি তার মুকাল্লিদ। তাই মুকাল্লিদের প্রতি ওয়াজিব হচ্ছে কোন না কোন মুজতাহিদকে তাকলিদ (অনুসরণ) করা।

হুসাইন ঃ আপনার দৃষ্টিতে কি জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ [ইমাম সাদিক (আঃ)] মুজতাহিদ ছিলেন না?

সে ঃ তিনি মুজতাহিদের থেকেও অনেক উচ্চ স্থানে ছিলেন। আর জ্ঞান ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মানে কাউকে ভূষিত করা যায়, তিনি হচ্ছেন সে পর্যায়ের। আমাদের আলেমগণ তাঁর চার হাজার ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর সকলেই ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের আলেম ও মুজতাহিদ। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আবু হানিফা।

হুসাইন ঃ যেভাবে ইমাম সাদিকের (আঃ) জ্ঞান ও তাকওয়া (পরহেযগারীতা) এবং মুজতাহিদ হওয়ার ব্যাপারে আপনি স্বীকারোক্তি দিলেন, সে সূত্র ধরেই আমরা শিয়ারা তাকে তাকলিদ করে থাকি। সুতরাং কিভাবে বুঝলেন যে, আমরা গোমরাহ্ হয়ে গেছি এবং আপনারা হিদায়েতের পথে আছেন? আর আমাদের বিশ্বাস মতে তিনি কোন ভুল করেন না অর্থাৎ মা'সুম ছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই হচ্ছে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত। আর আবু হানিফার ফতোয়ায় ভুল থাকতে পাওে, তবে তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও নেই।

যদি আমরা ধরেও নেই যে, তিনি মা'সুম ছিলেন না (নাউজুবিল্লাহ্) বা আপনাদের মত শুধুমাত্র একজন মুজতাহিদ হিসেবেই মনে করি, সেক্ষেত্রেও আমাদের কাছে দলিল আছে যে, শুধুমাত্র ইমাম সাদিককেই (আঃ) তাকলিদ করা যাবে আবু হানিফাকে নয়।

সে ঃ এ ব্যাপারে আপনার দলিল কি?

হুসাইন ঃ আমাদের দলিলগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১- ইসলামের সকল দলই এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ইমাম সাদিক (আঃ) ইল্‌ম ও তাকওয়ার দিক থেকে একটি বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠ ছিলেন এবং অন্যদের থেকে তিনি অনেক উচ্চ পর্যায়ে ছিলেন। আর আমি বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন দ্বীন ধর্মের গ্রন্থে দেখি নি যে, তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করে কিছু লেখা হয়েছে। তার অনুসারীদের শত্রুরা এত শক্তিধর হওয়া সত্বেও তাঁর ব্যাপারে কোন বাজে কথা বলতে সাহস পায় নি। আর এটা নিঃসন্দেহে এমন মর্যাদা যা তাঁর আসে-পাশের কারো ছিল না।

সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, যার ইল্‌ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন। তাকে তাকলিদ না করে অন্য কাউকে যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে তাকে তাকলিদ করবো। কেননা তাকলিদ ও বাইয়াত সন্দেহ ও ভুল-

ভ্রান্তিহীন হতে হবে। আর এই আলোচনা নির্দিষ্ট স্থানে করা হয়েছে।

আপনাদের একজন ইমাম (ইমাম গায্যালী) তার আলমানখুল গ্রন্থে আবু হানিফার প্রতি অভিযোগসমূহকে লিখে গেছেন। তদ্রুপ শাফেয়ী' মাযহাবের অনেকেই (আননাকতুস সারিফাহু ফির রাদ্দি আলা আবি হানিফা) গ্রন্থে তার বিরুদ্ধে লিখেছেন।

....

অতএব, কোন সন্দেহ ছাড়াই বলা যায় যে, যার ইল্‌ম ও তাকওয়া এবং ন্যায়-পরায়ণতার প্রতি ঐক্যমত পোষণ করবেন, তাকে তাকলিদ করা ওয়াজিব হবে।

২- ইমাম সাদিক (আঃ) আমাদের বিশ্বাস মতে রাসূলে খোদার (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের মধ্যে গন্য। তাই পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত অনুযায়ী তিনি হচ্ছেন সমস্ত ধরনের অপিবত্রতা থেকে মুক্ত। যেমনভাবে আল্লামা লাগভী ইবনে ফার্স তার (মু'জামু মাকায়েসুল লোগাহ্‌) নামাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম সাদিক (আঃ) হচ্ছেন নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের মধ্যে গন্য। কিন্তু আবু হানিফার ব্যাপারে এরূপ কোথাও লেখা হয় নি। সুতরাং উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে অবশ্যই পবিত্র ব্যক্তিকে যারা কখনোই ভুল করেন না তাদেরকে তাকলিদ করা উচিৎ, যাতে করে পরবর্তী দুনিয়ায় নাজাত পাওয়া যায়।

সে ঃ আমরা বিশ্বাস করি না যে, ইমাম সাদিক (আঃ) নবী পরিবারের। বরং আমাদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আহ্‌লে বাইত আয়াতে তাত্‌হীরের দৃষ্টিতে হচ্ছেন পাঁচজন (নবী, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন আলইহিমুস সালাম)।

হুসাইন ঃ যদি আপনার কথা মত ধরেও নেই যে, ইমাম সাদিক (আঃ) ঐ পাঁচজনের মধ্যে নেই। তথাপিও তাঁর নির্দেশ মানাটা তিনটি দলিলের ভিত্তিতে ঐ পাঁচজনের নির্দেশ মানার সমান ঃ

১- যে ব্যক্তি ঐ পাঁচজনের পবিত্রতার (মা'সুমিয়াত) উপর বিশ্বাস রাখে সে ইমাম সাদিকের (আঃ) পবিত্রতার উপর বিশ্বাস রাখে। আর যে ব্যক্তি ঐ পাঁচজনের পবিত্রতার উপর বিশ্বাস রাকে না সে ব্যক্তি ইমাম সাদিকের (আঃ) পবিত্রতার উপরও বিশ্বাস রাখে না। আর যেহেতু আয়াতে তাত্‌হীরের আলোকে ঐ পাঁচজনের পবিত্রতা আমাদের কাছে পরিস্কার সেহেতু ইমাম সাদিকের (আঃ) পবিত্রতাও আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। কেননা ইসলামের আলেমগণ ঐ পাঁচজনের সাথে ইমাম সাদিকের (আঃ) পবিত্রতার কোন পার্থক্য করেন না। আর পবিত্রতা শুধুমাত্র ঐ পাঁচজনের ব্যাপারে সিমাবদ্ধ করা ঠিক হবে না। কেননা মুসলমানগণ নবীর (সাঃ) রেখে যাওয়া বারজন (ইমাম আলী থেকে ইমাম মাহ্‌দী আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত) খলিফাই যে পবিত্র সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

২- রাবী ও ইতিহাস বেত্তাগণের মধ্যে এটা অধিক উল্লেখিত যে, ইমাম সাদিক

(আঃ) কখনো জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্যদের মত পাঠশালায় যান নি। বরং সকলেই ঐক্যমতের ভিত্তিতে উল্লেখ করছেন যে, তিনি পিতার কাছ থেকে ইল্‌ম অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর পিতা তাঁর পিতার কাছ থেকে এভাবে ইমাম হুসাইন (আঃ) পর্যন্ত পৌছায়। আর ইমাম হুসাইন (আঃ) হচ্ছেন নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের একজন। সুতরাং ইমাম সাদিকের (আঃ) কথা ইজতিহাদের ভিত্তিতে নয়। তিনি খোদায়ী ইল্‌মের মাধ্যমে কথা বলে থাকেন বা নির্দেশ করে থাকেন। আর নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের সদস্যরাই বলেছেন যে, তাদের যে কোন একজনের কথা বিশ্বাস করার অর্থই হচ্ছে তাদের পিতামহের কথাকেই বিশ্বাস করা। কেননা তা হচ্ছে রাসূলে খোদার (সাঃ) কথা। এই বিষয়টিও আমাদের কাছে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত।

ফলাফল ঃ ইমাম সাদিকের (আঃ) কথা হচ্ছে ঐ পবিত্র লোকদেরই কথা যাদেরকে আয়াতে তাত্‌হীরের মাধ্যমে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে এবং আপবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে তাদের থেকে দূর করা হয়েছে।

৩- আপনাদের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ হয়েছে যে, হাদীসে সাকালাইন হচ্ছে সঠিক হাদীস এবং তার ব্যাপারে আপনাদের কোন সন্দেহও নেই। আর তা আপনারা বিশেষভাবে গ্রহণও করে থাকেন। সেখানে নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

اني تاركٌ فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي : الثقلين : كتاب الله و عترتي، اهل بيتي

- আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা ঐ দুটিকে আকড়ে ধরে থাকো তবে আমার পরে কখনো গোমরাহ্ হবে না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব (কোরআন) ও অপরটি হচ্ছে আমার আহ্‌লে বাইত [১]।

এই হাদীসটি পরিস্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, কোরআন ও নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতকে আকড়ে ধরে থাকাই হচ্ছে পরকালের নাজাত এবং গোমরাহ্ না হওয়ার উপকরণ। মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র শিয়ারাই ঐ দুটিকে আকড়ে ধরে আছে। আর অন্যরা নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতকে বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষকে তাঁর ইতরাত মনে করে তাদের প্রতি রুজু

করেছে।

হাদীসে সাকালাইনে তো আর এটা বলেনি যে, আমি তোমাদের মধ্যে কোরআন ও আবু হানিফাকে অথবা কোরআন ও শাফেয়ী'কে রেখে গেলাম। সুতরাং নবীর (সাঃ) ইতরাত ব্যতীত অন্য কাউকে আকড়ে ধরে কিভাবে নাজাতের পথ পওয়া সম্ভব।

আর এই বিষয়টিই যথেষ্ট যে, আমরা কেন ইমাম সাদিককে (আঃ) তাকলিদ করে

---

[১]। এই হাদীসটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস যা শিয়া ও সুন্নী উভয়েরই গ্রন্থসমূহে উল্লেখ হয়েছে।

থাকি। তাকে তাকলিদের মাধ্যমে নবীর (সাঃ) ইতারাতের সাথে তামাস্সুক রেখেছি। আর এটাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে, ইমাম সাদিককে (আঃ) অনুসরণ করাটা আবু হানিফাকে ও অন্যদের অনুসরণ করার থেকে অনেক উত্তম।

২- সুন্নী মাযহাবের চার ফিরকার খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি থাকা এবং শিয়া মাযাহাবের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি না থাকার ব্যাপারে মানুযিরা ঃ

উপরোল্লিখিত মুনাযিরাতে ইমাম সাদিকের (আঃ) তাকলিদের বিষয়টি যখন উত্থপিত হল তখন সে বলল ঃ

এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম সাদিকে (আঃ) ও তাঁর পিতৃ বংশের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান অন্যান্য সকলের থেকে অধিক উচ্চে এবং তারা তাদের মুকাল্লিদদেরকে পরকালে নাজাতও দিতে পারবেন। তথাপিও তাদের মাযহাব তেমনভাবে প্রচারিত হয় নি। কিন্তু তার বিপরীতে সুন্নী মাযহাবের চার ফিরকার (হানাফি, হাম্বালী, মালেকি ও শাফেয়ী') যথেষ্ট প্রচার হয়েছে।

হুসাইন ঃ যদি আপনার কথাটা এমন হয়ে থাকে যে, শাফেয়ী' ও হানাফি মাযহাব শিয়া মাযহাবকে প্রচার করে নি তা ঠিক বলেছেন। তবে তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা আমরাও তাদের মাযহাবকে প্রচার করি না। তদ্রূপ শাফেয়ী' মাযহাব হানাফি মাযহাবের প্রচারক নয়, তদ্রূপ হানাফি মাযহাবও হাম্বালী মাযহাবকে প্রচার করে না। অর্থাৎ কোন মাযহাবই অন্য মাযহাবের প্রচারক নয়। আর তাতে কোন মাযহাবেরই

ক্ষতি হবে না।

যাদি আপনার কথাটা এমন হয়ে থাকে যে, মুসমানদের কেউই শিয়া মাযহাবকে প্রচার করে নি। তবে তা বোধহয় ঠিক হবে না, কেননা তা যুক্তিহীন। কারণ শিয়ারা নিজেরাই যারা হচ্ছে মুসলমানদের একটি ব্যপক অংশের সমন্বয়ে গঠিত তারা এবং আহলে সুন্নাতের অনেকেই ও ইসলামের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় শিয়া মাযহাবের কথা উল্লেখ হয়েছে। অন্যান্য মাযহাব শিয়া মাযহাবের বিষয়টিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন বা আলোচনা করে থাকেন। আর এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে অনেক বই-পত্রও লেখা হয়েছে যা অস্বীকার করা যায় না।

শিয়া আলেমগণ যদিও সুন্নী আলেমগণের থেকে সংখ্যায় কম। তথাপিও তারা নিশ্চয়ই সুন্নী মাযহাবের শাফেয়ী' ও হাম্বালী ফিরাকার আলেমগণের থেকে সংখ্যায় কম নয়। বরং তাদের থেকে অনেক বেশী। আর যুগে যুগে শিয়া আলেমগণই ইল্‌মের বিভিন্ন স্তরে সব সময় উচ্চ পর্যায়ে থেকেছেন।

কিন্তু ইমামগণের (আঃ) সময়ে তাদের থেকে অন্য কেউ ইল্‌ম ও আমলের ক্ষেত্রে

উচ্চ পর্যায়ে ছিল না। এমনকি তাদের সাহাবগণ তৎকালীন সময়ে অন্যান্য মাযহাবের আলেমগণের থেকে ইল্‌মের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পর্যায়ে ছিল। যেমন ঃ হিশাম ইবনে হাকাম, হিশাম ইবনে সালিম, জামিল ইবনে দার্‌রাজ, যুরারেহ্ ইবনে আ'ইন, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম এবং আরো অনেকে।

ইমামগণের (আঃ) পরবর্তী সময়ে শিয়া মাযহাবের উচ্চ পর্যায়ের আলেমগণ হচ্ছেন, যেমন ঃ শেইখ সাদুক, শেইখ কুলাইনী, শেইখ মুফিদ, শেইখ তুসি, সাইয়্যেদ মুর্তাযা ও সাইয়্যেদ রেযার ভাই, ইবনে তাউস, খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি, মেইসাম বাহ্‌রানী, আল্লামা হিল্লি এবং আরো অনেকে। তারা তাদের বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে বিশ্বকে আমাদের সম্পর্কে ভাববার কারণ ঘটিয়েছে............. যা অস্বীকার করাটা হচ্ছে নিতান্তই মুর্খতার পরিচায়ক।

এই কারণে অবশ্যই বলতে হয় যে, আমাদের মাযহাবকে অনুসরণ করাই হচ্ছে শ্রেয়। কেননা যাকে আমরা তাকলিদ করে থাকি তিনি অন্যান্যদের থেকে উচ্চ পর্যায়ের। আর যারা ইন্‌সাফ সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করবে অবশ্যই আমাদের মাযহাবের উপযুক্ততা সম্পর্কে অবগত হবে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নেই যে, আপনাদের মাযহাবের সত্যতা বা উপযুক্ততা নিয়ে পর্যালোচনা করবো। কেননা আমরা যাকে অনুসরণ করবো তার ইসমাত (পবিত্রতা) থাকাটা শর্ত মনে করি। সুতরাং আমরাই আখিরাতে পরিত্রাণ পাবো।

আর আপনারা যদিও আমাদের মাযাহাবের সত্যতা ও উপযুক্ততাকে মুখে বলেন না, কিন্তু আমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে যে, আপনাদের নাজাত পেতে হলে অবশ্যই শিয়া মাযহাবের প্রয়োজন। কেননা আপনাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক আপনাদের নাজাতের মাধ্যম হচ্ছে মুজতাহিদকে তাকলিদ করা। আর সে দিক দিয়ে আমরা যাদেরকে তাকলিদ করি তাদের নাজাত দান ক্ষমতা অনস্বীকার্য।

আমার কথা এখানে শেষ হলে, তিনি আর কোন কথা বলেন নি বা আমার কথার কোন উত্তরও দিতে পারেন নি। তিনি পূর্বের প্রশ্নের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অন্য একটি আলোচনায় প্রবেশ করলেন।

৭৫- সাহাবাদের বিরুদ্ধে কটু কথা বলার ব্যাপারে মুনাযিরা

সুন্নী আলেম ঃ আমার আর একটি বিষয় জানার আছে। আর তা হচ্ছে আপনার দৃষ্টিতে নবীর (সাঃ) বড় বড় সাহাবার ব্যাপারে বাজে কথা বলার অর্থ কি? তারা তো নবীকে (সাঃ) নিজেদের জান ও মাল দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাদের তলোয়ারের মাধ্যমে জিহাদ করে বিভিন্ন দেশ ও স্থানকে ইসলামের আওতায় এনেছে। যেমন ওমর ইবনে খাত্তাবের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে যে স্থানগুলো ইসলামের দখলে এসেছে তা অন্য কোন খলিফার আমলে হয় নি। আর তা কেউ অস্বীকারও করতে পারবে না। আমি যখন আপনাদের মাযহাবের দলিলসমূহের প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই যে, তা অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। কিন্তু যখন আপনাদের মাযহাব নিয়ে চিন্তা করি তখন নবীর (সাঃ) বড় বড় সাহাবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের পক্ষ থেকে আজে-বাজে কথা বলার চিত্র ফুটে ওঠে। উপরোল্লিখিত বক্তব্যের ভিত্তিতে এ কাজটি নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ এবং তা ঠিকও নয়। আর এর মাধ্যমেই বুঝতে পারি যে, আপনাদের মাযহাব সঠিক মাযহাব নয়।

হুসাইন ঃ আমাদের মাযহাবে এমনটি করার ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেয়া হয় নি যে, নবীর (সাঃ) বড় বড় সাহাবাদের ব্যাপারে আজে-বাজে কথা বলতে হবে। বরং সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলে থাকে। কিন্তু আমাদের আলেমগণের মধ্যে কেউ এরূপ ফতোয়া দেই নি যে, তাদের উপর গালা-গাল করা ওয়াজিব এবং আমাদের ফীকাহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থেও এরূপ দেখা যায় না।

এরপর আমি তাকে শক্ত কসম দিয়ে বল্লাম ঃ যদি কেউ হাজার হাজার বছর শিয়া মাযহাবের অনুসারী হয়ে আহ্লে বাইতের বেলায়াতকে গ্রহণ করে থাকে ও তাদের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকে এবং নবীর (সাঃ) সাহাবাদের ব্যাপারে খারাপ কথা না বলে তবে সে গোনাহ্গার নয় বা তার ঈমানের উপর কোন ধাক্কাও আসবে না।

সে আমার এই কথা শোনার পরে খুশি হয়ে গেল এবং আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিল।

এ সময় আমি তাকে বললাম ঃ যখন আপনার কাছে নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতের ইল্ম, জিহাদ, ন্যায়পরায়ণতার বিশেষ যোগ্যতা প্রমাণ হয়েছে তখন কি তাঁরা অনুসরণের যোগ্য নয়। সুতরাং তাদেরকে অনুসরণ করুন।

সে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাদেরকে অনুসরণ করবো কিন্তু নবীর (সাঃ) সাহাবাদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলবো না।

হুসাইন ঃ সাহাবাদের ব্যাপারে আপনার কোন খারাপ কথা বলার দরকার নেই।

কিন্তু যখন নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের মর্যাদা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তাদের শত্রুদের ব্যাপারে কি বলবেন?

সে ঃ আমি নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের শত্রুদেরকে ঘৃণা করি।

হুসাইন ঃ আপনার এতটুকু বলাতেই আমার কাছে যথেষ্ট।

এ সময় সে আল্লাহ্‌র একাত্ববাদের, নবীর (সাঃ) রিসালতের এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তাগণের উপর সাক্ষ্য দিয়ে বলল ঃ আমি তাদের প্রেমীক এবং অনুসারী, আর তাদের শত্রুদেরকে ঘৃণা করি।

তারপর সে আমার কাছে শিয়া মাযহাবের ফীকাহ্‌ শাস্ত্রের বই চাইলো। আমি তাকে মুহাক্কিক হিল্লির লেখা মুখতাছারুন নাফে' (শারহুস সারায়ে') বইটি তার হাতে তুলে দিলাম।

৭৬- সাহাবাদের বিরুদ্ধে কটু কথা বলা নিয়ে আরেকটি মুনাযিরাহ

শেইখ হুসাইন ইবনে আব্দুস সামাদ বলেন ঃ কিছু দিন পরে সুন্নী মাযহাবের যে ব্যক্তি শিয়া হয়েছিল তার সাথে দেখা হল। তাকে দেখে বুঝতে পারলাম যে, তিনি খুব চিন্তার মধ্যে আছেন। তার অন্তরে এ প্রশ্নটি পীড়া দিচ্ছিল যে, নবীর (সাঃ) সাহাবাদের মর্যাদা অনেক উচ্চে কিন্তু তাদের ব্যাপারে শিয়ারা খারাপ কথা বলে কেন?

তাকে বললাম ঃ যদি আপনি ইনসাফ দিয়ে বিচার করেন এবং আমার কথাটি গোপন রাখেন, তবে আমি আপনার কাছে তাদের ব্যাপারে কেন কটু কথা বলা হয়ে থাকে তা দলিলের মাধ্যমে তুলে ধরবো।

তিনি আমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলল যে, জীবিত থাকা পর্যন্ত এ কথা কাউকে বলবেন না এবং ইনসাফ দিয়ে বিচার-বিবেচনা করবেন। আর আমার কথাগুলো গোপন রাখবেন।

তখন তাকে বললাম ঃ আপনার দৃষ্টিতে যে সাহাবারা উসমানকে (তৃতীয় খলিফা) হত্যা করেছিল তারা কেমন?

তিনি ঃ যে সাহাবারা উসমানকে হত্যা করেছিল তারা তাদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে সে কাজ করেছিল। সে কারণে তারা গোনাহ্গার নয়। আমাদের আলেমগণ এরূপই বলেছেন।

হুসাইন ঃ আপনি আ'য়েশা, তালহা ও যুবাইরের ব্যাপারে কেমন মন্তব্য করবেন, যারা সেদিন ইমাম আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে জাঙ্গে জালাম (উষ্ট্রের যুদ্ধ) সংঘটিত করেছিল এবং এই যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষের সর্বমোট প্রায় ১৬ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল?

আর একইভাবে মুয়া'বিয়া এবং যে সকল সাহাবা ইমাম আলীর (আঃ) সাথে সিফ্ফিনের যুদ্ধ করেছিল এবং সেই যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষের সর্বমোট প্রায় ৬০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। এ ব্যাপারেও আপনার মন্তব্য কি?

তিনি ঃ এই যুদ্ধগুলোও উসমান হত্যার মতই ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়েছিল।

হুসাইন ঃ ইজতিহাদ করা কি মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি দলেরই অধিকার আছে বা অন্য দলের কোন অধিকার নেই?

তিনি ঃ না, এরূপ নয়। বরং সকল দলেরই সমান অধিকার রয়েছে।

হুসাইন ঃ যখন ইজতিহাদের ভিত্তিতে বড় বড় সাহাবাকে ও মু'মিনদের খলিফাকে হত্যা করা, ভাইয়ের সাথে ও নবীর (সাঃ) কন্যার স্বামী ইমাম আলীর (আঃ) সাথে যুদ্ধ করা জায়েয হয়, অর্থাৎ যার ইল্ম, তাকওয়াকে রাসূলে খোদা (সাঃ) অন্যদের থেকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন, যার তলোয়ারের ঝংকারে ইসলাম বিজয় লাভ করেছে, যা কারো

পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয় এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে তাকে তাঁর অলি (পরিচালক বা নেতা) বলে সম্বোধন করেছেন ঃ

انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ....

- তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তাদের অলি হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং যারা পূর্বেই ঈমান এনেছে (মায়েদাহ্ ঃ ৫৫)।

এই আয়াতে "আল্লাযিনা আ-মানু" বলতে আলীকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। কেননা ইসলামের আলেমগণ এই "ওয়াল্লাযিনা আ-মানু" বাক্যটি যে ইমাম আলীর (আঃ) ব্যাপারে বলা হয়েছে তাই বলেছেন[১]।

এ প্রসঙ্গে আরো রেওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি কোন কোন সাহাবার ব্যাপারে খারাপ কথা বলা (আপনার উক্তি মোতাবেক) জায়েয হয়ে থাকে তবে কেন অন্য সাহাবাদের ব্যাপারে তা জায়েয হবে না?!

আমরা কারো ব্যাপারেই খারাপ কথা বলি না। কিন্তু যদি কারো

ব্যাপারে জানতে পারি যে, তারা নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতা পোষণ করে তবে তাদের ব্যাপারে আমরা উপযুক্ত কথা বলে থাকি। কিন্তু যারা তাঁর আহ্লে বাইতকে ভালবাসে আমরা তাকে ভালবেসে থাকি, যেমন ঃ সালমান, মিকদাদ, আম্মার, আবুযার ও আরো অনেকে। আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে চাই। আর সাহাবাদের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস!

কটু কথা বলা বা গালাগাল করাটা এক ধরণের ঘৃণা পোষণ করা বা অভিষাপ দেয়ার মত। যদি আল্লাহ্ চান তবে তা গ্রহণ করবেন আর যদি না চান গ্রহণ করবেন না। তদ্রুপ সাহাবাদের রক্ত ঝরানোটাকেও।

মুয়া'বিয়াই আলী (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপরে গালাগাল করেছে ও তাদের ব্যাপারে কটু কথা বলেছে। আর এমনটি করা ও বলাকে নবীর (সাঃ) সুন্নত হিসেবে স্থান দিয়েছে। বনি উমাইয়্যারা তাদের ৮০ বছরের খেলাফতকালে এই সুন্নতকে প্রচলিত করেছে। কিন্তু তারপরও আলীর (আঃ) শান ও মর্যাকে কম করতে পারে নি।

এরূপ শিয়ারাও রিসালাতের বংশের শত্রুদের ব্যাপারে নিজেদের ইজতিহাদ মোতাবেক কটু কথা বা গালাগাল করে থাকে তাই বলে গোনাহ্ তো করে নি।

---

[১]। মুফাস্সিরগণ উক্ত আয়াতের বিষয়ে ঐক্য মত পোষণ করেন যে, তা আলীর (আঃ) ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর তা নাযিল হয়েছে ঐ সময় যখন তিনি নামাযের মধ্যে রুকু অবস্থায় ছিলেন এমন সময় ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে তিনি রুকুতে থাকা অবস্থায় নিজের হাতের আংটিটি খুলে নেয়ার জন্য ভিক্ষুককে ইশারা করেন। এই বিষয়টি সুন্নী মাযহাবের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, যেমন ঃ যাখায়েরুল উ'কবা, পৃঃ-৮৮, ফাত্হুল গাদীর, খণ্ড-২, পৃঃ-৫০, আসবাবুন নুযুল ওয়াহিদা, পৃঃ-১৪৮, কানযুলুল উ'ম্মাল, খণ্ড-৬, পৃঃ-৩৯১, ইহ্কাকুল হাক্ক, খণ্ড-২, পৃঃ-৩৯৯ থেকে ৪১০ এবং .... ।

ব্যাখ্যা ঃ নবীর (সাঃ) সাহাবাগণ কয়েক ধরনের ছিলেন। কেউ কেউ ছিল প্রশংসাযোগ্য আবার কেউ কেউ ছিল মুনাফিক। আমাদের ইজতিহাদ, নবীর (সাঃ) মুনাফিক সাহাবাদের ব্যাপারে গালাগাল করার অনুমতি দিয়ে থাকে ।

তিনি ঃ দলিলহীন ইজতিহাদ কি প্রযোজ্য?

হুসাইন ঃ আমাদের মুজতাহিদদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে।

তিনি ঃ সে সকল দলিল-প্রমাণের একটি আমাকে বলুন দেখি?

হুসাইন ইবনে আব্দুস সামাদ, বিভিন্ন দলিল তার সামনে তুলে ধরলো। তার মধ্যে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ঃ হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) কষ্ট দেয়ার বিষয়টির সাথে পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবের ৫৭ নং আয়াতটি পাঠ করলো যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة

- যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন [১] ।

---

[১] । আল্ মুনাযিরাহ্ -শেইখ হুসাইন বিন আব্দুস সামাদ।

৭৭- আয়াতে রেযওয়ান ও সাহাবাদের ব্যাপারে পর্যালোচনা

আমার ঠিক মনে আছে যে, একজন শাফেয়ী' মাযহাবের আলেম যিনি আয়াত ও রেওয়ায়েতের ব্যাপারে বেশ জ্ঞান রাখতেন তার মুখামুখি হয়েছিলাম। তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগটি এরূপে বয়ান করলেন ঃ

'শিয়ারা নবীর (সাঃ) সাহাবাদের ব্যাপারে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে থাকে যা কোরআনের বিপরীত। কেননা কোরআনের আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের ব্যাপারে যে রাজি আছেন উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ যাদের উপর রাজি ও খুশি আছেন তাদের ব্যাপারে অবশ্যই বাজে কথা বলা অনুচিৎ।

আর ঐ আয়াতটি হচ্ছে সূরা ফাতহ্-এর ১৮ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل الله السكينة عليهم و اثابهم فتحاً قريباً

- আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ সব মু'মিনদের উপর রাজি ও খুশি আছেন যারা তোমার সাথে গাছের নিচে বাইয়াত করেছিল। আর আল্লাহ্ তাদের অন্তরে যে সকল না বলা কথা (ঈমান ও সত্যতা) আছে তাও জানেন। তাই তাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন। আর পুরস্কার হিসেবে তাদের প্রতি বিজয় ঘটিয়েছেন।

এই আয়াতটি ঐ সময় নাযিল হয়েছিল যখন নবী (সাঃ) ষষ্ঠ হিজীরর যিলহাজ্জ মাসে প্রায় এক হাজার চারশত মুসলমানকে সাথে নিয়ে মক্কায় হজ্জ করার জন্য রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গী যেমন আবু বকর, ওমর, উসমান, তালহা, যুবাইর, আলী (আঃ) ও আরো অনেকে ছিলেন। কিন্তু যখন কাফেলা আ'সফান নামে বিশ্রাম নেয়ার একটি স্থানের নিকটবর্তী হল তখন খরব আসলো যে, মুশরিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুসলমানদের মক্কায় ঢুকতে দিবে না। নবী (সাঃ) সবাইকে "হুদাইবিয়া" নামক একটি স্থানে যা ছিল মক্কার থেকে ২০ কিলোমিটার দুরে, একত্রি হতে বললেন যাতে করে ঘটনাটি পরিস্কার হয়ে যায়।

তারপর তিনি উসমানকে তাদের সাথে আলোচনা করার জন্য পাঠালেন। উসমান গেল এবং অনেকক্ষণ তার কোন খবর পাওয়া গেল না। কেউ কেউ বলল, মুশরিকরা হয়তো তাকে হত্যা করেছে। তখন তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং সবার নিকট থেকে একটি গাছের নিচে পূণরায় বাইয়াত গ্রহণ করলেন। যা বাইয়াতে রেযওয়ান নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি মুসলমানদের সাথে সংকল্প করলেন যে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত

মুশরিকদের সাথে লড়াই করবেন। কিন্তু এই বাইয়াতের খানিক পরেই উসমান ফিরে এলো। আর এই বাইয়াতের খবর মুশরিকদেরকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। তারা সাহিল ইবনে ওমরকে নবীর (সাঃ) সাথে সন্ধি করার জন্য পাঠালো। অবশেষে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সাক্ষরিত হল। আর সিদ্ধান্ত হল যে, মুসলমানগণ এ বছর মক্কা যিয়ারতে না এসে পরের বছর আসবেন[১]।

এই মূহুর্তে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা বাইয়াতকারীদের উপর সন্তুষ্ট প্রকাশ করলেন।

সুতরাং যে সাহাবাদের উপর আল্লাহ্ তা'য়ালা রাজি ও খুশি থাকেন অবশ্যই তাদের ব্যাপারে কটু করা বলা উচিৎ নয়!!

লেখকের কথা ঃ

প্রথমতঃ এই আয়াতটি তাদের জন্যেই প্রযোজ্য যারা সেদিন বাইয়াতে অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যদের ব্যাপারে নয়।

দ্বিতীয়তঃ এই আয়াতটি ঐ সময়ে উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল তাদের ব্যাপারে ধরা হবে না। যেমন ঃ আব্দুল্লাহ্ উবাই ও আউস ইবনে খাউলী ও ....। কেননা তারা মু'মিন ছিল না।

তৃতীয়তঃ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ সময় যারা বাইয়াত করেছিল তাদের উপর রাজি ও খুশি হয়েছিলেন কিন্তু এমন নয় যে, তিনি তাদের উপর সব সময় রাজি ও খুশি থাকবেন।

আর এই কারণে কোরআনের ১০ নং সূরায় পড়বো যে,

فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيماً

- যারা ওয়াদা ভঙ্গ করবে, তারা তা ভঙ্গ করে নিজেদের ক্ষতি করলো। আর যারা আল্লাহ্র সাথে যে বিষয়ে ওয়াদ করেছে তা রক্ষা করে, তাদের জন্য রয়েছে বড় ধরনের পুরস্কার।

এই আয়াতের দৃষ্টিতে কারো কারো পক্ষে ওয়াদা ভঙ্গ করার সম্ভাবনাও রয়েছে। যা পরবর্তীতে অনেকের ব্যাপারে প্রকাশ পেয়েছিল।

সুতরাং উক্ত আয়াতটি (আয়াতে রেযওয়ান) কাল কিয়ামত পর্যন্ত বাইয়াতকারীদের উপর আল্লাহ্ যে, রাজি ও খুশি থাকবেন তা প্রমাণ করে না। বরং তাদের মধ্যে দুই দল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে যে, একদল তাদের ওয়াদার

---

[১]। তারিখে তাবারীর সারাংশ, খণ্ড-২, পৃঃ-২৮১।

বরখিলাপ করবে না কিন্তু অন্য দল তা করবে।

আমরা শিয়ারা, তাদের ব্যাপারে যারা তাদের ওয়াদা রক্ষা করে নি তারা ঐ আয়াতের (আয়াতে রেযওয়ানের) পরিসীমা থেকে বের হয়ে গেছে। তাই তাদের ব্যাপারে অভিযোগও করে থাকি। আর এর জন্য এই আয়াতটি আমাদের পথ রোধ করবে না।

*****

কবরের পাশে বসার ব্যাপারে মুনাযিরা

মদীনায় আ'মিরিণ বে মা'রুফের প্রধান একজন শিয়া আলেমকে বলল ঃ আপনারা কেন কবরের পাশে বসেন, কেননা তা তো হারাম কাজ?

শিয়া আলেম ঃ যদি কবরের পাশে বসা হারাম হয়ে থাকে তবে বলতে হয় যে, মক্কায় হিজরে ইসমাঈলের পাশে বসাও হারাম। কেননা সেখানে নবীগণ ও ইসমাঈল এবং তার মা দাফন হয়ে আছেন। যদিও এখনো এমন ফতোয়া কেউ দেয় নি।

আর এ দিক দিয়ে প্রচুর হাদীস রয়েছে যে, কবরের পাশে বসাতে কোন সমস্যা নেই। যেমন সহীহ্ বুখারীতে যা আপনাদের দৃষ্টিতে হচ্ছে কোরআনের মতই সম্মানীয়। তাতে ইমাম আলীর (আঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, বাকী কবরস্থানে বসে ছিলাম সেখানে নবী (সাঃ) আসলেন এবং বসলেন তারপর তিনি কবরের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ প্রতিটি ব্যক্তিরই দুইটি স্থান রয়েছে একটি হচ্ছে বেহেশ্ত আর অপরটি হচ্ছে দোযখ[১]।

এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে নবী (সাঃ) নিজে বাকী কবরস্থানে কবরের পাশে বসেছেন এবং সেখানে যারা বসে ছিলেন তাদেরকে বসতে নিষেধ করেন নি[২]।

---

[১]। সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-২, পৃঃ-১৩০।

[২]। মুনাযিরাতু ফিল হারামাইনিশ শারিফাইনি, এই বইয়ের ১৩ নং মুনাযিরাহ্।

৭৮- আ'শারাহ্ মুবাশ্শারাহ্র ব্যাপারে মুনাযিরা

আহ্লে সুন্নতের রাবীগণের মধ্যে বিশেষ করে আহ্মাদ ইবনে মুসনাদ (খণ্ড-১, পৃঃ- ১৯৩) নিজেই আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

ابوبكر في الجنة، و عمر في الجنة، و علي في الجنة، و عثمان في الجنة، و طلحة في الجنة، و الزبير في الجنة، و عبد الرحمان بن عوف في الجنة، و سعد بن ابي وقاص في الجنة، و سعيد بن زيد في الجنة، و ابوعبيدة ابن الجراح في الجنة

- অর্থাৎ এই দশজন ব্যক্তি হচ্ছে বেহেশতবাসী ঃ ১- আবু বকর, ২- ওমর, ৩- আলী (আঃ), ৪- উসমান, ৫- তালহা, ৬- যুবাইর, ৭- আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, ৮- সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৯- সাঈদ বিন যাইদ, ১০- আবু উ'বাইদাহ্ ইবনে জার্‌রাহ্[১]-[২]।

আহ্লে সুন্নাত এই জাল হাদীসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর এই দশজনের নামসমুহকে "আ'শারাহ্ মুবাশ্শারাহ্" (যে দশজনকে বেহেশতবাসী হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে) পবিত্র স্থান যেমন মসজিদুন্নবীর দেয়ালে লাগিয়ে রেখেছে। আর এই বিষয়টি তাদের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে এই বিষয়ের উপর একটি মুনাযিরা লক্ষ্যনীয় ঃ

একজন শিয়া আলেম বলেন ঃ মদীনায় কোন একটি কাজের জন্য আ'মিরিণ বে

---

[১]। সহীহ্ তিরমীযি, খণ্ড-১৩, পৃঃ- ১৮২, সুনানে আবি দাউদ, খণ্ড-২, পৃঃ-২৬৪।

[২]। এই হাদীসটি সা'ঈদ ইবনে যাইদের উদ্ধৃতি দিয়ে সামান্ন পার্থক্য সহকারে উল্লেখ হয়েছে দেখুন ঃ আল্ গাদীর, খণ্ড-১০, পৃঃ-১১৮।

মারুফের দফতরে গিয়েছিলাম। ঐ দফতরের প্রধানের সাথে আলোচনা করতে করতে আ'শারাহ্ মুবাশ্শারাহ্র বিষয়ে কথা উঠলো।

বললাম ঃ আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে।

প্রধান ঃ বলুন।

শিয়া আলেম ঃ এটা কিভাবে সম্ভব যে, দুইজন বেহেশ্তবাসী একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে? তালহা ও যুবাইর যারা ঐ দশজনের মধ্যে আছে তারা আ'য়েশার ছত্র ছায়ায় আলী ইবনে আবি তালিবের (আঃ) বিরুদ্ধে (তিনিও হচ্ছেন বেহেশতবাসী) বসরায় জাঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) সূচনা করে এবং যার কারণে বহু লোক নিহত হয়েছে?

যখন কোরআন বলছে যে,

و من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها

- যদি কেউ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে তার শাস্তি হচ্ছে দোযখ আর সে চির দিনের জন্য সেখানে থাকবে (হাক্কা ঃ ৪৪)।

এই আয়াতের দৃষ্টিতে যারা সে দিন যুদ্ধ শুরু করেছিল তারা অবশ্যই দোযখে যাবে। কেননা তাদের কারণে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

অতএব, বিচক্ষণতার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বুঝা যায় উক্ত আ'শারাহ্ মুবাশ্শারা হাদীসটি হচ্ছে জাল হাদীস।

প্রধান ঃ যারা সে দিন যুদ্ধ করেছিল তারা হচ্ছে মুজতাহিদ। তাই তারা তাদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় দিয়েছিল। সে কারণে তারা উপায়হীন ছিল।

শিয়া আলেম ঃ নবীর (সাঃ) উক্তির বিপক্ষে ইজতিহাদ করা জায়েয নয়। আর যেহেতু তিনি বলেছেন, যা সকল মুসলমান গ্রহণ করে থাকে ঃ

يا علي حربك حربي، و سلمك سلمي

- হে আলী! তোমার সাথে যুদ্ধ করা মানেই আমার সাথে যুদ্ধ করা আর তোমার সাথে সন্ধি করা মানেই আমার সাথে সন্ধি করা[১]।

আরো বলেছেন ঃ

---

[১]। মানাকিবে ইবনে মাগাযিলি, পৃঃ-৫০, মানাকিবে খাওয়ারিযমী, পৃঃ- ৭৬ ও ২৪।

من اطاع علياً فقد اطاعني، و من عصى علياً فقد عصاني

- যে আলীকে (আঃ) আনুগত্য করবে সে যেন আমাকে আনুগত্য করলো। আর যে আলীর (আঃ) সাথে বিরোধীতা করবে সে যেন আমার সাথে বিরোধীতা করলো [১]।

এবং আরো বলেছেন ঃ

علي مع الحق و الحق مع علي، يدور الحق معه حيثما دار

- আলী (আঃ) সত্যের সাথে এবং সত্য তাঁর সাথে। যেখানেই আলী (আঃ) থাকবে সত্যও সেখানেই থাকবে[২]।

সুতরাং আমাদের হাতে ফলাফল এটই দাড়ায় যে, ঐ যুদ্ধের এক পক্ষ হচ্ছে হক্ব আর তিনি হচ্ছেন আলী (আঃ) এবং অন্য পক্ষ হচ্ছে বাতিল। অতএব, আ'শারাহ্ মুবাশ্শারাহ্ হাদীসটি হচ্ছে মিথ্যা হাদীস কেননা বাতিল পক্ষকে কখনো বেহেশ্তবাসী বলা যায় না।

আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই হাদীসের রাবী হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ আর সেও ঐ দশজনের একজন। সে এমন এক ব্যক্তি যে, ওমরের ইন্তেকালের পর তার তৈরীকৃত শুরার আলোচনায় আলীর (আঃ) উপর চড়াও হয়ে বলেছিল যে, বাইয়াত কর তা না হলে হত্যা করা হবে। আর এই আব্দুর রহমানই উসমানের সাথে বিরোধীতা করেছে। আর উসমান তাকে মুনাফিক বলেছিল। তাহলে কি এমন পরিস্থিতিতে উক্ত রেওয়ায়েত সঠিক বলে মনে হয়?

আবু বকর ও ওমরকে কি বেহেশ্তবাসী হওয়ার সু-সংবাদ দেয়া হয়েছিল? কেননা তারা তো হযরত ফাতিমা (সালাঃ) ওফাতের কারণ। আর এ কারণে হযরত ফাতিমা (সালাঃ) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সাথে কথা বলেন নি।

ওমর কি আলীকে (আঃ) আবু বরকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য ভয় দেখায় নি? সে কি বলে নি যে, যদি বাইয়াত না কর তবে হত্যা করা হবে?

আর তালহা ও যুবাইর উসমানকে হত্যা করার জন্য কি পীড়াপীড়ি করে নি? তারা

---

[১]। কানযুল্ল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃঃ-১৫৭, আল ইমামাতু ওয়াস সাইয়াসাহ্, পৃঃ-৭৩, মাজমায়ু'য যাওয়াইদ হাইছামী, খণ্ড-৭, পৃঃ-২৩৫ ও ....।

[২]। কানযুল্ল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃঃ-১৫৭, আল ইমামাতু ওয়াস সাইয়াসাহ্, পৃঃ-৭৩, মাজমায়ু'য যাওয়াইদ হাইছামী, খণ্ড-৭, পৃঃ-২৩৫ ও ....।

কি ইমামকে আনুগত্য করা থেকে বের হয়ে যায় নি? তারা কি জাঙ্গে জামালে ইমাম আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে তুলে নেয় নি?!

ঐ দশজনের আরো একজন হচ্ছে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস। সে এই আ'শারাহ্ মুবাশ্‌শারাহ্ হাদীসটিকে সত্য বলেছে। কিন্তু যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, উসমানকে কে হত্যা করেছে? তখন সে ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলে ঃ আ'য়েশা যে তলোয়াকে উম্মুক্ত করেছে এবং তালহা যে তলোয়ারকে ধার দিয়েছে, সেই তলোয়ার দিয়ে উসমান হত্যা হয়েছে।

উক্ত দশজনের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের শত্রুতা ছিল। তাহলে কিভাবে বলা যায় যে, তারা সকলেই বেহেশ্‌তবাসী? অবশ্যই তা বলা যায় না।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে পরিস্কার হয়ে গেছে যে, উক্ত হাদীসটি হচ্ছে মিথ্যা। কেননা যে দু'জনকে উক্ত হাদীসের রাবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ, যার উল্লেখিত সনদের ধারাবাহীকতা সম্পৃক্ত নয়। আর সে কারণেই তা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। অন্যজন হচ্ছে সাঈদ ইবনে যাইদ, সে মুয়া'বিয়ার খেলাফতের সময় হাদীস বর্ণনা করতো। সুতরাং এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে এই হাদীসের মধ্যে মুয়া'বিয়ার পাপি হাত লাগানো হয়েছে। অতএব, আ'শারাহ্ মুবাশ্‌শারাহ্ হাদীসটি সনদের দিক থেকে একেবারেই ভিত্তিহীন এবং অনির্ভরযোগ্য[১]।

---

[১]। আল্ গাদীর কিতাবরে ব্যাখ্যা নামাক গ্রন্থ, খণ্ড-১০, পৃঃ- ১২২ থেকে ১২৮।

৭৯- কবরের উপর অর্থ ফেলা

বাকী কবরস্থানে একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে যে, لا يجوز رمي النقوذ على القبور - কবরের উপর অর্থ ফেলা জায়েয নয়।

একদিন আ'মিরিণ বে মারুফ দফতরের প্রধান সেখানে এসে আমাকে দেখতে পেল। আর তখন কয়েকটি কবরের উপ অর্থ ছিটানো ছিল। সে আমার দিকে ফিরে বললঃ এই অর্থগুলো ফকিরকে দেবেন, কেননা কবরের উপর অর্থ দেয়া হচ্ছে হারাম।

শিয়া আলেম ঃ কোন দলিলের ভিত্তিতে বলছেন যে, কবরের উপর অর্থ দেয়া হচ্ছে হারাম। কোরআনে অথবা নবী (সাঃ) কি নিষেধ করেছেন?

রাসূলে খোদা বলেছেন ঃ সব কিছুই জায়েয শুধুমাত্র যা নিষেধ করা হয়েছে তা ব্যতীত। কবরের উপর অর্থ দেয়াটা নিষেধ করা হয় নি।

প্রধান ঃ কোরআন বলছে ঃ انما الصدقات للفقراء - ছদকা হচ্ছে অসহায় লোকদের জন্য (তওবা ঃ ৬০)।

শিয়া আলেম ঃ এই অর্থগুলোকেও তো কবরস্থানের গরীব চৌকিদাররাই নিয়ে থাকে।

প্রধান ঃ চৌকিদাররা ফকির নয়।

শিয়া আলেম ঃ এটা শর্ত নয় যে তাদেরকে অবশ্যই ফকির হতে হবে। কেননা সাহায্য ও দানের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন নেই যে, যাকে সাহায্য বা দান করা হবে তাকে অবশ্যই ফকির হতে হবে। যদি কোন সৎ উদ্দেশ্যের কারণে নিজের সমস্ত সম্পত্তিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোন ধ্বনি ব্যাক্তিকেও দেয়া হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই। যেমন বিয়ের সময় বর ও কনের মাথার উপর সবাই অর্থ ছিটায়। আর সেই অর্থগুলো যারা একত্রিত করে থাকে তারা ফকির নয়। এখানে যে আয়াতটি পাঠ করেছেন, সেখানে ছদকা ব্যবহারের জন্যে সাতটি পন্থা বলা হয়েছে যার একটি হচ্ছে "ফি সাবিলিল্লাহ্‌"।

আর যখন মুসলমান আল্লাহ্‌র আউলিয়াগণের কবরের পাশে যায় এবং অর্থ ছিটায়

তখন বলে থাকে যে, আমার জান ও মাল তোমার জন্য উৎসর্গ হোক। আর তা তাদের প্রতি এক ধরনের ভালবাসা প্রকাশের মাধ্যম। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ভালবাসার কারণে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেয় তাতে শরীয়তগত ও সামাজিকভাবে কি সমস্যা রয়েছে?!

আল্লাহ্ তা'য়ালা দলিলহীনভাবে হারম ও হালাল করাকে নিষেধ করেছেন। যেমন সূরা নাহ্‌লের ১১৬ নং আয়াতে পড়ে থাকি ঃ

و لا تقولوا لما تصف السبتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب

- যেহেতু তোমাদের কণ্ঠসমূহ মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তাই তোমরা বলো না কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম, যাতে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ না দিতে পারো।

আল্লাহ্ কি আপনাকে এই অনুমতি দিয়েছে যে, নিজেরা আইন তৈরী করবেন? আর যা আপনাদের দৃষ্টিতে সঠিক নয় তা হারাম অথবা বিদয়া'ত অথবা শির্‌ক মনে করবেন। আপনারা বিদায়া'তের বিরুদ্ধে লড়াই করার নাম নিয়ে যে কোন হালালকে হারাম করে থাকেন। আর এটা জানেন না যে, হালালকে হারাম করাটাও হচ্ছে এক ধরনের বিদয়া'ত। তাই যারা এরূপ চিন্তা করে থাকেন তাদের জানা উচিৎ যে, উপরোল্লিখিত আয়াতের পরে পড়ে থাকবো ঃ

ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

- যারা আল্লহ্‌র প্রতি মিথ্যা বলে তারা কখনোই মুক্তি পাবে না।

৮০- ডান ও বাম থেকে শির্ক শব্দ শোনা যায়

সৌদি আরবের চারদিক থেকে যে শব্দটিটি সদা সর্বদা শোনা যায় তা হচ্ছে "শির্ক"। আ'মিরিণ বে মারুফ দফতরটি যে কোন ধরনের ছোট্ট বিষয়ের ব্যাপারেও "শির্ক" শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। এমন বলা যেতে পারে যে, তাদের দেশে "শির্ক" শব্দটি ছাড়া অন্য কোন শব্দই নেই। তারা শুধুমাত্র তা বলেই চুপ হয় না বরং শিয়া আলেমগণের লেখা বিভিন্ন মুল্যবান গ্রন্থসমূহতেও তির বিদ্ধ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপঃ

উস্তাদ শেইখ মুহাম্মদ হুসাইন মুযাফ্ফার (রহঃ) নামে একজন শিয়া আলেম তার বইতে এরূপ লিখেছেন ঃ

فكانت الدعوة للتشيع لأبي الحسن عليه السلام من صاحب الرسالة تمشي منه جنباً اجنبِ مع الدعوة للشهادتين

- আল্লাহ্র তৌওহীদ ও নবীর (সাঃ) রিসালাতের প্রতি দাওয়াত করার সাথে সাথে আবুল হাসানকে (আঃ) আনুগত্য করার দাওয়াতও দিয়ে বেড়িয়েছিলাম।

ওয়াহাবীদের একজন লেখক তার লেখা "আশ্শিয়া ওয়াত্ তাশাইয়্যো" নামে এক বইতে উক্ত বাক্যটিকে এরূপ অর্থ করেছে ঃ

ان النبي حسب دعوى المظفري كان يجعل علياً شريكا له في نبوت و رسالت

- রাসূল (সাঃ) মুযাফ্ফারের কথা অনুযায়ী আলীকে (আঃ) নিজের রিসালাত ও নবুওয়াতের সাথে শরিক করেছিল [১]।

---

[১]। আশ্শিয়াহ্ ওয়াত্তাশাইয়্যো, পৃঃ-২০।

এ পর্যায়ে ঐ লেখকের সাথে আমাদের মুনাযিরা

যদি এই ওয়াহাবী লেখক তার নফসে আম্মারার (খারাপ নফ্‌স) হাতে বন্দি না হত এবং নিজেকে ওয়াহাবীদের হাতে বিক্রি না করতো, সাথে সাথে শিয়া মাযহাবের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত থাকতো তাহলে এরূপ হাস্যকর অভিযোগ তুলে ধরতো না।

যদি এরূপ দাওয়াত শির্‌ক হয়ে থাকে অথবা রিসালাতের সাথে শরিক করা বুঝিয়ে থাকে তবে এর পূর্বে কোরআন অনুরূপ কাজের আঞ্জাম
দিত না। কেননা সূরা নিসার ৫ নং আয়াতে আমরা পড়ে থাকি ঃ

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

- আনুগত্য কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর তাঁর রসূলকে আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা নির্দেশ দানে ক্ষমতা অর্জন করেছে।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশে "উলিল আমর" কথাটি এসেছে। যদিও এই উলিল আমরের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছেন আলী (আঃ) যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

তাহলে কি এখন বলবো যে, রাসূলে খোদা (সাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে তৌওহীদের প্রতি দাওয়াত না করে শির্‌কের প্রতি দাওয়াত করেছেন?!

আর রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দেয়ার সাথেই ইমাম আলীর (আঃ) ইমামতের প্রতি দাওয়াত দেয়ার কারণ হচ্ছে তা একটি অতিব প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। আর তা ছিল রাসূলের (সাঃ) পরে ইমাম আলীর (আঃ) ইমামতের প্রচার স্বরূপ। নবী (সাঃ) নিজেও বিভিন্ন সময়ে তা করেছেন। সে সূত্রে তা শির্‌কের সাথে কোন প্রকার সম্পর্কই রাখে না এবং রিসালাতের সাথেও।

যখন সূরা শুয়ারার ২১৪ নং আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

و انذر عشيرتك الاقربين

- নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত কর।

তখন নবী (সাঃ) নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করলেন। আর সেই দাওয়াতের অনুষ্ঠানে নিজের নবুওয়াতের কথা ঘোষণা দিলেন এবং আরো বললেন ঃ

فايكم يوازرني على هذا الامر على ان يكون اخى و وصيي و خليفتي فيكم

- তোমাদের মধ্যে কে আমাকে আমার এই কাজে সহযোগীতা করেব, যাতে করে তোমাদের মধ্যে সে আমার ভাই, ওয়াসি ও স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

তখন আলী (আঃ) ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর কথায় সাড়া দেয় নি। তিনি উক্ত কথাটিকে আরো দুইবার উচ্চারণ করলেন এবং আলী (আঃ)

ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে উত্তর শুনতে না পাওয়ায় বললেন ঃ

ان هذا اخى و وصيى و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوه

- তোমাদের মধ্যে এ হচ্ছে আমার ভাই, ওয়াসি এবং আমার স্থলাভিষিক্ত, তার কথা শুনে চলবে এবং তাকে আনুগত্য করবে[১]।

শিয়ারা এই ইতিহাসের ভিত্তিতে বলে থাকে যে, নবী (সাঃ) নিজের দায়িত্বকালে তৌওহীদ ও রিসালাতের প্রতি দাওয়াত করেছেন। আর সাথে সাথে আলীর (আঃ) খেলাফতের প্রতিও দাওয়াত দিয়েছেন।

এখন কি এটা বলা ঠিক হবে যে, শিয়ারা বলে থাকে ঃ নবী (সাঃ) আলীকে (আঃ) নবুওয়াত ও রিসালাতের সাথে শরিক করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আর নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পরে যদি কেউ আলীর (আঃ) খেলাফতের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকে তবে কি তার অর্থ এই, তারা নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছে?[২] নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পরে আলীর (আঃ) খেলাফতের প্রতি দাওয়াত দেয়াটা কি নবুওয়াত ও রিসালাতের সাথে শরিক করা? এগুলো বলা কি নিতান্তই বে-ইনসাফী নয়?!

---

[১]। এই "ইয়ামুল আনযার" হাদীসটির বিভিন্ন সনদও হচ্ছে যেমন ঃ তারিখে তাবারী, খণ্ড-২, পৃঃ-৬৩, তারিখে ইবনে আছির, খণ্ড- ২, তারিখে আবুল ফিদা', খণ্ড-১, এবং আরো বেশী জানার জন্য লক্ষ্য করুণ ঃ ইহকাকুল হাক্ব, খণ্ড-৪, পৃঃ-৬২ পর থেকে।

[২]। 'আইনে ওয়াহাবীয়াত' কিতাব থেকে ইকতিবাস, পৃঃ-১২ থেকে ১৪।

৮১- হজ্জের বিষয় নিয়ে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ ইসলামী বিপ্লবের পরে যে বিষয়টি নিয়ে ইরানে বেশী আলোচনা হয়েছিল তা হচ্ছে হজ্জের বিষয়। ইমলামী ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী (রহঃ) বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হজ্জ সম্পর্কিত ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, হজ্জ হচ্ছে দুই ধরনের একটি হচ্ছে হজ্জে ইব্রাহীমি আর অপরটি হচ্ছে আবু জাহেলী হজ্জ। হজ্জ শুধুমাত্র একটি ইবদাতই নয় বরং তা একটি জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

এই ঘোষণা পত্রের কারণে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে হজ্জের নতুন ব্যাখ্যা প্রণদিত হল। সেখানে মুশরিকদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হল। তথপিও ইমাম খোমেনীর (রহঃ) দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

আর ওদিকে হিজাজের দরবারী আলেমরা এই ঘোষণা পত্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো। তাদের কথা ছিল হজ্জ হচ্ছে নিছক একটি ইবাদতী বিষয় এবং যে কোন ধরনের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে মুক্ত। যদিও কোরআন বলেছে ঃ

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس

- আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর এই সম্মানিয় ঘরকে মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে কিয়াম করার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন (মায়েদাহ্ ঃ ৯৭)।

এখানে আমরা কিয়ামের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার চেষ্টা করবো যে, মুসলমানগণ অবশ্যই কা'বার ছত্র ছায়ায় তাদের যে কোন ধরনের অভাব-অভিযোগের সমাধান দিবে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য একে একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্ধরাণ করবে। নিম্নের মুনাযিরাটি এই বিষয়কে কেন্দ্র করে, দয়া করে লক্ষ্য করুন ঃ

দরবারী আলেম ঃ এই বিদয়া'তসমূহ কি, যা হজ্জের নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রবেশ করানো হচ্ছে? হজ্জ হচ্ছে রাজনীতি ও যে কোন ধরনের ঝুট ঝামেলা মুক্ত একটি ইবাদতী কর্মসূচী। আর তা হচ্ছে নিছক আত্মার পরিশুদ্ধি বৈ অন্য কিছুই নয়। তাকে যেন আমরা জিন্দাবাদ ও মুর্দবাদ শ্লোগানের সাথে সম্পৃক্ত না করি। হজ্জে ইব্রাহীমি ও হজ্জে আবু জাহেলী, এ সব আবার কোন ধরনের হজ্জ যা আমরা কোন দিন শুনি নি?

বিজ্ঞ আলেম ঃ আমার বিশ্বাস মতে, আমাদের সামনে যেরূপে দুটি ইসলাম বিদ্যমান যেমন ঃ একটি হচ্ছে নবীর (সাঃ) ইসলাম ও অপরটি হচ্ছে মুয়া'বিয়ার ইসলাম। তদ্রুপ হজ্জের ক্ষেত্রেও দুই ধরনের হজ্জ রয়েছে একটি হচ্ছে হজ্জে ইব্রাহীমি ও মুহাম্মাদী (সাঃ) আর অপরটি হচ্ছে হজ্জে আবু জাহেলী ও ইয়াযিদী।

দরবারী আলেম ঃ হজ্জ হচ্ছে একটি ইবাদতী বিষয়, অনুরূপ নামায ও রোযার মতই। অবশ্যই তা রাজনৈতিক বিষয় যা খোদায়ী নয় তা থেকে আলাদা করা উচিৎ।

বিজ্ঞ আলেম ঃ রাজনীতির প্রকৃত অর্থ দ্বীনের অনুরূপ। আর তা দ্বীনের থেকে কোন ভাবেই আলাদা নয়। কেননা অনেক ইবাদতই আছে তা ইবাদতী কাজ হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের প্রশান্তি এবং গোনাহ্ থেকে দূরে থাকার একটি বিশেষ মাধ্যম ও রাজনৈতিক বিষয়ে সঠিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে বিশেষ দায়িত্ব পালনে সহায়ক। কেননা ইবাদতী রুহ আল্লাহ্র দিকে আর রাজনৈতিক রুহ আল্লাহ্র সৃষ্ট মাখলুকাতের দিকে লক্ষ্য রাখে। আর এ দুটি বিষয় হজ্জের সাথে এমনভাবে জড়িত যা একে অপর থেকে আলাদা করতে গেলে সম্পূর্ণ হজ্জ বিষয়টিই প্রশ্নের সম্মুখিন হয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জ হচ্ছে চামড়ায় আবৃত একটি মগজ প্রকৃতির। যারা শুধুমাত্র চামড়ার সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছে তারা ইবাদতের দিকটাই আঞ্জাম দিয়ে থাকে এবং মগজকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কা'বার আরেকটি নাম হচ্ছে "উম্মুল কুরা" (গ্রামসমূহের মা)[১]। যেভাবে মা তার বাচ্চাকে আহার দিয়ে বাচ্চার উপযুক্ত লালন-পালনের ব্যবস্থা করে থাকে। কা'বাও তদ্রূপ মুসলমানদের চিন্তা, রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অবশ্যই আহার প্রদান করবে এবং ইসলামকে অগ্রগতীর চরম শিখরে পৌঁছে নিয়ে যাবে।

দরবারী আলেম ঃ আমরা তো মুসলামান, আর সে দৃষ্টিকোণে অবশ্যই কোরআন ও হাদীসের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তাই কোরআন বলছে ঃ

و لا جدال في الحج

- অবশ্যই যেন হজ্জে কোন সংঘর্ষ করো না (বাকারহ্ ঃ ১৯৭)।

সুতরাং হজ্জ মৌসুমে কারো সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া বা সেখানে মিছিল-মিটিং এবং বিভিন্ন শ্লোগান দেয়াও ঠিক নয়। কেননা কোরআন সে ব্যাপারে নিষেধ করেছে।

বিজ্ঞ আলেম ঃ উক্ত আয়াতে যে সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে এবং যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, কখনো আল্লাহ্র নামের (لا و الله)، (بلی و الله) কসম দিয়ে একে অপরের সাথে কথা-বার্তা ও তর্ক-বিতর্ক না করা।

আহ্লে বাইতের ইমামগণের (আঃ) কাছ থেকে যে হাদীসমসূহ উল্লেখ হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে কলহের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম দেয়া অথবা এমন কাজ করা যার মাধ্যমে গোনাহ্ হয়ে থাকে। ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন যে, কসমসহ কলহ তা যদি মু'মিনদের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে তবে তা ঐ আয়াতের আওয়াতায় পড়বে না। বরং এমন কলহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যার মাধ্যমে গোনাহ্ হয়ে থাকে এবং তার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইয়ের উপর রাগান্বিত

---

[১] لتنذر ام القری و من حوله। (আনয়াম/ ৯২, শুরা/ ৭)।

হয়ে যায়[১]।

কিন্তু যদি উক্ত কহল বা তর্ক-বিতর্ক দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য হয়ে থাকে তবে তাতে কোন গোনাহ্ তো নে-ই, বরং তা আল্লাহ্কে আনুগত্য করারই বহিঃপ্রকাশ।

ইমাম ফাখরে রাজি তার তফসিরে কাবির-এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইরানের মুতাকাল্লিমিনগণ ঐ কলহ বা তর্ক-বিতর্কের পক্ষে যা দ্বীনের স্বার্থে। আর তা হবে আল্লাহ্কে আনুগত্য করার শামিল। এরপর তার কথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কোরআনের আয়াত দিয়ে দলিল

দিয়েছেন, যা আমরা সূরা নাহ্লের ১২৫ নং আয়াতে আমরা পড়ে থাকবো ঃ

ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن

- হে নবী! মানুষকে হিকমত ও দলিল-প্রমাণসহ এবং উত্তম তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তোমার পরওয়ারদিগারের দিকে আহ্বান কর। আর তাদের সাথে উত্তম আলোচনা ও পর্যালোচনার আঞ্জাম দাও।

এবং সূরা হুদের ৩২ নং আয়াতে পড়ে থাকবো ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা কাফিরদের মুখ থেকে কথা বের করার জন্য হযরত নূহকে (আঃ) বলেছেন ঃ

يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا

- হে নূহ! আমাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক এবং অনেক কলহ্ করেছো।

এই আয়াত থেকে এটা বুঝা যায় যে, নূহ (আঃ) নিজের গোত্রের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতেন। আর এটাও বুঝা যায় যে, তার তর্ক-বিতর্কসমূহ শুধুমাত্র এক আল্লাহ্কে আনুগত্য করার দাওয়াতের প্রতি এবং দ্বীনকে প্রচারের লক্ষ্যেই ছিল।

সুতরাং হজ্জ মৌসুমে, যে কলহ্ বা তর্ক-বিতর্কের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে তা হচ্ছে এমন যা সত্যের বিরুদ্ধে বাতিলকে বিজয় করানোর লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে।

দরবারী আলেম ঃ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে কলহ্ বা তর্ক-বিতর্ককে ভাল হিসেবে চিহ্নিত করলেও তা অমু'মিনদের বিশেষত্ব বলে উল্লেখ করেছে। যেমন সূরা গাফিরের ৪ নং আয়াতে আমরা পড়ে থাকবো ঃ

ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا

- শুধুমাত্র তারাই আমাদের আয়াত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে থাকে যারা কাফির হয়ে গেছে।

উক্ত সূরার ৬৭ নং আয়াতে পড়ে থাকবো ঃ

---

[১]। মাজমায়ুল বায়ান, খণ্ড-২, পৃঃ-২৯৪।

و ان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون

- আর যদি তারা তোমার সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা যা করছো সে সর্ম্পকে আল্লাহ্ আরো বেশী জানেন।

উক্ত সূরার ১২১ নং আয়াতে পড়ে থাকবো ঃ

و ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم

- অবশ্যই শয়াতান তার বন্ধুদেরকে গোপনে বিভিন্ন বিষয় শিখিয়ে থাকে যাতে তারা তোমার সাথে কলহ্ বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।

বিজ্ঞ আলেম ঃ আপনার কথা মত কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে এটা বুঝা যায় যে, "জাদাল" শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে যা সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১- পছন্দনীয়, ২- অপছন্দনীয়। যখনই অন্যের সাথে কোন সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তর্ক-বির্তক করা হয়, তেমন "জাদাল" অবশ্যই পছন্দনীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হয়েও থাকে। আর যদি কোন মিথ্যা বিষয়কে সত্য বলে চাপিয়ে দেয়ার জন্য তর্ক-বিতর্ক করা হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে অপছন্দনীয় ব্যাপার হবে।

ফলাফল ঃ এ আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, উক্ত "জাদাল"-কে হজ্জ মৌসূমে আঞ্জাম দেয়া কখনোই অপছন্দের হতে পারে না।

দরবারী আলেম ঃ আমার কথা হচ্ছে যে, ইবাদতকে রাজনীতির সাথে মিশ্রিত না করা। আর হজ্জের মত পবিত্র স্থানে রাজনীতি করা ও শ্লোগান দেয়া এবং মিছিল-মিটিং করা উচিৎ নয়। কেননা উক্ত স্থানটি ইবাদতের জন্য তৈরী করা হয়েছে। আর রাজনীতির স্থান হচ্ছে অন্যত্র।

বিজ্ঞ আলেম ঃ ইসলামে ইবাদতের অর্থ, ইবাদত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের সাথে ওতপ্রতো ভাবে জড়িত। আর হজ্জ হচেছ এমনই একটি ইবাদত, যা সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথেও জড়িত। প্রকৃত ও পরিপূর্ণ হজ্জ হচ্ছে ওটাই যে, সকলে তার প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে লাভবান হবে। যখনই হজ্জকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে ফেলবো তখনই ঐ হজ্জে ত্রুটি প্রবেশ করবে। এখানে বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য ইমাম খোমেনীর (রহঃ) গভীর বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া বাঞ্চনীয়।

"হজ্জের একটি দার্শনিক দিক হচ্ছে তার রাজনৈতিক দিক, যা শত্রুর কালো হাত ধ্বংস করার জন্য সদা সচেষ্ট। তবে তাদের নষ্ট প্রচার-প্রপাগান্ডা মুসলমানদের উপর প্রভাব ফেলেছে, যার কারণে মুসলমানরা হজ্জকে নিছক একটি ইবাদত বলে মনে করছেন। সে জন্য হজ্জ মৌসুমে বর্তমানে মুসলামাদের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। তবে যখন থেকে হজ্জ শুরু হয়েছে তখন থেকে রাজনৈতিক দিকটাও তার সাথে ওতপ্রতোভবে জড়িত ছিল। আর এ দুটিকে কখনোই একে অপর থেকে আদালা করে

দেখা হত না। কেননা রাজনীতির মধ্যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয় ছাড়াও ইবদতের বিষয়ও রয়েছে[১]।

আর অন্য একটি স্থানে বলেছেন ঃ

"লাব্বাইক লাব্বাইক" ধ্বনিটি শুধুমাত্র মূর্তিগুলোর ব্যাপারেই বলো না বরং "লা" (না) শব্দটিকে সমস্ত অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধেও বলো। আর খোদার ঘর তাওয়াফের মধ্যে রয়েছে সত্যের প্রতি ভালবাসা। অন্তরকে অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নাও এবং হৃদয়কে অসত্যের প্রতি আনুগত্য করা থেকে পবিত্র কর। আর সত্যের প্রতি প্রেম করার লক্ষ্যে ছোট বড় সব ধরনের মূর্তি এবং অত্যাচারী ও তাদের দোষরদের কাছ থেকে দুরে থাকো। কেননা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেমীকগণ তাদের উপর অসন্তুষ্ট[২]........।

সুতরাং হজ্জ হচ্ছে ইবাদত ও রাজনীতির সংমিশ্রণ। এ দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে ইসলামী রাজনীতি হচ্ছে অনুরূপ ইবাদতের মতই। তাহলে আমরা কিভাবে হজ্জকে ইসলামী রাজনীতি থেকে আলাদা করবো। উদাহরণ স্বরূপ যদি আপেলের নির্যাসকে তা থেকে বের করে নেয়া হয়, তবে কি উক্ত আপেলকে তখন আর আপেল বলা যবে!।

দরবারী আলেম ঃ নবী (সাঃ) এবং মা'সুম ইমামগণ (আঃ) আর তাদের সাহাবগণ আমদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। তাঁরা তো হজ্জ মৌসুমে শুধুমাত্র তা আঞ্জাম দিতেন, রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।

বিজ্ঞ আলেম ঃ আপনার এই উক্তিটি ভিত্তিহীন। কেননা নবী (সাঃ) ও মা'সুম ইমামগণ (আঃ) এবং তাদের সাহাবাগণ সময় ও সুযোগ পেলেই কা'বার পাশে বসে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনা করতেন। আর এগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। এখানে তার কয়েকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করবোঃ

১- তাওয়াফের সময় নবীর (সাঃ) বীরের ন্যায় তৌওহীদি মহড়া দান ঃ

নবী (সাঃ) সপ্তম হিজরীতে (মক্কা বিজয়ের এক বছর আগে) হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির বিধান মতে এটা নির্দিষ্ট ছিল যে, ওমরাহ্ পালনের জন্য মক্কায় তিন দিন থাকতে পারবেন। তিনি দুই হাজার মুসমানকে সাথে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ইহ্‌রাম বেধে প্রখর রোদের মধ্যে মক্কায় প্রবেশ করে কা'বা তাওয়াফ করেন। মক্কার মানুষ (পরুষ, মহিলা ও শিশুরা) নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের এই মালাকুতি পরিবেশ দেখার জন্য দলে দলে সেখানে একত্রি হয়। তাদের পবিত্র চেহারা দেখে উপস্থিত জনগণের চোখে অন্ধকার নেমে আসে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে এ সময়টি যেহেতু দারুণ স্পর্শকাতর ও ভাগ্যলিপি তৈরীর উপযুক্ত সময় ছিল তাই তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে

১। সাহিফায়ে নুর, খণ্ড-১৮, পৃঃ-৬৬, ৬৭।

২। ঐ ।

বললেন ঃ

"তোমাদের কাঁধের কাপড় সরিয়ে তা উম্মুক্ত কর এবং উৎসাহের সাথে তাওয়াফ কর। যাতে করে মুশরিকরা তোমাদের সবুজ চামড়া এবং সবল ও কঠিন বাহুগুলোকে দেখতে পায়"।

সাহাবাগণ এই নির্দেশ পেয়ে ঐরূপ আঞ্জাম দিল, আর মুশরিকরা কা'বার চার পাশে দলবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে, নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের তওয়াফ দেখছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এটা যে, যখনই মুসলমানদের "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" বলা থেমে যাচ্ছিল তখনই আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহ (ইসলামের একজন সেনাপতি) নবীর (সাঃ) দিকে ইশারা করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার ধ্বনিতে বলছিল ঃ

خلوا بني الكفار عن سبيله   خلو فكل الخير في قبوله

يا رب اني مؤمن لقيله   اني رأيت الحق في قبوله

- হে কাফিররা! রাসূলে খোদার (সাঃ) জন্য রাস্তা প্রসস্ত কর। রাস্তা প্রসস্ত কর এবং জেনে নাও যে, সমস্ত সুখ ও সৌভাগ্য নবীর (সাঃ) রিসালাত গ্রহণের মধ্যে লুকায়িত।

- হে আল্লাহ্! আমি তাঁর কথা মত ঈমান এনেছি এবং তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করাকেই সত্য বলে জানি[১]।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কা'বা তাওয়াফ করাটা নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জন্য একটি মহড়া স্বরূপ ছিল। আর তা ছিল মুশরিকদের বিরুদ্ধে। সাথে সাথে তা ইবাদতেরও শামিল ছিল। যার মাধ্যমে মুশরিকরা হয়েছিল ধ্বংস।

২- ইমাম হুসাইন (আঃ) হজ্জ করতে এসে মুয়া'বিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগ করলেন ঃ

৫৮ হিজরীতে মুয়া'বিয়া (মুয়া'বিয়ার ইন্তেকালের দুই বছর পূর্বে) ইমাম আলীর (আঃ) অনুসারী এবং আলাভীদের সাথে পশুর মত ব্যবহার করে।

ইমাম হুসাইন (আঃ) ঐ বছর হজ্জে যান। হজ্জ পালন করার সাথে সাথে তিনি মিনাতে বনি হাশিম, শিয়া এবং আনসারদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করেন। এক হাজারেরও বেশী লোক সেখানে একত্রিত হয়। তাবেঈন ও নবীর (সাঃ) সাহাবাদের কিছু সন্তানগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম হুসাইন (আঃ) ঐ স্থানে উঠে দাড়িয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এই বক্তব্যে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করে বলেনঃ

---

[১]। 'কাহলুল বাছার' কিতাব থেকে ইকতিবাস, পৃঃ-১১৯, মাজমায়ুল বায়ান, খণ্ড-৯, পৃঃ-১২৮।

اما بعد : فان الطاغية قد صنع بنا و بشيعتنا، ما قد علمتم و رأيتم

- আম্মা বাদ ঃ "এই অত্যাচারী জালিম (মুয়া'বিয়া) আমাদের ও আমাদের অনুসারীদের সাথে এমন ব্যবহার করেছে যা আপনারা সকলেই জানেন ও দেখেছেন এবং সাক্ষি আছেন। আমি আপনাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবগত করতে চাই। যদি সত্য বলে থাকি তবে তা সত্যায়িত করবেন। আর যদি মিথ্যা বলে থাকি তবে আমাকে ধিক্কার দিবেন। এখন আমার কথাটি শুনুন এবং তা আপনাদের অন্তরে প্রবেশ করান। তারপর যখন হজ্জ থেকে ফিরে নিরিবিলি স্থানে যাবেন তখন আমার কথাটিকে যারা আপনাদের বিশ্বাসভাজন তাদের কাছে পৌছে দিবেন। তাকে আপনারা যেভাবে চেনেন ও জানেন (মুয়া'বিয়ার অত্যাচার সম্পর্কে) তার বিরুদ্ধে তাদেরকে দাওয়াত করবেন। আমার ভয় হচ্ছে যে, এই পরিস্থিতি যদি চলতেই থাকে তবে যা কিছু সত্য ও নির্ভূল তা হারিয়ে যেতে পারে। তবে আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন যদিও তা কাফিরদের অপছন্দের হয়ে থাকে"।

তখন ইমাম হুসাইন (আঃ) কোরআনের আয়াত ও নবীর (সাঃ) হাদীস বয়ান করে আলীর (আঃ) উপযুক্ততা ও যোগ্যতা এবং তাঁর সন্তানদের ইমামতের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে কথা বললেন। সে সময় উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তিই চিৎকার ধ্বনিতে বলতে লাগলো ঃ

اللهم نعم، قد سمعناه و شهدناه

- হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এমন কথা রাসূলে খোদার (সাঃ) কাছ থেকে শুনেছিলাম এবং তা যে সত্য তাও সাক্ষ্য দিচ্ছি। এভাবে তারা ইমাম হুসাইনের (আঃ) কথাকে সত্যায়ন করছিল।

এই আলোচনার শেষে ইমাম হুসাইন (আঃ) দ্বিতীয়বারের মত তাদেরকে বললেনঃ আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি যে, যখন ফিরে যাবেন তখন নিজের লোকেদের সাথে আমার এই কথাগুলোকে বলবেন, যাদেরকে আপনারা বিশ্বাসী মনে করেন। আর তাদেরকে আমার দাওয়াত সম্পর্কে অবগত করবেন[১]।

এটা ছিল হজ্জ পালনের পাশা-পাশি মুয়া'বিয়ার বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের (আঃ) একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

আর এখানে আমরা হজ্জে ইব্রাহীমিতে দেখতে পাই যে, শুধুমাত্র

নিছক ইবাদতই নয় বরং তার পাশা-পাশি রাজনৈতিক বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যখন কিনা পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন, তা সত্ত্বেও সেখানে অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে একটি রাজনৈতিক বিষয় উত্থাপিত হয়েছে।

---

[১]। ইহ্তিজাজ তবারাসী, খণ্ড-২, পৃঃ-১৮ ও ১৯।

৩- কা'বার পাশে সমকালীন সময়ের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) প্রতিবাদ ঃ

ইতিহাসের আরো একটি দৃষ্টান্ত যা হজ্জের সাথে রাজনৈতিক বিষয়ের ওতপ্রোতোতার প্রমাণ করে। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ হজ্জ মৌসুমে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের সাথে কা'বার নিকটে ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) ভীষণ বাকবিতণ্ডা হয়। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে ঘটনাটি তুলে ধরছি ঃ

তখন খলিফা আব্দুল মালেকের (পঞ্চম উমাইয়্যা খলিফা) সময় চলছিল। তার ছেলে হিশাম হজ্জ পালণের জন্য মক্কায় প্রবেশ করে। সে তাওয়াফের সময় হাজারতুল আসওয়াদে চুম্বন দেয়ার চেষ্ট করলো কিন্তু প্রচুর ভিড়ের কারণে তা করতে পারলো না। তার জন্য হাজারাল আসওয়াদের নিকটে একটি মিম্বার তৈরী করা হল। সে মিম্বারের উপরে উঠলে শামের কিছু লোক তার চার পাশে ভিড় জমায়। আর সে সেখানে বসে যারা তাওয়াফ করছিল তাদেরকে লক্ষ্য করছিল। এমন সময় দেখলো যে, ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) কা'বা তাওয়াফে ব্যস্ত রয়েছেন। যখন তিনি হাজারাতুল আসওয়াদে চুম্বন করতে চাইলেন তখন মানুষ তাকে বিশেষ সম্মানের সাথে রাস্তা করে দিল। আর তিনি তৃপ্তিভরে তাতে চুম্বন দিলেন।

এ সময় শামের এক অধিবাসী হিশামকে বলল ঃ এই ব্যক্তি কে, যাকে মানুষ এত সম্মান দিচ্ছে?

হিশাম না জানার ভান করে বলল ঃ আমি তাকে চিনি না।

তখন তার পাশে দাড়িয়ে থাকা ফারাযদাক নামে এক কবি ঐ শামবাসীকে বলল ঃ

و لكني اعرفه কিন্তু আমি তাকে চিনি।

শামবাসী বলল ঃ তিনি কে?

ফারাযদাক ইমাম সাজ্জাদকে (আঃ) কবিতার মাধ্যমে পরিচয় করালেন। আর ঐ কবিতাটি ছিল ৪১ টি পংক্তি সম্বলিত। যা এভাব শুরু করেছিলঃ

هذا الذي تعرف البطحاء و طأته

و البيت يعرفه و الحل و الحرم

- তিনি এমন এক ব্যক্তি মক্কার পাথরগুলো যার পায়ের ছাপকে চেনে।

- কা'বা ঘর, হিজাজের মরুভুমি এবং হারাম শরিফের বাইরের ও ভিতরের উভয় দিক থেকেই তাকে চেনে।

হিশাম রাগান্বিত হয়ে ফারাযদাককে বন্দি করার নির্দেশ দিল। ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) যখন ফারাযদাকের বন্দি হওয়ার খবর জানলেন তখন তার জন্য দোয়া করেছিলেন। আর তার জন্য বার হাজার দিরহাম পঠিয়েছিলেন। প্রথমে ফারাযদাক তা গ্রহণ করে নি। তাই ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) তার জন্য পয়গাম পাঠালেন ঃ

"তোমার উপর আমার যে আধিকার রয়েছে, সে সুত্রে তুমি এই অর্থ গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ তোমার আধ্যাত্মিক নিয়াতের কথা জানেন। তখন ফারাযদাক ঐ অর্থ গ্রহণ করে এবং হিশামের বিরুদ্ধে বন্দি থাকা অবস্থায় একটি কবিতা লিখে[1]।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, তাওয়াফ করার সময় ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) হিশামের শান-শওকতের দিক কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি। আর ফারাযদাকের এহেন কাজটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক কারণ থাকায় ইমাম তাকে প্রশংসা করে অর্থ প্রদান করেন এবং তার জন্য দোয়াও করেন। আর তার পবিত্র নিয়তকে সত্যায়িত করেন।

উক্ত ঘটনাটি কি এটাই প্রমাণ করে না যে, হজ্জ মৌসুমে কা'বার পাশে রাজনৈতিক বিষয় সৃষ্টি করার ব্যাপারে মা'সুম ইমামগণের (আঃ) সত্যায়ণ ছিল?!

৪- ইমাম বাকিরের (আঃ) রাজনৈতিক ওয়াসিয়াত ঃ

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস জনাব কুলাইনি মুওয়াছ্ছাক (নিগুড় সত্য) সনদ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ আমার পিতা [ইমাম বাকির (আঃ)] ওয়াসিয়াত করে বলেছেন ঃ "আমার সম্পত্তি থেকে কিছু পরিমান ওয়াক্ফ করবে, যাতে করে ১০ বছর ধরে হজ্জ মৌসুমে মিনাতে আমার জন্য ক্রন্দন এবং আমার দুঃখময় অবস্থার জন্য আহাজারী করে[2]।

এখানে এমন প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইমাম বাকির (আঃ) কেন মদীনায় তাঁর কবরের পাশে আযাদারী করতে ওয়াসিয়াত করেন নি! কেন মক্কায় অথবা মিনাতে হজ্জ মৌসুম ছাড়াও তাঁর জন্য আযাদারী করতে ওয়াসিয়াত করেন নি?

এভাবে জবাব দেয়া যেতে পারে যে, তিনি চেয়েছিলেন হজ্জ মৌসুমে যখন মুসলমানগণ বিভিন্ন স্থান থেকে মিনায় একত্রিত হবেন তখন সেখানে তাঁর জন্য সবাই আযাদারী করবে। আর সেই আযাদারীতে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করার মাধ্যমে অত্যাচারীদের পরিচয় তুলে ধরা, যাতে করে মুসলমানগণ তাগুত বনি উমাইয়্যাদের জুলুম ও অত্যাচার সম্পর্কে অবগত হয়। সুতরাং হজ্জের পাশা পাশি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বিষয়াদী যেভাবে ইমাম বাকির (আঃ) ওয়াসিয়াত করেছেন, সেভাবে নিজের

---

[1]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৪৬, পৃঃ-১২৭।
[2]। মুনতাহিয়াল আমাল, খণ্ড-২, পৃঃ-৭৯।

সম্পত্তির কিছু অংশ ওয়াক্‌ফ করে তা পালন করুন।

হজ্জের আহ্‌কাম, ইবাদত ও রাজনৈতিক বিষয়ের শিক্ষা দেয় ঃ

সাধারণত আমরা যখন হজ্জের আহ্‌কামের দিকে দৃষ্টি দিবো তখন দেখতে পাবো যে, তাতে ইবাদতী বিষয় ছাড়াও রাজনৈতিক বিষয়ও নিগুড়ভাবে জড়িয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

১- যখন মানুষ হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম পরিধান করে তখন দুই খণ্ড সাদা কাপড় দিয়ে নিজের শরীরকে ঢেকে থাকে। ধনি, গরীব, উচ্চপদস্থ, নিম্নপদস্থ সকলেই একই সমান্তরাল পর্যায়ে পৌছে থাকে। আর এখান থেকে যে বিশেষ বিষয়টি শিক্ষা নিয়ে থাকবো তা হচ্ছে এই বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২- ইহ্‌রামের আহ্‌কামের মধ্যে একটি আহ্‌কাম হচ্ছে এরূপ যে, অতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ (মশা, পিপড়া ......) যা মানুষের গায়ে বসে ও কামড়িয়ে দেয় বা হুল ফুটায় তাদেরকে মেরে ফেলা এবং অতি ছোট গাছ-গাছালী যা সহজেই উপড়ে ফেলা যায় তা উপড়ে ফেলা হচ্ছে হারাম। শরীরের লোম বা মাথার চুল টেনে ছিড়ে ফেলা হচ্ছে হারাম। অস্ত্র সাথে রাখা হারাম ....। এ গুলো থেকে আমরা নিরাপত্তার শিক্ষা নিয়ে থাকি যা একটি রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩- কা'বা তাওয়াফ করার সময়, প্রতিবার যখন হাজারল আসওয়াদে পৌছাই তখন মুসতাহাব হচ্ছে তাতে হাত বুলানো। এ মর্মে ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ

وَ هُوَ يَمِينُ اللهِ فِي اَرْضِهِ يُبَايِعُ بِهَا خَلْقَهُ

হাজারাল আসওয়াদ হচ্ছে যমিনের বুকে আল্লাহ্‌র ডান হাতের মতই যার মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্টির পক্ষ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন (অর্থাৎ তাতে হাত বুলানোই হচ্ছে তাঁর সাথে বাইয়াত করা)[১]।

সাধারণত বাইয়াতের বিষয়টি হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক বিষয়। আল্লাহ্‌র সাথে বাইয়াতের অর্থ এমন যে, হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার সাথে বাইয়াত করেছি। যাতে করে তোমার নির্দেশিত পথে চলতে পারি। আর আমেরিকা ও ইসরাঈলের মত তোমার অন্যান্য সকল শত্রুর সাথে যেন শত্রুতা পোষণ করতে পারি।

৪- মিনাতে "রামি' জামারাত" (শয়তানকে পাথর মারা) কাজটি করে থাকি। এই কাজটির রাজনৈতিক দিক হচ্ছে অবশ্যই আমেরিকা ও ইসরাঈল সহ যারা শয়তানের দোসর তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা। আমাদের অবশ্যই শত্রু চেনার

---

[১]। ওয়াসায়েলুশ শিয়াহ্‌, খণ্ড-৯, পৃঃ-৪০৬।

ক্ষমতাও থাকতে হবে, যাতে করে তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে মারতে পারি। যেমনভাবে পাথর মারার সময় একটু এদিক ওদিক হলে তা সঠিক হবে না।

৫- হজ্জের সময় মিনাতে আরো একটি করে থাকি, তা হচ্ছে কুরবানী করা। এই কুরবানী করার মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষাটি পেয়ে থাকি তা হচ্ছে আত্মত্যাগ ও অন্যকে নিজের থেকে প্রাধান্য দেয়া। যা শয়তানের সাথে মুকাবিলা করার জন্য সর্ব বৃহত রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

বলা হয়ে থাকে ঃ ইমাম মাহ্দী (আঃ) কা'বার পাশে আবির্ভূত হবেন। আর সেখানেই ৩১৩ জন বিশেষ অনুসারী তাঁর হাতে বাইয়াত করবে[১]।

এ মর্মে হযরত যাহ্রা (সালাঃ) বলেছেন ঃ

...... جَعَلَ اللهُ الْحَجَّ تَشْيِيداً لِلدِّينِ

আল্লাহ্ তা'য়ালা হজ্জকে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খুটি হিসেবে মনোনিত করেছেন[২]।

এবং ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ

لايَزالُ الدِينُ قائماً ما قامَتِ الْكَعْبَةِ

যতক্ষণ পর্যন্ত কা'বা বিদ্যমান থাকবে ইসলামও ততক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে[৩]।

যে হজ্জে শুধুমাত্র ইবাদতী বিষয়সমূহকে গ্রহণ করা হয় এবং রাজনৈতিক বিষয়সমূহ গণ্য করা হয় না সে হজ্জ কি দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে?!

---

[১] । সুনানে ইবনে মাজাহ্, খণ্ড-২, পৃঃ-১৮,১৯, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ-৩১৬।
[২] । আ'ইয়্যানুশ শিয়াহ্, খণ্ড-১, পৃঃ-১৪, (নতুন সংস্করণ)।
[৩] । ওয়াসায়েলুশ শিয়াহ্, খণ্ড-৮, পৃঃ-১৪।

৮২- আব্দুল মুত্তালিব ও আবু তালিবের কবর যিয়ারত ও তাদের ঈমান প্রসঙ্গে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ নবীর (সাঃ) প্রথম পুরুষ আব্দুল মুত্তালিব ও ইমাম আলীর (আঃ) পিতা আবু তালিবের কবর মক্কায় হুজুন কবরস্থানে পাশা-পাশি স্থাপিত হয়ে আছে। শিয়া মাযহাবের যে কেউ সেখানে যায়, যে কোন প্রকারেই হোক উক্ত দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির কবর যিয়ারত করে আসে। কিন্তু আহ্‌লে সুন্নাত তার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না। বরং তা করা সঠিক নয় বলে মনে করে। নিম্নের মুনাযিরাটি লক্ষ্য করুন ঃ

একজন শিয়া আলেম বলেন ঃ একটি অনুষ্ঠানে আমার ও আ'মিরিণ বে মারুফ দফতরের প্রধানের মধ্যে হযরত আব্দুল মুত্তালিব ও হযরত আবু তালিবের কবর যিয়ারতের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। সে বলল ঃ তোমরা শিয়ারা কোন কারণে ঐ দু'জনের কবর যিয়ারত করো?

বললাম ঃ তাতে অসুবিধা কোথায়?

প্রধান ঃ আব্দুল মুত্তালিব এমন সময় জীবন-যাপন করতেন তখন কোন নবী ছিল না। এমতাবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। কেননা তখন নবী (সাঃ) দুনিয়াতে থাকলেও তাঁর বয়স ছিল আট বছর। ঐ বয়সে তিনি তখনও নবুওয়াতে পদার্পণ করেন নি। তাই আব্দুল মুত্তালিবের সময়ে দ্বীনে তৌওহীদি ছিল না। সুতরাং কি কারণে তার কবর যিয়ারতে যাও?!

আর আবু তালিব তো মুশরিক অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। মুশরিকের কবর যিয়ারত জায়েয নয়।

বললাম ঃ আব্দুল মুত্তালিবের ব্যাপারে কোন মুসলমান এমনটি বলতে রাজি হবে কি যে, তিনি মুশরিক ছিলেন? কেননা তিনি আল্লাহ্‌কে চিনতেন এবং একত্ববাদের উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার পিতামহ হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) দ্বীনে হানিফকে মেনে চলতো। যখন আবরাহাহ্ তার সৈন্য দল নিয়ে কা'বা ধ্বংস করতে এসেছিল এবং আব্দুল মুত্তালিব তার কাছ থেকে নিজের উটগুলো আনতে গিয়েছিল তখন আবরাহাহ্ তাকে বলেছিল ঃ আমার দৃষ্টিতে তুমি অনেক ক্ষুদ্র হয়ে গেলে, কেননা তুমি তোমার উট নিতে এখানে এসেছো কিন্তু তোমার ও কা'বার মা'বুদ সম্পর্কে

কিছুই বললে না!

আব্দুল মুত্তালিব ঐ কথার উত্তরে বলেন ঃ

انا رب الابل، و ان للبيت رباً سيمنعه

- আমি হচ্ছি এই উটের মালিক, আর এই ঘরেরও একজন মালিক (আল্লাহ্) আছেন যিনি তা রক্ষা করবেন।

তারপর আব্দুল মুত্তালিব কা'বার পাশে গিয়ে দরজার কড়া ধরে দোয়া ও কবিতা আবৃতি করলেন যার একটি পংক্তি হচ্ছে এরূপ ঃ

হে আল্লাহ্! প্রত্যেকেই তার পরিবারের সদস্যকে রক্ষা করে থাকে, তুমিও তদ্রুপ এই কা'বাকে রক্ষা কর ....[১]।

অবশেষে তার দোয়া কবুল হল। আল্লাহ্ তা'য়ালা দলে দলে আবাবিল নামে এক অতি ক্ষুদ্র পাখি প্রেরণ করেন এবং আবরাহাহ্র হস্তী বাহিনীকে ঐ পাখির মাধ্যমে ধ্বংস করালেন। পবিত্র কোরআনের সূরা ফিল এই কারণেই নাযিল হয়েছে।

আর শিয়া মাযহাবের অনেক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, আলী (আঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমার পিতা আবু তালিব এবং পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব, হাশিম ও আবদে মানাফ কখনোই মূর্তি পুজারক ছিলেন না। তারা কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন এবং ইব্রাহীমের (আঃ) হানিফ দ্বীনের আইন মোতাবেক চলতেন[২]।

*****

এ পর্যায়ে আমরা আবু তালিবের ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করবো ঃ

প্রথমত ঃ নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতের দৃষ্টি এবং শিয়া মাযহাবের আলেমগণের মতে তিনি মুসলমান ছিলেন ও মু'মিন হিসেবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

ইবনে আবিল হাদীদ (যিনি সুন্নী মাযহাবের একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম) উল্লেখ করেছেন ঃ একজন লোক ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে, আবু তালিক কি মু'মিন ছিল?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

অন্য আরেকজন ইমামকে জিজ্ঞাসা করলো যে, কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকে আবু তালিব কাফির অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ "আশ্চর্য! তারা রাসূল (সাঃ) ও আবু তালিবের ব্যাপারে বাজে কথা বলে। কেননা রাসূলে খোদ (সাঃ) কোন কাফির ব্যক্তির সাথে ঈমানদার মহিলার বিয়েকে নিষেধ করেছেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ফাতিমা বিনতে আসাদ (সালাঃ) ইসলামের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ঈমানদারও ছিলেন। আর তিনি আবু তালিবের শেষ জীবন পর্যন্ত তার স্ত্রী হিসেবে

---

[১]। সিরাহ্ ইবনে হিশামের উপর ব্যাখ্যা সম্বলিত বই, খণ্ড-, পৃঃ-৩৮ থেকে ৬২।

[২]। কামালুদ্দিন, পৃঃ-১০৪, তফসিরে বুরহান, খণ্ড-৩, পৃঃ-৭৯৫।

ছিলেন"[১] ।

দ্বিতীয়ত ঃ আহ্‌লে সুন্নাতের বিশিষ্ট অনেক আলেম উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাঃ) আক্বীল ইবনে আবি তালিকে বলেছেন ঃ

انِّي اُحِبُّكَ حُبَّيْنِ، حُبّاً لِقِرابَتِكَ مِنِّي، وَ حُبّاً لِما كُنْتُ اِعْلَمُ مِنْ حُبَّ عَمِّى اَبِي طالِبٍ اِيّاكَ

আমি তোমাকে দু'টি কারণে ভালবাসী ঃ ১- আত্মীয়তার কারণে তোমার সাথে আমার যে সর্ম্পক রয়েছে, ২- যেহেতু আমার চাচা আবু তালিব তোমাকে ভালবাসে তাই তোমাকে তোমাকে ভালবাসী[২] ।

এই বিষয়টি উক্ত বিষয়েরই সত্যায়ণ করে যে, নবী (সাঃ) আবু তালিবের ঈমানের ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। আর যেহেতু কাফিরকে ভালবাসা কোন সম্মানের ব্যাপার নয়, তথাপিও তিনি আক্বীলকে আবু তালিব ভালবাসেন বলেই ভালবাসতেন। অতএব, নিশ্চয়ই আবু তালিব কাফির ছিলেন না[৩] ।

*****

ব্যাখ্যা ঃ অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আহ্‌লে সুন্নাতের ভাইয়েরা তাদের অতীতগণের এ বিষয়ের প্রতি ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে আবু তালিবের ঈমান ছিল না এ বিষয়টিকে বংশ পরমপরায় বর্ণনা দিয়ে আসছে। তারা এটাও জানে না যে, তাদের মাযহাবের মূল্যবান গ্রন্থে অনেক হাদীসই রয়েছে যা আবু তালিবের ঈমানের পক্ষে বর্ণিত হয়েছে। বিদ্বেষ পোষণকারীরা এটাই চায় যে, সকলের কাছে আবু তালিব মুশরিক হিসেবে পরিচয় পাক। কেননা তার ছেলে ইমাম আলীই (আঃ) হচ্ছেন নবীর (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত, যদি আবু তালিবকে মুশরিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তবে ইমাম আলীকে (আঃ) অপদস্থ করা যাবে। আর এই বিদ্বেষটি বনি উমাইয়্যাদের আমল থেকে শুরু হয় এবং চলতে থাকে। ইমাম আলীর (আঃ) কসম দিয়ে বলছি, যদি আবু তালিব তাঁর পিতা না হতেন তাহলে নবীর (সাঃ) চাচা হওয়ার কারণে তিনি সব থেকে উত্তম মু'মিন ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় পেতেন।

আল্লামা আমিনির (আল্ গাদীরের প্রণেতা) ছেলের সাথে কোন এক মজলিসে সাক্ষাত করেছিলাম। সেখানে আবু তালিবের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বললেন ঃ যখন আমরা নাজাফে আশরাফে ছিলাম তখন শুনেছিলাম যে, আহ্‌মাদ খাইরি নামে মিশরের এক লেখক আবু তালিব সম্পর্কে একটি বই লিখছেন। তার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলাম এবং

---

[১] । কামাল উদ্দিন, পৃঃ-১০৪, তফসিরে বুরহান, খণ্ড-৩, পৃঃ-৭৯৫ ।

[২] । শারহে নাহ্জুল বালাগা ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড-৩, পৃঃ-৩১২ ।

[৩] । ইসতিইয়া'ব, খণ্ড-২, পৃঃ-৫০৯, যাখায়েরুল উ'কবা, পৃঃ-২২২ ও .... ।

উক্ত বইটি ছাপানো থেকে বিরত থাকতে বললাম, ঐ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্ গাদীরের সপ্তম খণ্ডটি তার কাছে পাঠাচ্ছি।

যখন আল্ গাদীরের সপ্তম খণ্ডটি (এই খণ্ডের শেষ অধ্যায়টি আবু তালিব সংক্রান্ত) ছাপা খানা থেকে বের হল, তখন সময় নষ্ট না করে তার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলাম। কিছু দিন পরে আহ্‌মাদ খাইরির পক্ষ থেকে একটি পত্র পেলাম। সেখানে সে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছে যে, আল্ গাদীর বইটি আমার হাতে পৌছেছে। আবু তালিব সম্পর্কে উক্ত বইয়ের আলোচনাটি আমার বিবেককে যথেষ্ট পরিমানে নাড়া দিয়েছে। আমি আবু তালিব সম্পর্কে যা লিখেছিলাম তা সব এলো-মেলো করে দিয়েছে। আর এ বিষয়ে আমার বিবেকে নতুন চিন্তার অবতারণা ঘটিয়েছে। পত্রের শেষে লিখেছে যে, আবু তালিবের জিহাদসমূহ ও প্রতিরক্ষার কারণেই ইসলামের দৃঢ়তা ও প্রচার-প্রসার ঘটেছে। এই কারণেই তিনি বিশ্বের মুসলমানদের ঈমানের অংশিদার হয়ে রয়েছেন এবং সকল মুসলমান তার কাছে ঋনী হয়ে থাকবে।

প্রধান ঃ যদি আবু তালিবের ঈমান এতই স্বচ্ছ হয়ে থাকে, তবে কেন আমাদের আলেমগণ তার ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন এবং কেউ কেউ তাকে কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন?! এর প্রকৃত কারণ কী?

বললাম ঃ উল্লেখিত বর্ণনা মোতাবেক সত্য হচ্ছে এটাই যে, মুয়া'বিয়ার খেলাফতের সময়ে ইমাম আলীর (আঃ) বাজে কথা বলা এমনকি তা নামাযের কুনুতেও বলাটা বৈধ মনে করতো। আনুমানিক ৭০ বছর ধরে মিম্বারে মিম্বারে তাঁর উপর (নাউজুবিল্লাহ্) লানত প্রদান করা হয়। অপবিত্র হাতগুলো সোচ্চার হয়ে উঠে মিথ্যা ও জাল হাদীস করতে। তারাই আবু তালিবকে কাফির ঘোষণা দেয়, যাতে করে আলীকে (আঃ) কাফিরের সন্তান হিসেবে পরিচয় দেয়া যায়। আর এই জাল ও মিথ্যা হাদীসগুলোই তোমাদের গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধতা পেয়েছে এবং তোমারদের মাথা-মগজকে নষ্ট করেছে। যদি তা না হয়ে থাকে, তবে আবু তালিবের ঈমান যে কত দৃঢ় তা সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, আবু তালিব বিচক্ষণতার সাথে ইসলামের পক্ষে নবীকে (সাঃ) প্রতিরক্ষা করেছিলেন। তিনি তাকিয়া অবলম্বন করে চলতেন, যাতে করে নবীকে (সাঃ) বেশী সাহায্য করতে পারেন। যদি তিনি প্রকাশ্যে নবীকে (সাঃ) সাহায্য করতেন, তাহলে নবুওয়াত প্রকাশের প্রথম দিকে উপযুক্তভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারতেন না।

নবীর (সাঃ) থেকে প্রাপ্ত বহু হাদীস এমন দেখা যায় যে, আবু তালিবের শানে তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ- "আবু তালিব আলে ফিরআউনের মু'মিনদেন" এবং "আসহাবে কাহ্‌ফের" মত নিজের ঈমানকে গোপন রেখেছিলেন যাতে করে দ্বীনের জন্য

অধিক কাজ করতে পারেন। ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) তফসিরে এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর (সাঃ) কাছে ওহী পাঠিয়েছিলেন যে, "আমি তোমাকে দুই দলের মাধ্যমে সাহায্য করবো, যার একটি হচ্ছে গোপন দল এবং অপরটি হচ্ছে প্রকাশ্য দল। গোপন দলের উত্তম অধিনায়ক হচ্ছে আবু তালিব এবং প্রকাশ্য দলের উত্তম অধিনায়ক হচ্ছে আবু তালিবের পুত্র আলী (আঃ)"[১]।

যাদের জ্ঞানের পরিধি অধিক তারা অবশ্যই জানেন যে, ইতিহাসে এই দুটি দল সব সময় মুসলমানদের সাথে ছিল এবং শত্রুদের মোকবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

*****

১। আল্ হুজ্জাতু আলায যাহাব, পৃঃ-৩৬১।

আবু তালিবের ঈমান প্রসঙ্গে আরেক দফা মুনাযিরা

কোন এক মাদ্রাসায় লেখকের সাথে সুন্নী মাযহাবের এক ব্যক্তির সাথে ইমাম আলীর (আঃ) পিতা আবু তালিবের ঈমান নিয়ে মুনাযিরা সংঘটিত হয় যা নিম্নরূপ ঃ

সুন্নী ভাই ঃ আমাদের বুনিয়াদী কিতাবসমূহে আবু তালিবের ব্যাপারে বিতর্কিতভাবে উল্লেখ হয়েছে। কেউ কেউ তাকে ভাল বলেছেন, আবার কেউ কেউ তাকে মন্দ বলেছেন।

লেখক ঃ শিয়া আলেমগণের দৃষ্টিতে [যারা নবীর (সাঃ) ইতরাতের অর্থাৎ ইমামগণের (আঃ) অনুসরণ করে থাকেন] আবু তালিব হচ্ছে একজন উত্তম মানুষ ও মু'মিন এবং ইসলামের পক্ষে দারুণ কাজ করে গেছেন।

সুন্নী ভাই ঃ যদি তাই হবে, তবে কেন বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তাকে বে-ঈমান বলা হয়েছে?

লেখক ঃ আবু তালিবের অপরাধ হচ্ছে যে, তিনি হচ্ছেন ইমাম আলীর (আঃ) পিতা। ইমাম আলীর (আঃ) সাথে যারা শত্রুতা করতো যেমন মুয়া'বিয়া দ্বীনহীন মুসলমানদেরকে বাইতুল মাল থেকে হাজার হাজার দিনার দিয়ে এই ধরনের হাদীসগুলো জাল করিয়েছে। মিথ্যা হাদীস তৈরী কারকরা অর্থের লোভে অভদ্রতার চরম পর্যায়ে উঠে, মিথ্যাবাদী আবু হুরাইরাহ্‌র উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে যে, সে বলেছে ঃ নবী (সাঃ) রিহ্‌লাতের

সময় ওয়াসিয়াত করে গেছেন যে, আলীর (আঃ) হাত কেটে দাও[১]।

সুতরাং এই পেট পুজারী, অপদার্থ ও মিথ্যাবাদীদের পক্ষে মু'য়াবিয়া এবং পরবর্তী উমাইয়্যা খলিফাদের সময় এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, আবু তালিবকে মুশরিক বলে হাদীস জাল করবে। তারা আবু তালিবের ব্যাপারে এত অধিক পরিমানে বাজে কথা বলেছে যা আবু সুফিয়ান অতি দুষ্ট প্রকৃতির এবং নোংরা চরিত্রের থাকা সত্ত্বেও তার ব্যাপারে এরূপ বলেনি।

অতএব, আবু তালিবের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়াটা একটি রাজনৈতিক বিষয় বৈ

---

[১]। শারহে নাহ্‌জুল বালাঘা -ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড-১, পৃঃ-৩৫৮ ও ৩৬০।

অন্য কিছুই নয়।

সুন্নী ভাই ঃ পবিত্র কোরআনে সূরা আনয়া'মের ২৬ নং আয়াতে পড়ে থাকবো যেঃ

وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْئَوْنَ عَنْهُ ....

তারা অন্যদেরকে তা থেকে দুরে রাখে এবং নিজেদেরকেও তা থেকে দুরে রাখে।

আমাদের অনেক মুফাছ্ছিরগণের বক্তব্য মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কিছু লোক নবীর (সাঃ) পক্ষে প্রতিরক্ষা করতো তথাপিও তাঁর থেকে দুরে থাকতো।

আর এই আয়াতটি আবু তালিব প্রকৃতির লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কেননা তিনি হয়তো নবীর (সাঃ) পক্ষে প্রতিরক্ষা করতেন কিন্তু আবার ঈমানের দিক দিয়ে তাঁর থেকে দুরেও থাকতেন।

লেখক ঃ

প্রথমত ঃ উক্ত আয়াতের অর্থ এরূপ নয় যা তুমি বলছো।

দ্বিতীয়ত ঃ যদি ধরেও নেই যে, তোমার অর্থটাই ঠিক তারপরও কিভাবে তা আবু তালিবের উপর বর্তায়?!

সুন্নী ভাই ঃ এই দলিলের ভিত্তিতে যে, সুফিয়ান ছাউর হাবিব ইবনে আবি ছাবিতের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছে যে, ইবনে আব্বাস বলতো ঃ 'এই আয়াতটি আবু তালিবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কেননা সে অন্যদের নবীকে (সাঃ) কষ্ট দিতে নিষেধ করতো কিন্তু নিজেকে ইসলামের থেকে দুরে রাখতো'[১]।

লেখক ঃ তোমার কথার জবাব দেয়ার জন্য উপায়হীন হয়েই কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছিঃ

১- তুমি যেভাবে উক্ত আয়াতের অর্থ করেছো প্রকৃত অর্থ তা নয়। বরং ঐ আয়াতটি তার পূর্বের ও পরের অংশের সাথে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, আয়াতটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে ঃ তারা (কাফিররা) মানুষকে নবীর (সাঃ) আনুগত্য করা থেকে নিষেধ করতো এবং নিজেদেরকেও দুরে রাখতো[২]। সুতরাং এই আয়াতে নবীকে (সাঃ) প্রতিরক্ষা করার বিষয়টি উল্লেখ হয় নি।

২- "ইয়ানআওনা" বাক্যটির অর্থ হচ্ছে 'দুরে থাকা'। কিন্তু আবু তালিব সর্বদা নবীর (সাঃ) সাথে ছিল এবং কখনো তাঁর থেকে দুরে যাই নি।

৩- সুফিয়ান ছাউর, ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ উক্ত আয়াতটি আবু তালিবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এই রেওয়ায়েতটি

---

[১]। তফসিরে ইবনে কাছির, খণ্ড-২, পৃঃ- ১২৮।

[২]। ইবনে আব্বাস উক্ত আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন (আল্ গাদীর, খণ্ড-৮)।

কয়েকটি দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন ঃ-

ক)- আহ্‌লে সুন্নাতের বুজুর্গ ব্যক্তির্বগ স্বীকার করেছেন যে, সুফিয়ান ছাউর সত্যবাদী নয় এবং তার কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়[১]।

এবং ইবনে মুবারাক হতে উল্লেখ আছে যে, সে বলেছে সুফিয়ান তাদলিস করতো। অর্থাৎ মিথ্যা বলে সত্যকে

মিথ্যা আর মিথ্যকে সত্যের রূপ দিত[২]।

উক্ত রেওয়ায়েতের আরো একজন রাবি হচ্ছে হাবিব ইবনে আবি ছাবিত, সেও আবু হাইয়্যানের বক্তব্য অনুযায়ী তাদলিস করতো[৩]।

এত সব যুক্তি দলিলের পর বলা যেতে পারে যে, উক্ত রেওয়ায়েতটি হচ্ছে 'মুরসাল'। অর্থাৎ হাবিব থেকে ইবনে আব্বাসের মধ্যে বেশ কিছু রাবিগণ বাদ পড়ে গেছে।

খ)- ইবনে আব্বাস একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি আবু তালিবের ঈমানের ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং কিভাবে তিনি এমন রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে পারেন?!

কেননা উক্ত আয়াতের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ তারা (কাফিররা) মানুষকে নবীর (সাঃ) আনুগত্য করা থেকে নিষেধ করতো এবং নিজেদেরকেও দূরে রাখতো।

গ)- উল্লেখিত রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি শুধুমাত্র আবু তালিবের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। যদিও উক্ত আয়াতে 'يَنْهَوْنَ' এবং 'يَنْئَوْنَ' বাক্য দুটি হচ্ছে বহুবচন।

সুতরাং, কিছু লোকের তফসির অনুযায়ি উক্ত আয়াতটি নবীর (সাঃ) অন্যান্য চাচাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কেননা তাঁর ১০ টি চাচা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে তিন জন ছিলেন মু'মিন, যথাক্রমে ঃ হামযা, আব্বাস ও আবু তালিব। তাই তাদের ব্যাপারে উক্ত আয়াতটি প্রযোজ্য হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ নবী (সাঃ) মুশরিকদের থেকে দূরে থাকতেন। যেমন তিনি আবু লাহাবের থেকেও দূরে থাকতেন যদিও সে তাঁর চাচা ছিল। কিন্তু আবু তালিবের ক্ষেত্রে তিনি তা করেন নি, বরং তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার সাথে গভীর সম্পর্ক

---

[১]। মিযানুল ই'তাদাল, পৃঃ-৩৯৭।

[২]। তাহ্‌যিবুত তাহ্‌যিব, খণ্ড-৪, পৃঃ-১১৫।

[৩]। ঐ ।

রেখেছিলেন। তার ইন্তেকালের বছরটিকে তিনি 'عام الحُزن' (দুঃখের বছর) নামকরণ করেন এবং তিনি তার জানাযার পাশে দাড়িয়ে বলেন ঃ

وا اَبَتاه ! وا حُزناهُ عَلَيْكَ كُنْتُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ مِنَ الْحَدَقَةِ، وَ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ

হায় আমার পিতা! তোমার মৃত্যুতে আমি কতই না দুঃখে ভারাক্রান্ত, আমি তোমার নিকট চোখের মণি এবং শরীরে আত্মার ন্যায় ছিলাম[১]-[২]।

এটা কি উত্তম কাজ হবে যে, নবী (সাঃ) কোন মুশরিককে এভাবে প্রশংসা করবেন এবং তার মৃত্যুতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন। কেননা পবিত্র কোরআনে বারংবার বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের থেকে দুরে থাকো?! ...

---

[১]। তারিখে তাবারী (আবু তালিব কুরাইশ বংশের মু'মিন) আধ্যায়।

[২]। এখানে আরো অনেক কথা বলার আছে, দেখুন আল্ গাদীর, খণ্ড-৭, (আবু তালিব কুরাইশ বংশের মু'মিন) এই অধ্যায়ে, পৃঃ-৩০৩ থেকে ৩১১।

৮৩- আলী (আঃ) কি দামী আংটি হাতে পরতেন?

পূর্ব কথা ঃ সূরা মায়েদাহ্‌র ৫৫ নং আয়াতে আমরা পড়ে থাকি যে,

انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا اللذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون

- তোমাদের অভিভবাক ও পরিচালক হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, আর নামায আদায় করে থাকে ও রুকু অবস্থায় যাকাত দান করে।

মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত অনুযায়ী শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবের থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াতটি আমিরুল মু'মিনিন আলীর (আঃ) শানে নাযিল হয়েছে। আর তা হচ্ছে নবীর (সাঃ) পরে তিনিই যে ওয়ালী বা রাহ্‌বার বা পরিচালক তার প্রমাণ। এই আয়াতটি ঐ সময় নাযিল হয় যখন আলী (আঃ) মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় একটি ফকির সেখানে এসে সাহায্য কামনা করলো। কেউ তাকে কিছু দিল না। হযরত আলী (আঃ) তখন রুকুতে ছিলেন সেই অবস্থাতে তিনি তাঁর ডান হাতের ছোট্ট আঙ্গুলটি দিয়ে ইশারা করলে সে কাছে আসে এবং আলীর (আঃ) আংটিটি খুলে নেয়। আর এভাবেই তিনি নামায আদায় করা অবস্থায় অংটিটি যাকাত হিসেবে ঐ ফকিরকে প্রদান করলেন। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়[১]।

এখন ঐ বিষয় সম্পর্কে একজন ছাত্র ও আলেমের মধ্যে যে মুনাযিরা হয়েছিল তা লক্ষ্য করবো ঃ

ছাত্র ঃ আমরা শুনেছি যে, ইমাম আলী (আঃ) তাঁর অংটিটি ফকিরকে দিলেন। তা ছিল অনেক দামী। বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন তফসিরে বুরহানে (খণ্ড-১, পৃঃ-৪৮৪) এসেছে যে, ঐ আংটিটি পাঁচ মিসকাল লাল ইয়াকুত পাথরের ছিল এবং তার মূল্য ছিল শাম শহরের খাজনার সমপরিমান।

আলী (আঃ) এই আংটিটি কোথা থেকে এনেছিলেন? তিনি কি তাহলে বিলাসিতা পছন্দকারী? আর এত দামী আংটি পরা কি অপব্যয় নয়? আর অন্য দিক দিয়ে ইমাম আলী (আঃ) সম্পর্কে এমন কথা বলা উচিৎ নয়, কেননা তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে

---

[১]। উক্ত আয়াতটি যে, ইমাম আলীর (আঃ) শানে নাযিল হয়েছে সে ব্যাপারে গায়াতুল মারাম কিতাব আহ্‌লে সুন্নাতের উদ্ধৃতি দিয়ে ২৪ টি এবং শিয়া মাযহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯ টি হাদীস উল্লেখ করেছে (মিনহাজুল বারা'য়াতু, খণ্ড-২, পৃঃ-৩৫০)।

জীবন-যাপন করতেন। তিনি তাঁর একটি বক্তব্যে এরূপ বলেন ঃ

فو الله ما كنـــزت من دنياكم تبراً و لا ادخرت من غنائمها و فراً، و لا اعددت لبالي ثوبي طمراً، و لا حزت من ارضها شبراً، و لا اخذت منه الا كقوت اتان دبرة

- আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুনিয়া থেকে চোখ তুলে নিয়েছি এবং গনিমত ও অর্থ জমিয়ে রাখি নি। আর আমার এই পুরাতন পোশাকটি বদল করে পরিধান করি নি এবং এক বিঘাৎ পরিমান জমিও আমার আয়ত্তে আনি নি। আর এই দুনিয়া থেকে অল্প কিছু খাদ্য এবং সামান্ন কিছু ছাড়া অন্য কিছু নেই নি[১]।

আলেম ঃ আলীর (আঃ) আংটির ব্যাপারে এ সব ভিত্তিহীন কথা। আর আমাদের কাছে উক্ত আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে যত রেওয়ায়েত এসেছে সেখানে তো এরূপ দামী আংটির কথা বলছে না। শুধুমাত্র তফসিরে বুরহানে এমন একটি হাদীস আনা হয়েছে। যদিও ঐ হাদীসটি হচ্ছে 'মুরসালাহ্' অর্থাৎ তাতে সনদের দিক থেকে সমস্যা রয়েছে। আর তার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন সম্ভবনাই অধিক যে, কোন দুষ্ট লোকের নষ্ট হাতের থাবায় আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে এরূপ হাদীস লিখিত হয়েছে।

ছাত্র ঃ অবশ্যই তাঁর ঐরূপ দামী আংটি ছিল নইলে কিভাবে ফকির তা দিয়ে ক্ষুধা মুক্ত হবে? আর যদি তার কোন মূল্য না থেকে থাকে তবে তা দিয়ে এক দিনের জন্যও ফকিরের পেটের ভাত হবে না।

আলেম ঃ যদি ধরেও নেই যে, আলীর (আঃ) আংটি দামী ছিল। যেমন কবি বলেছেঃ

হে ভিখারী! আলীর ঘরের দরজা নাড়াও গিয়ে,
সেখানে পাবে পুরস্কার তাঁর হাতে ও কারামে।

ইতিহাসে এসেছে যে, আলীর (আঃ) ঐ আংটিটি মারওয়ান বিন তুক নামে এক মুশরিকের ছিল। যুদ্ধে আলীর (আঃ) হাতে কতল হলে তিনি তার আংটিটি রাসূলের (সাঃ) কাছে গনিমত হিসেবে নিয়ে আসেন। নবী (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, আলী (আঃ) গনিমত হিসেবে ঐ আংটি পাবে। কেননা নবী (সাঃ) জানতেন যে, যদি আলীর (আঃ) কাছে ঐ আংটি দেয়া হয় তবে তিনি তা আমিন হিসেবে দেখে রাখবে। আর বিশেষ কোন সময়ে অভাবির অভাব পূরণার্থে তা ব্যবহার করবে। সুতরাং আলী (আঃ) ঐ আংটিকে ক্রয় করেন নি। আর হয়তো কয়েক দিন তাঁর কাছে সেটা ছিল। যখনই ঐ

---

[১]। নাহাজুল বালাগা, ৪৫ নং চিঠি। এই চিঠির বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ইমাম আলীর (আঃ) যোহদের (প্রয়োজনের অতিরিক্ত করেন না) ব্যাপারে উল্লেখ হয়েছে। আর এই সুত্রে তাঁর উদ্দেশ্যে দামী আংটি পরার অপবাদ দেয়া অনুচিৎ।

ভিখারীর কাতর ধ্বনি শুনতে পলেন তখনই তিনি তার অভাব মিটানোর জন্য তাকে দিয়ে দিলেন[১]।

ছাত্র ঃ বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আলী (আঃ) নামায পড়ার সময় দুনিয়ার সব কিছুই ভুলে যেতেন। যেমন সিফ্‌ফিন যুদ্ধে তাঁর পায়ে তীর বিধেছিল কিন্তু ব্যথার কারণে কেউ তা বের করে আনতে পারছিল না। তিনি যখন নামায পড়তে শুরু করলেন তখন ইমাম হাসানের (আঃ) নির্দেশে তাঁর পা থেকে ঐ তীরটি বের করে আনা হয় কিন্তু তিনি কোন প্রকার টেরও পেলেন না। যদি তাই হয় তবে কিভাবে তিনি নামায পড়ার সময় ফকিরের আর্তনাদ শুনতে পেলেন বা তাকে আংটি দিলেন?!

আলেম ঃ যারা এটা বিশ্বাস করে না তারা জানে না যে, অভাবগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদ শোনা বা তাকে সাহায্য করার জন্য নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখার দরকার নেই বরং আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য রাখলেই যথেষ্ট। আলী (আঃ) নামাযে নিজেকে ভুলে যেতেন কিন্তু আল্লাহ্‌কে নয়। আর তাঁর বান্দাকে ভুলে যাওয়া মানেই তাকে ভুলে যাওয়া। অন্যভাবে যদি বলি তাহলে বলতে হয় যে, নামাযের মধ্যে যাকাত প্রদান করা হচ্ছে ইবাদতের মধ্যেই ইবাদতের আঞ্জাম দেয়া। আর যা কিছু ইবাদতী আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় তা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও দুনিয়াবী বিষয়। কিন্তু যা কিছু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন কল্পে নিয়োজিত তা অবশ্যই ইবাদতী আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তা আঞ্জাম দেয়ার জন্য গুরুত্বারোপও করে। আমাদের অবশ্যই এটা জানা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে নিজের পরিচালন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। বরং সে নিজের ইচ্ছায় যা কিছু আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে না সেই পথ থেকে সরে আসবে।

---

[১]। ওয়াকায়েউ'ল আইয়্যাম, পৃঃ-৬২৭।

৮৪- পবিত্র কোরআনে কেন আলীর (আঃ) নাম নেই?

শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের কয়েকজন আলেমের মধ্যে এক দারুণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারা সবাই স্থির করলো যে, কোন প্রকার গোড়ামী ও পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সুষ্ট আলোচনার ভিত্তিতে ইসলামের একটি মাযহাবকে সত্য বলে ঘোষণা দিবে। তাদের আলোচনা শুরু হল ঃ

সুন্নী আলেম ঃ যদি আলী (আঃ) নবীর (সাঃ) পরবর্তী খলিফা হয়ে থাকেন তবে যাতে করে মুসলমানরা পরবর্তীতে বিরোধ না করে সে জন্য তাঁর নাম কোরআন মজিদে উল্লেখ হওয়া প্রয়োজন ছিল।

শিয়া আলেম ঃ নবীর (সাঃ) কোন সাহাবার নামই কোরআনে উল্লেখ হয় নি, শুধুমাত্র যাইদ ইবনে হারিছাহ্ ব্যতীত। তাও তা এসেছে শুধুমাত্র যাইদের পূর্বের স্ত্রীর সাথে নবীর (সাঃ) বিয়ে হওয়ার কারণে[১]।

সুন্নী আলেম ঃ যেভাবে যাইদের নাম একটি ঘটনার বর্ণনায় কোরআনে এসেছে সেভাবে ইমামতের বিষয় উল্লেখ পূর্বক আলীর (আঃ) নামও কোরআনে আসা আবশ্যক ছিল।

শিয়া আলেম ঃ যদি আলীর (আঃ) নাম উল্লেখ হত তাহলে তাঁর শত্রুর সংখ্যাও কয়েক গুনে বেড়ে যেত। আর যেহেতু তখন কোরআনের সংখ্যা বেশী ছিল না তাই সহজেই তা পরিবর্তন করা সম্ভব হত এবং তাঁর নাম কোরআন থেকে মুছে ফেলতো। তাই এটাই উত্তম ছিল যে, বিভিন্ন বিশেষণ উল্লেখ করার মাধ্যমে তাঁর নবীর (সাঃ) স্থালাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারটা বর্ণনা হোক। আর যেহেতু কোরআনের পদ্ধতি হচ্ছে আসল বিষয়গুলো বয়ান করা এবং তার ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্ব ছিল নবীর (সাঃ)।

সুন্নী আলেম ঃ কোরআনের কোথায় আলীর (আঃ) বিশেষণ এসেছে?

শিয়া আলেম ঃ কোরআনে প্রচুর আয়াত আলীর (আঃ) উদ্দেশ্যে এসেছে, যেমনঃ আয়াতে বিলায়াত (মায়েদাহ্ ঃ ৫৫), আয়াতে ইতায়াত (নিসা ঃ ৫৯), আয়াতে মুবাহিলাহ্ (আলে ইমরান ঃ ৬১), আয়াতে তাত্হীর (আহ্যাব ঃ ৩৩), আয়াতে ইবলাগ (মায়েদাহ্ ঃ ৬৭), আয়াতে আকমাল (মায়েদাহ্ ঃ ৩) আরো ....[২]।

উক্ত আয়াতসমূহের ব্যাপারে শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবের পক্ষ থেকে নবীর (সাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে যত হাদীস এসেছে এবং সেগুলোর শানে নুযুল অনুযায়ী প্রতিটি

---

[১]। فلما قض زيد منها وطراً زوجناكها (আহ্যাব/৩৭)।

[২]। এই আয়াতের বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখুন দালায়েলুস সিদক, খণ্ড-২, পৃঃ-৭৩ থেকে ৩২১।

আয়াতই ইমাম আলীর (আঃ) খেলাফত ও ইমামতের পক্ষে নাযিল হয়েছে। কেননা কোরআন বলছে ঃ

و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

যা কিছু রাসূলে খোদা (সাঃ) তোমাদের জন্য নিয়ে আসবেন এবং তোমাদের প্রতি আদেশ করবেন, তা শ্রবণ করবে এবং আঞ্জাম দিবে। আর যা কিছু তিনি নিষেধ করবেন তা আঞ্জাম দেয়া থেকে বিরত থাকবে[১]।

হাদীসে সাকালাইন অনুসারে যা সকল মুসলমান গ্রহণ করে থাকে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি, ১- আল্লাহ্‌র কোরআন ও ২- আমার ইতরাত (আহ্‌লি বাইত)।

আর তোমাদের অনেক রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি বলেছেন ঃ আমি তেমাাদের মধ্যে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি একটি আল্লাহ্‌র কোরআন এবং অপরটি আমার সুন্নত।

সুতরাং অবশ্যই সুন্নত অর্থাৎ নবীর (সাঃ) আদেশ-নিষেধ মেনে চলবো এবং তা মেনে নিবো। সে দিকে গভীর লক্ষ্য করলে উক্ত আয়াত নবীর (সাঃ) সুন্নত অনুযায়ী ইমাম আলীর (আঃ) শানে নাযিল হয়েছে। অতএব, পবিত্র কোরআন ইমাম আলীকে (আঃ) নবীর (সাঃ) পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। যদিও কোন মঙ্গলার্থে তাঁর নাম কোরআনে আসেনি। যেমন সম্পূর্ণ কোরআনে শুধুমাত্র চার বার নবীর (সাঃ) অর্থাৎ "মুহাম্মদ" এবং একবার "আহ্‌মাদ" নাম উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু কোরআনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে ইশারা করে অথবা তাঁর সুত্র ধরে কথা বলা হয়েছে[২]।

---

[১]। হাশ্‌র ঃ ৭।

[২]। সাধারণত আক্বল ও বিবেক দিয়ে যদি বিচার করি তাহলে যা কিছু অধিক মর্যাদা হিসেবে কোরআনে উল্লেখ হয়েছে যেমন ঃ তাকওয়া, জ্ঞান, জিহাদ, হিজরাত, আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ দান করা ও ...., এবং নবীর (সাঃ) পরে উক্ত মর্যাদার দিক দিয়ে অন্যদের থেকে সর্বোৎকৃষ্ট তিনি আলী (আঃ) ব্যতীত অন্য কেউ নন। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশেষ ব্যক্তিত্ব অর্জিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ ব্যক্তিত্ব অর্জনকারীদের স্থানে অবস্থান করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোরআন আমাদেরকে নবীর (সাঃ) পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাঁর পরে ইমাম আলীর (আঃ) ইমাম ও খেলাফতের ঘোষণা দিচ্ছে এবং আমাদেরকে সে দিকে অগ্রসরীত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। কেননা কোরআন বলছে ঃ

افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون

যে ব্যক্তি সত্যের প্রতি হেদায়াত করে, তার আনুগত্য করা শ্রেয় না কি যে নিজে হেদায়াত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে হেদায়াত না করছে, তোমাদের কি হবে? কিভাবে বিচার করবে?

৮৫- শিয়া মাযহাবের অনুসারী হওয়ার যৌক্তিকতা

পূর্বের সভায় ঐ প্রক্রিয়ায় তাদের মুনাযিরা অব্যাহত ছিল।

সুন্নী আলেম প্রসঙ্গ পাল্টে বলল ঃ এখন যদি আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, পাঁচ মাযহাবের (হানাফি, হাম্বালি, মালেকি, শাফেয়ী' ও জা'ফারী) একটিকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে সেটা কোন মাযহাব হবে?

শিয়া আলেম ঃ যদি ইনসাফের মাধ্যমে বিচার কর তবে অবশ্যই জা'ফারী মাযহাবকে অনুসরণ করতে হবে। কেননা জা'ফারী মাযহাব ইমাম সাদিকের (আঃ) ও নবীর (সাঃ) অন্যান্য আহ্‌লে বাইতগণের (আঃ) কাছ থেকে এসেছে। আর ইমাম সাদিক অবশ্যই ইসলামী নিয়ম-নীতি সম্পর্কে কোরআন ও নবীর (সাঃ) সুন্নতের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী।

(এ বিষয়ে ৭৪ নং মুনাযিরাতে বিস্তারীত আলোচনা করা হয়েছে)।

এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে মিশরের আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর এবং মুফ্‌তী শেইখ মাহ্‌মুদ সালতুতের একটি ঐতিহাসীক ফতোয়া যা তার দফতর থেকে 'জামি'ইয়্যাতু দারুত তাকরিবি বাইনাল মাযাহিবিল ইসলামিয়া' -তে পাঠানো হয়েছিল এবং তা ১৩৭৯ হিজরীতে 'রিসালাতুল ইসলাম' নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল তার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরলাম ঃ

শেইখ মাহ্‌মুদ সালতুত তার ফতোয়ার এক অংশে এভাবে লিখেছেন ঃ

অবশ্যই জা'ফারী মাযহাব, মাযহাবে শিয়া ১২ ইমামী হিসেবে বিশেষ পরিচিত;

সুতরাং একজন সঠিক ও উপযুক্ত ব্যক্তি বা সাংস্কৃতিকে নির্ণয় করাটা হচ্ছে একশ ভাগ বিবেক সম্মত ও ইসলামী। কেননা রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ

من تقدم على المسلمين و هو يرى ان فيهم من هو افضل منه، فقد خان الله و رسوله و المؤمنين

মুসলমানদের মধ্যে অধিক উত্তম কোন ব্যক্তি থাকা সত্বেও অন্য কেউ যদি তাদের নেতা হতে চায় তবে এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে খেয়ানত করেছে (আল্ গাদীর, খণ্ড-৮)।

তা এমন এক মাযহাব যার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা আহ্‌লে সুন্নাতরে অন্যান্য মাযহাবের মতই শরিয়াতগত ভাবে জায়েয। সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি অবগত থাকা মুসলমানদের জন্য উত্তম। আর তা একটি আলাদা মাযাহাব হিসেবে অহেতুক গোড়ামী করা থেকে দুরে থাকা এবং তারা যেন কোন বিশেষ মাযহাবকে অনুসরণ করার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব না করেন। এই মাযহাবের বিশিষ্ট আলেমগণ হচ্ছেন মুজতাহিদ। তাদের ফতোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য। আর যারা মুজতাহিদ নয় তারা ইচ্ছা করলে ঐ সব আলেমদোকে অনুসরণ করতে পারেন এবং তাদের ফতোয়া অনুযায়ী চলতে পারেন। আর এই ক্ষেত্রে ইবাদত ও বেচা-কেনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই[১]।

*****

আহ্‌লে সুন্নাতের বড় বড় বুজুর্গ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যেমন ঃ আল্‌ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মুহাম্মদ ফাখ্‌খাম, কায়রো মসজিদের পরিচালক আব্দুর রহমান আন নাজারী, মিশরের একজন শিক্ষক ও লেখক আব্দুল মাকছুদ, উল্লেখিত সকলেই শেইখ মাহ্‌মুদ সালতুতের ঐতিহাসীক ফতোয়াকে সত্যায়ণ করেছেন।

মুহাম্মদ ফাখ্‌খাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'য়ালা শেইখ মাহ্‌মুদ সালতুতকে রহমত করুন, যিনি এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করেছেন ও শিয়া ১২ ইমামি মাযহাবকে ইসলামী এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আব্দুর রহমান আন নাজারী বলেন ঃ আমরা এখনো শেইখ মাহ্‌মুদ সালতুতের ঐতিহাসীক ফতোয়া অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে থাকি। যদিও আমি আহ্‌লে সুন্নাতের চার মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে থাকি তথাপিও শেইখ মাহ্‌মুদ সালতুত হচ্ছে ইমাম ও মুজতাহিদ তার সিদ্ধান্ত সকল সময় প্রকৃত সত্যের ন্যায় হয়ে থাকবে।

আব্দুল মাকছুদ বলেন ঃ শিয়া ১২ ইমামি মাযহাবটির উপযুক্ততা এমনই যে, আহ্‌লে সুন্নাতের মাযহাবগুলোর মতই তা অনুসরণযোগ্য। আর আহ্‌লে সুন্নাতের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না যে, কে কোন মাযহাবের অনুসারী হবে। যখন জানতে পারলাম যে, ঐ মাযহাবের মূল উৎস হচ্ছেন আলী (আঃ) তখন বুঝতে পারলাম যে, তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি নবীর (সাঃ) পর দ্বীনি বিষয়ে সকলের থেকে অধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন[২]।

১। রিসালাতুল ইসলাম (ম্যাগাজিন), দারুত তাকরিবি বাইনাল মাযাহিবিল ইসলামিয়া বিল কাহিরাহ্‌, সাল ১১, সংখ্যা-৩, পৃঃ-২২৭, ১৩৭৯ হিজরী।

২। ফি সাবিলিল ওয়াহাদালিল ইসলামিয়া (সাইয়্যেদ মুর্তাযা রাযাভী), পৃঃ-৫২, ৫৪, ৫৫।

৮৬- ওলি আউলিয়াদের কবরের উপর নির্মানকৃত মাযার বা গম্মুজসমূহ ধ্বংস করা বৈধ কিনা সে ব্যাপারে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ মদীনায় ছিলাম, ইসলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবরসমূহ যেমন ইমাম হাসান (আঃ), ইমাম সাজ্জাদ (আঃ), ইমাম বাকির (আঃ), ইমাম সাদিক (আঃ) এবং ....যমিন বরাবর হয়ে গেছে দেখলাম। দুঃখিত হলাম। কেননা উক্ত কবরসমূহ এক সময় বরগাহ্ ছিল। কিন্তু ওহাবীরা শির্ক ও হারামের দোহাই দিয়ে সেগুলোকে (১৩৪৪ হিজরীতে) মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়ে একজন শিয়া ও একজন ওহাবীর মধ্যে মুনাযিরা অনুষ্ঠিত হয় যা নিম্নরূপ ঃ

শিয়া আলেম ঃ কেন এই কবরগুলোকে ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছো? কেন এগুলোর প্রতি অসম্মান করে থাকো?

ওহাবী ঃ আপনারা কি হযরত আলীকে (আঃ) কবুল করেন?

শিয়া আলেম ঃ অবশ্যই, তিনি আমাদের প্রথম ইমাম এবং নবীর (সাঃ) পরবর্তী খলিফা।

ওহাবী ঃ আমাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে [১] উল্লেখ হয়েছে যে,

حدثنا يحيى بن يحيى، و ابوبكر ابي شيبه و زهير بن حرب قال : يحيى اخبرنا، و قال الآخران، حدثنا : وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الهياج الاسدي قال لي علي بن ابيطالب : الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله (ص) ان لا تدع تمثالاً الا طمسته و لا قبراً مشرفاً الا سويته

- তিনজন যথাক্রমে ইয়াহিয়া, আবু বকর ও যুহির ও .... উল্লেখ করে যে, ওয়াকিই' সুফিয়ান থেকে, সে হাবিব থেকে এবং সে ওয়াইলের থেকে এবং সে আবি ইলিহাজের থেকে উল্লেখ করেছে যে, আলী (আঃ) আবি ইলিহাজকে বলেছেন ঃ "তোমাকে একটি কাজে নিযুক্ত করবো, যে কাজে নবী (সাঃ) আমাকে নিযুক্ত করেছিল, আর তা হচ্ছে কোন ছবিকে সরিয়ে দিবে না যতক্ষণ না তা ধ্বংস করছো এবং উচু কবরকে ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছ।

শিয়া আলেম ঃ এই হাদীসটির সনদের দিক থেকে এবং এই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে।

---

[১]। সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড-৩, পৃঃ-৬১, সুনানে তিরমিযী, খণ্ড-২, পৃঃ-২৫৬, সুনানে নিসাই, খণ্ড-৪, পৃঃ-৮৮।

সনদের দিক থেকে ঃ ১- ওয়াকিই[১], ২- সুফিয়ান, ৩- হাবিব বিন আবি সাবিত, ৪- আবি ওয়াইল উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে এমন কোন হাদীসবিদ নেই যে, তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ আহ্‌মদ ইবনে হাম্বাল ওয়াকিই'ইর ব্যাপারে লিখেছে যে, সে ৫০০টি হাদীসের ক্ষেত্রে ভুল করেছে[১]।

এবং সুফিয়ানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সে হাদীস বলতো এবং তাদলিস (মিথ্যাকে সত্য রূপে বয়ান) করতো। এমতাবস্থায় সে আমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছিল[২]।

এবং হাবিব বিন আবি ছাবিতের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সে তাদলিস করতো[৩]।

এবং আবি ওয়াইলের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সে ইমাম আলী (আঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করতো[৪]।

বিশেষ কথা হচ্ছে যে, আহ্‌লে সুন্নতের সহীহ্ সিত্তাতে আবু ইলিহাজের একটি মাত্র হাদীস উক্ত ছয়টি গ্রন্থে রয়েছে। আর তা থেকেই বুঝা যায় যে, সে হাদীস বেত্তা ছিল না এবং তাকে কেউ বিশ্বাসও করতো না। সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বস্ত।

এখন হাদীসটির দলিল ও উপাদন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আলোচনা ঃ

ক)- 'মুসরিফ' শব্দটি যা উক্ত হাদীসে এসেছে তার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উচু স্থান যা অন্যান্য স্থানের থেকে উচু এবং সুদৃঢ়। সুতরাং যে কোন ধরনের উচু স্থানই এর আওতায় পড়বে না।

খ)- 'সাউয়্যাইতাহ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন দুটি জিনিষকে সমরূপে স্থান দেয়া বা বাকা হয়ে যাওয়া কোন জিনিষকে সোজা করা।

সুতরাং উক্ত হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যে কোন উচু কবরকে ধ্বংশ করে দাও।

আর যমিনের সমান সমান কবর থাকাটা হচ্ছে সুন্নাতে ইসলামির বরখিলাপ। কেননা ইসলামের ফকীহ্‌গণ কবরকে যমিন থেকে এক বিঘৎ পর্যন্ত উচু করে রাখার ফতোয়া দিয়েছেন[৫]।

'সাউয়্যাইতাহ' শব্দের আরো একটি অর্থ হতে পারে যে, কবরের উচ্চতাসমূহকে মাছের ও উটের পিঠের মত না করে সমান করে দাও। কেননা আহ্‌লে সুন্নাতের বড়

১। তাহ্‌যিবুত তাহ্‌যিব, খণ্ড-১১, পৃঃ-১২৫।
২। ঐ , খণ্ড-৪, পৃঃ-১১৫।
৩। ঐ , খণ্ড-৩, পৃঃ-১৭৯।
৪। শারহে নাহ্‌জু হাদিদি, খণ্ড-৯, পৃঃ-৯৯।
৫। আল্ ফীকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'য়াহ্, খণ্ড-১, পৃঃ-৪২০।

বড় আলেমগণ যেমন মুসলিম তার সহীহাতে, তিরমিযী ও নিসাই তাদের সুনানে উক্ত হাদীসের এরূপ অর্থ করেছেন।

ফলাফল ঃ উক্ত তিনটি সম্ভাবনা থেকে (১- কবর উচ্চতাকে নষ্ট করে দেয়া, ২- কবরসমূহকে যমিনের সমান সমান রাখা, ৩- কবরের উচ্চতাকে সমান্তরাল রূপে রাখা) এটা পরিস্কার যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনা দুটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তৃতীয় সম্ভাবনাটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং উক্ত হাদীসটি কোন প্রকারেই কবরের স্থাপত্যকে নষ্ট করার প্রতি নির্দেশ দেয় না[১]।

আরো বলা উচিৎ যে, যদি ইমাম আলী (আঃ) কবরের স্থাপত্যকে নষ্ট করাকে প্রয়োজন মনে করতেন তাহলে কেন নিজের খেলাফত কালে আল্লাহ্‌র অলি-আউলিয়াগণ ও নবীগণের কবরের স্থাপত্যসমূহকে নষ্ট করে দেন নি বা ইতিহাস তেমন কোন সাক্ষ্যও দিচ্ছে না?!

আর বর্তমান সময়ে যদি ওয়াহাবীরা কবরের স্থাপত্যকে নষ্ট করাকে প্রয়োজন মনে করে থাকে তবে কেন নবী (সাঃ), আবু বকর ও ওমরের কবরের স্থাপত্যকে নষ্ট করছে না?!

ওয়াহাবী ঃ নবী (সাঃ), আবু বকর ও ওমরের কবরের স্থাপত্য নষ্ট না করার কারণ হচ্ছে যে, কবর ও নামাযীদের মধ্যে একটি দেয়াল থাকা দরকার। যাতে করে নামাযীরা ঐ কবরগুলোকে নিজেদের কিবলা নির্দিষ্ট না করে বা ঐ কবর সমূহের উপর সিজদা না দেয়।

শিয়া আলেম ঃ তুমি যা বলছো তা অন্যভাবেও সমাধান করা যেত।

ওয়াহাবী ঃ তোমার কাছে আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, কোরআনে এমন কোন দলিল আছে কি যাতে আল্লাহ্‌র আউলিয়াদের কবরের উপর মাজার তৈরী করার অনুমতি দিয়েছে?

শিয়া আলেম ঃ প্রথমত ঃ এমনটি নয় যে, কোরআনে সকল বিষয়ে এমনকি মুসতাহাব বিষয়েও নির্দেশ দেয়া থাকবে। যদি এমনটি থাকতো তাহলে তা বর্তমানে কোরআনের যে আয়াতন রয়েছে তার থেকেও কয়েকশ গুণ আয়াতন বৃদ্ধি পেত।

দ্বিতীয়ত ঃ কোরআনে এই বিষয়ের প্রতি ইশারা হয়েছে। যেমন সূরা হাজ্জের ৩২ নং আয়াতে পড়ে থাকবো ঃ

و من يعظّم شعائر الله فانّها من تقوى القلوب

যারা এলাহী শ্লোগানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অনুগত্য করে, এরূপ কাজ তাদের

---

[১]। ইকতিবাস ও আইনে ওয়াহাবীয়াতের সারাংশ, পৃঃ-৫৬ থেকে ৬৪।

অন্তরে তাকওয়ার নিদর্কই স্বরূপ।

'শায়া'ইর' শব্দটি হচ্ছে 'শাঈ'রাতুন' শব্দের বহুবচন যার অর্থ হচ্ছে নিদর্শন। এই আয়াতের অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্র অস্তিত্বের নিদর্শন নয়, (কেননা এ পৃথিবীর সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন) বরং আল্লাহ্র দ্বীনের নিদর্শন সমূহ[১]।

যা কিছু আল্লাহ্র দ্বীনের নিদর্শন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভক্তি করা হচ্ছে ওয়াজিব এবং এমন কাজ তাঁর নিকটবর্তীও করে। যেহেতু আল্লাহ্র অলি-আউলিয়া, নবীগণ ও ইমামগণ (আলাইহিমুস সালাম) মানুষকে তাঁর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত করতেন, তাই তাদের কবরসমূহও দ্বীনের নিদর্শন হয়ে থাকবে। তাদের কবর সমূহকে যদি আমরা সুন্দর্যমণ্ডিত করি এবং আল্লাহ্র দ্বীনের নিদর্শনের প্রতি সম্মান দেখাই তবে

তা অবশ্যই কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আঞ্জাম দিয়েছি।

সূরা শুরার ২৩ নং আয়াতে নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করাটাই রিসালতের মুজুরি হিসেবে বয়ান হয়েছে[২]।

যদি আমরা নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতকে ভালবেসে তাদের করব সমূহকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখি এবং সম্মানজনক ভাবে তার উপর দালান তৈরী করি তাহলে কি কোন অন্যায় করবো? অবশ্যই অন্যায় করবো না।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ কোরআন মজীদ যদি ধুলা-বালির মধ্যে পড়ে থাকে তাহলে কি তার প্রতি অসম্মান করা হয় না? আর যদি কোরআন মজীদটিকে একটি সুন্দর স্থানে সম্মানের সাথে রাখা হয় তাহলে কি তার প্রতি সম্মান দেয়া হয় না?!

ওয়াহাবী ঃ এ সব যা বলছো তা সামাজিক ভাবে খুব পছন্দনীয় ব্যাপার। কিন্তু কোরআন ঐ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোন নির্দেশ দেয় নি।

শিয়া আলেম ঃ কোরআনে আসহাবে কাহ্ফের ব্যাপারে এসেছে যে, যখন তারা গুহার মধ্যে লুফিয়ে ছিল এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন মানুষ তাদের ঐ গুহাটি খুজে পেয়েছিল। তারা ঐ স্থানটিকে কোন রূপে রূপায়িত করবে সে ব্যাপারে শোরগোল করছিল, একদল বলল ঃ

ابنوا عليهم بنياناً (ঐ গুহার উপর দালান নির্মাণ কর)।

কিন্তু অন্য আরেক দল (যারা তাদের গুহাতে লুকিয়ে থাকার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে পেরেছিল) বলল ঃ

لنتخذن عليهم مسجداً (ঐ গুহার পাশে মসজিদ নির্মাণ কর)[৩]।

---

[১] । মাজমাউ'ল বায়ান, খণ্ড-৪, পৃঃ-৮৩ (মায়া'লিমি দ্বীনিল্লাহ্)।

[২] । قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في القربى

[৩] । কাহ্ফ ঃ ২১।

পবিত্র কোরআন কোন প্রকার মন্তব্য ছাড়াই ঐ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই উল্লেখ করেছে। যদি এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির যে কোন একটি ভুল থাকতো তাহলে অবশ্যই কোরআন ঐ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির উপর মন্তব্য করতো। যা হোক এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আল্লাহ্র অলি-আউলিয়াদের কবরের উপর সম্মান প্রদর্শনের নমুনা স্বরূপ।

অতএব, উক্ত তিনটি আয়াত (১- এলাহী শ্লোগানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ২- নবীর (সাঃ) আহ্লে বাইতের প্রতি ভালবাসা প্রদার্শন, ৩- আসহাবে কাহ্ফের কবরের ব্যাপারে সৃষ্ট দুটি দৃষ্টিভঙ্গি) হচ্ছে অনুমতি স্বরূপ, বরং মুসতাহাব হচ্ছে আল্লাহ্র অলি-আউলিয়াদের কবর সমূহে মাজার নির্মাণ করা[১]।

---

[১]। ইকতিবাস আইনে ওয়াহাবীয়াত থেকে, পৃঃ-৪৩ থেকে ৪৬।

৮৭- ইমাম আলীর (আঃ) কা'বায় জন্মগ্রহণ নিয়ে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ আলীর (আঃ) অনেকগুলোর মধ্যে একটি গর্বের বিষয় হচ্ছে এটাই যে, তিনি পৃথিবীর সব থেকে পবিত্র স্থান কা'বা ঘরের মধ্যে ভূমিষ্ট হন। এ বিষয়টি শিয়া ও সুন্নী নির্বিশেষে গ্রহণ করে থাকে। আর আল্লামা আমিনি তার মূল্যবান গ্রন্থ আল গাদীরের ষষ্ঠ খণ্ডে সুন্নীদের ১৬ টি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করছেন। এই বিষয়টি উপযুক্ত সনদের ভিত্তিতে জীবিত হয়ে আছে যা অন্যদের থেকে তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তারই বহিঃপ্রকাশ। হয়তো পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য এটা আলোর দিশারী হতে পারে।

হাকিম নিশাপূরী নিজের মুসতাদরাকের ৩ নং খণ্ডের ৪৭৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছন যে, এই হাদীসটি মুতাওয়াতির (অর্থাৎ এত অধিক পরিমানে নির্ভরযোগ্য সূত্রে উল্লেখ হয়েছে যে, তার প্রতি আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না)। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মুনাযিরাটি লক্ষ্য করুন ঃ

সুন্নী আলেম ঃ ইতিহাসে এসেছে যে, হাকিম ইবনে হাযযামও নাকি কা'বায় জন্মগ্রহণ করেছিল।

শিয়া আলেম ঃ এরূপ হাদীস ইতিহাসে প্রমাণ নেই। আর বড় বড় আলেমগণ যেমন ঃ ইবনে সাব্বাগ মালেকি[১], কুনজি শাফেয়ী[২], সাবলামজি[৩], মুহাম্মদ বিন আবি তালাহ্ শাফেয়ী[৪] বলেছেন যে,

لم يولد في الكعبة احد قبله

- কেউ আলীর (আঃ) আগে কা'বায় জন্মগ্রহণ করে নি।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, হাকিম বিন হায্যাম আলীর (আঃ) থেকে কয়েক বছরের বড় হবে। তাই এই মিথ্যা কথা রটিয়ে ইমামের কা'বা ঘরে জন্মগ্রহণকে হালকা করে দিতে চায়।

সুন্নী আলেম ঃ কা'বা ঘরে জন্ম নেয়াটা ঐ নবজাতকের জন্য এত কি গর্বের বিষয়?

শিয়া আলেম ঃ এক মহিলা যদি হটাৎ করে কোন পবিত্র স্থানে সন্তান প্রসব করে তাহলে তা কোন গর্বের বিষয় হতে পারে না। কিন্তু যদি এরূপ একটি ঘটনার সাথে

১। আল্ ফুছুলুল মুহাম্মামাহ্, পৃঃ-১৪।

২। কিফায়াতুত তালিব, পৃঃ-৩৬১।

৩। নূরুল আবছার, পৃঃ-৭৬।

৪। মাতালিবুস সাউল, পৃঃ-১১।

ঐশী নির্দেশ থেকে থাকে এবং আল্লাহ্‌র কৃপা ও ক্ষমতা কারো ভাগ্যে আসে, আর সে কারণেই কোন মহিলা পবিত্র কা'বা ঘরে সন্তান প্রসব করেন তবে তা ঐ নবজাতকের জন্য হবে একটি অলৌকিক বিষয়। সাথে সাথে ঐ শিশুটিও হবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং পবিত্র। আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বিশেষ কৃপায় আলীর (আঃ) কা'বা ঘরে জন্ম গ্রহণ করাটা, তাঁর জন্য একটি উচ্চ মর্যাদাকর ব্যাপার এবং তিনি অতি পবিত্রও বটে। কেননা কা'বার দেয়াল ফেটে যাওয়া এবং আলীর (আঃ) মায়ের তার ভিতবে প্রবেশ করাটা ঐ দলিলের ভিত্তিতে মু'জিযা বৈ অন্য কিছুই নয়[১]।

সুন্নী আলেম ঃ কা'বায় আলী (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নবীর (সাঃ) নবুওয়াত প্রকাশের দশ বছর আগে, আর তখন তার মধ্যে প্রচুর মূর্তি ছিল। সুতরাং ঐ সময় কা'বা আধ্যাত্মিকতার সম্মানে ভূষিত ছিল না। আর তখন তাকে শুধুমাত্র মূর্তির ঘর বৈ অন্য কিছু বলা হত না। এই সূত্রে আলী (আঃ) একটি মূর্তি ভর্তি ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছেন যা কোন মর্যাদা বা সম্মানের বিষয় নয়।

শিয়া আলেম ঃ কা'বা সর্ব প্রথম ইবাদত গৃহ যা পৃথিবীর বুকে নির্মিত ছিল (আলে ইমরান)।

হযরত আদম (আঃ) তা নির্মাণ করেছিলেন এবং হাজারাল আসওয়াদকে বেহেশ্‌ত থেকে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে তা নূহের (আঃ) সময় যে তুফান এসেছিল তাতে নষ্ট হয়ে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌওহীদি বীর পুনরায় তা নির্মাণ করেন। কা'বা ঘর সকল সময় আল্লাহ্‌র নবীগণ ও অলি-আউলিয়া এবং ফেরেশ্‌তাগণের পদ চারণার স্থান ছিল। যদি এমন কোন পবিত্র স্থান, কালের বিবর্তনে মূর্তি পুজারীদের ক্ষমতার আওতায় চলে যায় এবং তারা সেখানে মূর্তি তুলে পুজা করতে শুরু করে, তবে তাতে ঐ পবিত্র স্থানের আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা কমে যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ বোতলে করে মদ নিয়ে মসজিদে যায় তবে কি মসজিদের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও মর্যাদা খর্ব হয়? অবশ্যই তা হয় না।

তদ্রূপ যদি কেউ জুনুব থাকা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে তবে অথবা মদের বোতল নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে তবে সে মসজিদের আবমাননা করলো এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের বশবর্তী হল। কিন্তু ফাতিমা বিনতে আসাদ যখন আল্লাহ্‌র কৃপায় কা'বার মধ্যে প্রবেশ করে আলীকে (আঃ) প্রসব করেন তখন এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, তিনি এবং তাঁর মা পবিত্রতার দিক থেকে কত উচ্চে ছিলেন। আর তাদের থেকে সমস্ত রকমের অপবিত্রতা দুরে ছিল। কোন গোনাহ্‌ তো করেনই নি বরং তারা আল্লাহ্‌র মেহ্‌মান হিসেবে সেখানে ছিলেন। আর তাদের মেজবান ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'য়ালা। তিনি তাদেরকে তাঁর ঘরে দাওয়াত করেছিলেন। সুতরাং এই বিষয়টিই ইমাম

---

[১]। দালায়েলুছ ছিদক, খণ্ড-২, পৃঃ- ৫০৮ ও ৫০৯।

আলীর (আঃ) জন্ম হচ্ছে বিশেষ গর্বের।

আর এ কারণেই ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই কুদরাতের উপর বিভিন্ন কবিতাও লিখেন। তারা তাদের কবিতায় এই বিষয়টিকে একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে রূপায়িত করেছেন।

আব্দুল বাকি আ'মরী ইমাম আলীকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে বলে ঃ

انت العلى الذي فوق العلى رفعاً

بيطن مكة وسط البيت اذ وضعاً

- তুমি সেই আলী, যে মর্যাদা সম্পন্ন শীর্ষ স্থান থেকে আরো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শীর্ষ স্থানে উন্নিত হয়েছো,

- এবং মক্কায় কা'বার অভ্যন্তরে দুনিয়ায় কদম রেখেছো[১]।

ফার্সী সাহিত্যিক বলে ঃ

কা'বায় জন্মেছো আর মেহ্‌রাবে হয়েছো শহীদ,

শ্রদ্ধা জানায় তোমার উত্তম শুরু আর উত্তম পরিসমাপ্তির।

সুন্নী আলেম, আর কোন উত্তর দিতে না পেরে মুনাযিরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলো।

---

[১]। দালায়েলুছ ছিদক, খণ্ড-২, পৃঃ-৫০৯ ও ৫১০।

৮৮- "ইমামত" ও "আসহাবি কান্নুজুম" হাদীসের ব্যাপারে মুনাযিরা

শিয়া আলেম ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, নবীর (সাঃ) ইমামত, খেলাফত ও স্থলাভিষিক্ততা হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার বুকে বড় ধরনের দায়িত্ব। কেননা নবীর (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত হলে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং দ্বীনের আহ্‌কামকে প্রচার-প্রসার করতে হবে, আল্লাহ্‌র হুদুদ এবং শরীয়তকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আর যে কোন ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদকে ধ্বংস করতে হবে। আর যে কোন ব্যাক্তিই এই গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখ না। এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামের যেমন ঃ তাকওয়া, জিহাদ, জ্ঞান, হিজরত, যোহ্‌দ, অতিত ভাল, রাজনীতি, ন্যায়পরায়নতা, সাহসীকতা, প্রশস্ত বক্ষ ও উন্নত চিন্তাশীল এবং উত্তম বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সকলের থেকে উপরে থাকতে হবে। আর তেমন ব্যক্তি শিয়া ও সুন্নীর ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী আলী (আঃ) ব্যতীত কেউ নেই বা থাকবেও না।

সুন্নী আলেম ঃ নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

اصحابي كالنجوم بايهم اقتيتم اهتديتم

- আমার সাহাবাগণ অনুরূপ তারকা রাজীর ন্যায়। তাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ করলেই হিদায়তের পথ পাবে[১]।

সুতরাং নবীর (সাঃ) পরে তাঁর যে কোন সাহাবাকেই অনুসরণ করলেই নাজাত পেয়ে যাবো।

শিয়া আলেম ঃ হাদীসটির সনদের দিকে লক্ষ্য করা ব্যতীত আরো কয়েকটি দলিলের ভিত্তিতে তা হচ্ছে তৈরীকৃত হাদীস এবং তার কোন মূল্য নেই। কেননা নবী (সাঃ) তেমন হাদীসই বলেন নি।

সুন্নী আলেম ঃ আপনার কথার দলিল কী?

শিয়া আলেম ঃ এই হাদীস যে মিথ্যা তা প্রমাণের অনেক পথ রয়েছে যেমন ঃ

১- রাতে সফরকারীরা রাস্তায় চলতে চলতে যখন পথ হারিয়ে ফেলে তখন আকাশের বুকে মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র থাকে, যদি মনের ইচ্ছা মত যে কোন একটি নক্ষত্রকে নির্দেশক হিসেবে নির্দিষ্ট করি তবে কখনোই হেদায়েতের পথ খুজে পাবো না। বরং প্রকৃত পথের সন্ধান দান করার জন্য নির্দিষ্ট ও পরিচিত নক্ষত্রের প্রয়োজন, যা সফরকারীদেরকে নূর দান করে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারে।

২- উক্ত হাদীসটি অন্যান্য অনেক হাদীসের সাথে বিরোধ রাখে। যেমন হাদীসে

---

[১]। সহীহ্ মুসলিম (ফাযায়েলুস সাহাবাহ্ অধ্যায়), মুসনাদে আহ্‌মাদ, খণ্ড-৪, পৃঃ-৩৯৭।

সাকালাইন, আমার খলিফা হচ্ছেন ১২ জন তারা সবাই কুরাইশ থেকে -হাদীসটি, আলাইকুম বিল আইম্মাতি মিন আহ্‌লি বাইতি (তোমাদের উপর সালাম হে আমার আহ্‌লি বাইতের ইমামগণ) -হাদীসটি, আহ্‌লু বাইতি কান্নুজুম (আমার আহ্‌লি বাইত হচ্ছে নক্ষত্র স্বরূপ) -হাদীসটি, হাদীসে সাফিনা (মাছালু আহ্‌লি বাইতি কাসাফিনাতু নূহ্ .....) এবং আন্নুজুমু আমানুন লি আহ্‌লিল আরযি মিনাল গারকি ওয়া আহ্‌লু বাইতি লি উম্মাতি আমানি মিনাল ইখতিলাফি...........(যমিনের উপর যারা আছে নক্ষত্র তাদের ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে, আর আমার আহ্‌লি বাইত আমার উম্মতকে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়া থেকে রক্ষা করে[১] এবং আরো অন্যান্য হাদীস।

গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে যে, যে হাদীসটি নিয়ে আলোচনা চলছে তা মুসলমানদের একটি বিশেষ দলের পক্ষ থেকে উল্লেখ হয়েছে, কিন্তু ঐ হাদীসের বিরোধী যে হাদীসগুলো উল্লেখ হয়েছে তা মুসলামানদের সকল দলের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

৩- রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে তাঁর সাহাবাদের মধ্যে সংঘাত হয়েছিল তা উক্ত হাদীসের সাথে সঙ্গত নয়। কেননা পরবর্তীতে কিছু সাহাবা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল[২]।

আরো সঙ্গত নয় যে, কিছু সাহাবা অন্য সাহাবাদেরকে লানত করতো। যেমন মু'য়াবিয়া আলীর (আঃ) উপর লানত দেয়ার নির্দেশ দেয়।

এটাও সঙ্গত নয় যে, সাহাবাগণ তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে। যেমন আলীর (সাঃ) তালহা ও যুবাইর জাঙ্গে জামালে এবং মু'য়াবিয়া জাঙ্গে সিফ্‌ফিনে।

এটাও সঙ্গত নয় যে, সাহাবা কবিরা গোনাহ্ আঞ্জাম দিবে এবং মদ খাওয়া, যেনা ও চুরির জন্য তাদের বিরুদ্ধে হাদ জারী হবে। যেমন ওয়ালিদ ইবনে উ'কবাহ্ এবং মুগাইরাহ্ ইবনে শো'বের ব্যাপারে হয়েছিল।

সুন্নী আলেম ঃ اصحابي (আমার আসহাব) বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নবীর (সাঃ) প্রকৃত সাহাবা ছিলেন। যে সব সাহাবা মিথ্যাবাদী ছিল তারা নয়।

শিয়া আলেম ঃ ঐ রূপ সাহাবা হচ্ছেন সালমান, আবুযার, মিকদাদ, আম্মার ইয়াসির, অন্য কেউ নয়। কিন্তু তোমরা তাদের স্থানে অন্যদেরকে উল্লেখ করে থাকো। এরূপে আলোচনা করতে থাকলে তোমার আর আমার মধ্যকার বিরোধ মিটবে না। বরং আমাদের উচিৎ ঐ সব হাদীসের দিকে লক্ষ্য করা যে গুলো সমস্যা মুক্ত, যা আগেই উল্লেখ করেছি।

একটি ঘটনা এমন যে, সালমান যখন মাদায়েনে গিয়েছিল তখন সেখানে আশয়া'ছ ও জুরির নামে দু'ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করতে এসে সন্দেহ প্রকাশ করে

---

[১]। মুসতাদরাকে হাকিম, খণ্ড-৩, পৃঃ-১৪৯।

[২]। অনুরূপ তাদের মতো যাদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিল এবং 'আহ্‌লে রাদ্দেহ্' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।

যে, সে কি সালমান। এমতাবস্থায় সালমান নিজের পরিচয় দিয়ে বলে ঃ আমি সেই সালমান, রাসূলে খোদার (সাঃ) সাহাবা। তার পরেই সে বলল ঃ কিন্তু তোমরা জেনে রাখ যে, সেই হচ্ছে রাসূলে খোদার প্রকৃত সাহাবা যে তাঁর সাথে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে[১]।

পরিস্কার কথা হচ্ছে যে, প্রকৃত সাহাবা তারাই যারা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নবীর (সাঃ) নির্দেশ মত চল-ফেরা করে এবং কোন প্রকারে তার পরিবর্তন না ঘটায়। সাথে সাথে এলাহী নির্দেশের সীমা লঙ্ঘন না করে।

পরিশেষে বলতে হয় যে, এমন সাহাবা পেলে তবেই না সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে, নবীর (সাঃ) পরে কয়জন সাহাবা ছিল যারা পরিবর্তন হয়নি? আমাদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী কয়েকজন ব্যতীত সকলেই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

---

[১]। ফাতাবি সাহাবি কাবির, পৃঃ- ৬৭৭।

৮৯- আলী (আঃ) ন্যায়ের পথে থেকে শহীদ হয়েছেন এই বিষয়ে দু'জন আলেমের মধ্যে মুনাযিরা

হামিদ ঃ আমরা যখন ইমাম আলীর (আঃ) জীবনিকে লক্ষ্য করি তখন দেখি যে, তাঁর সম্পূর্ণ জীবনাই যুদ্ধ ও জিহাদের সাথে মিশ্রিত। নবীর (সাঃ) সময় তাঁর যুদ্ধ ছিল মুশরিকদের সাথে (যদিও তা নবীর নির্দেশে)। আর সে যুদ্ধগুলো যে হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর খেলাফতের সময়কার যুদ্ধ যা তার জীবনের সম্পূর্ণ সময়টাই নিয়ে নিয়েছে এবং তিনি ঐ সময় মুসলমানদের সাথেও যুদ্ধ করেছেন। যেমন ঃ জাঙ্গে জামাল, জাঙ্গে সিফ্‌ফিন, জাঙ্গে নাহ্‌রাইন। তিনি তো পারতেন গোত্রের প্রধানদের সাথে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে। তা-হলে তো আর এত লোকের আত্মাহুতি হত না।

সত্যের সন্ধানী ঃ আমরা ইমাম আলীকে (আঃ) একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে মনে করে থাকি এবং তাকে একজন ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে জানি। তিনি রাসূলে খোদার (সাঃ) সময়ে যারাই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তাদের সাথেই যুদ্ধ করেছেন। আর তাঁর নিজের খেলাফতের সময় এমন কারো সাথে যুদ্ধ করতো যারা ইসলামের চামড়া ধরে ঝুলে ছিল এবং ইসলামের মগজকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর তিনি ঐসব মুসলমান নামধারী মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা প্রকৃত ইসলামের ইজ্জত-সম্মান সব ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছিল। আর ইসলামকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের কাছে ব্যবহার করছিল। সুতরাং যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি তবে শত্রুর হাতে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে তাদের হাতেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বেশী পরিমানে।

হামিদ ঃ ইমাম আলী (আঃ) তো পারতেন যে, সমস্ত দলের প্রধানদের এক জায়গায় দাওয়াত করে তাদেরকে বাইতুল মালের লোভ দেখিয়ে অর্থাৎ জন প্রতি কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে তাদেরকে শান্ত করতে।

সত্যের সন্ধানী ঃ তোমার এরূপ কথা বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে তুমি সাধারণ একজন সেনাপতির সাথে একজন এলাহী প্রতিনিধির তুলনা করছো। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তাঁর নির্দেশের অধিনে চলা-ফেরা করে। কিন্তু তুমি কোন পার্থক্যই রাখলে না। আর এ করণে মস্ত বড় একটি ভুল করলে।

এটা উত্তম যে, আমরা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে ইমাম আলীর (আঃ) খেলাফতকালে তিনটি যুদ্ধের আসল কারণ সম্পর্কে আলোচনা করবো। যাতে করে আমাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়।

জাঙ্গে জামাল ও সিফ্‌ফিনের আসল কারণ হচ্ছে অর্থের প্রতি লোভ লালসা ও

সাম্প্রদায়িকতা। কেননা জাঙ্গে জামাল ও সিফ্ফিনের সুচনাকারীরা চেয়েছিল সেগুলোকে ইসলামের অন্তরভূক্ত করতে।

জাঙ্গে জামালের ঘটনা হচ্ছে যে, তালহা ও যুবাইরের মত ব্যক্তিবর্গ ইমাম আলীর (আঃ) কাছে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদের দাবী করেছিল। তারা বলেছিল যে, আমাদেরকে কুফা ও বসরার গভর্ণর অথবা বাইতুল মালের দায়িত্ব প্রদান কর।

এই নষ্ট দাবীর অর্থ এটাই ছিল যে, তারা যেন সমাজে ধ্বনিদের মধ্যে ধণাঢ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং অন্যায়-অবিচারের সুত্রপাত করতে পারে। আর তা যেন ইসলামের নামে হয়।

আলী (আঃ) কখনোই উচ্চা বিলাসীদেরকে মানুষের জান ও মালের উপর কর্তৃত্বশীল করতে চান নি। তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করতেন। তিনি অন্য কাউকে আনুগত্য করতেন না যে, ব্যক্তিগত বা দুনিয়াবী বিষয়ের প্রতি চিন্তা করবেন এবং আল্লাহ্র মর্যাদাদানকৃত বিষয়গুলোকে নফ্সের তাড়নায় ধ্বংস করবেন।

তদ্রূপ সিফ্ফিনের যুদ্ধে মুয়া'বিয়া ইমাম আলীর (আঃ) কাছে চেয়েছিল যে, শামের কর্তৃত্ব তার হাতে অর্পণ করতে। আর এটা পরিস্কার ছিল যে, যদি তাই হত তবে মুয়া'বিয়া তার পেট পুজারী, অর্থ লোভী আত্মিয়-স্বজনরাই শামের নিরীহ মানুষের জান ও মালের উপর কর্তৃত্বশালী করতো। আর এর মাধ্যমে ধনীদের ও সাম্প্রদায়িকতা মনোভাব সম্পন্ন লোকদের একটি রাষ্ট্র তৈরী হত।

ইমাম আলী (আঃ) কি উচিৎ হত অত্যাচারী জালেম লোকদেরকে সাধারণ মানুষের জান ও মালের উপর কর্তৃত্বশালী করা? এমন কাজ কি
সঠিক?

ঐ সময় মুগাইরাতু ইবনে শো'বেহ্ পর্দার আড়াল থেকে "আন্নাছিহাতু লি আমরিল মুসলিমিন" ইমাম আলীর (আঃ) কাছে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উত্তরে বলেছিলেনঃ

و لم يكم الله ليراني اتخذ المضلين عضداً

আল্লাহ্ তা'য়ালা কখনোই আমাকে ঐরূপে দেখবেন না যে, যারা গোমরাহ্ হয়ে গেছে তাদেরকে নিজের লোক হিসেবে নিযুক্ত করবো[১]।

এমনকি ইমামের অনেক জীবন উৎসর্গকারী সঙ্গী-সাথী যেমন আম্মার ইয়াসির, আবুল হাইছাম ও .... যারা উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিল তারা ইমামের কাছে এসে আবেদন করলো ঃ

অল্প কিছু দিনের জন্য একটু নরম হোন এবং গোত্রের প্রধানদের জন্য কর্তৃত্ব

---

[১]। ওয়াকিয়াতুস সিফ্ফিন (মিশর প্রিন্ট), পৃঃ- ৫৮।

প্রদানে রাজী হোন। যাতে করে আপনার হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে। সাথে সাথে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর যারা উপযুক্ত নয় তথাপিও তাদেরকে পদে বহাল রাখুন। কেননা তারা হচ্ছে গোত্রের প্রধানগণ, তাদের দিকে খেয়াল রাখুন ....।

ইমাম আলী (আঃ) তাদের উত্তরে বলেছিলেন ঃ

اتأمروني ان اطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه، و الله لا اطور به ما سمر سمير و ما ام نجم في السماء نجماً

> তোমরা কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ, যারা আমার কর্তৃত্বের আওতায় রয়েছে তারা অত্যাচার ও জুলুক করুক, যাতে করে আমার আসে পাশে বন্ধু জড়ো করবো। আল্লাহ্র কসম! যত দিন পর্যন্ত দুনিয়া বর্তমান থাকবে এবং যত দিন একটি নক্ষত্র অন্য আরেকটি নক্ষত্রের দিকে ধাবিত হবে এমন কাজের আঞ্জাম দেবো না[১]।

অতএব, ঐ ধরনের নষ্ট ব্যক্তিদের বিপক্ষে ইমাম আলীর (আঃ) দৃঢ়তাতেই জাঙ্গে জামাল ও সিফ্ফিন যুদ্ধের সূচনা হয়।

সিফ্ফিন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুয়া'বিয়া পরাজিত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোরআনের পাতা ছিড়ে বর্ষার আগায় ফুটিয়ে দিয়ে সন্ধি করতে চাইলো। যা ইমামের সৈন্য দলের মধ্যে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে যারা কট্টর পন্থি ছিল তা ইমামকে কাফির হিসেবে ফতোয়া দিল। আর এ কারণেই নাহ্রাইন যুদ্ধের সূচনা হয়। তাদের মধ্যে ইবনে মুলজিম নামে এক লোক ইমামকে হত্যার পরিকল্পনা নেয়। অবশেষে সে ইমামকে শহীদ করে। ইমাম আলী (আঃ) ইসলামী ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থ লোভী ও সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই শহীদ হয়েছেন। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, قتل علي لشدة عدله -আলী (আঃ) ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন।

তাই যখন তাঁর মাথা ও ঘাড়ে বিষাক্ত তলোয়ারের আঘাত লেগেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ فزت و رب الكعبة কা'বা ঘরের খোদার কসম! মুক্তিপ্রাপ্ত এবং বিজয় হয়েছি।

আলীর (আঃ) মুক্তিপ্রাপ্ততা ও বিজয় হওয়াটা এ কারণে হয়নি যে, তিনি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে না দেখে নিজের ব্যক্তিগত ও দুনিয়াবী বিষয়গুলোকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাই বরং তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত ও বিজয় হয়েছেন এ কারণেই যে, তিনি

---

[১]। নাহ্জুল বালাগা -সাবহী সালিহ্, খুতবা নং- ১২৬।

শহীদ হতে রাজি ছিলেন কিন্তু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে কারো সাথে আপোষ করেন নি এবং ধনী ও সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের হাতে হাত দেননি।

ইমাম আলী (আঃ) নিজের ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে ইসলামী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন। যাতে করে মুসলমানগণ যে কোন যমানায় অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারে।

৯০- ইমামগণের (আঃ) উদারতার ব্যাপারে এক শিক্ষকের সাথে ছাত্রের মুনাযিরা

ছাত্র ঃ ইসলামী রেওয়ায়েতের মধ্যে অনেক রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে, মা'সুম ইমামগণ (আঃ) প্রচুর পরিমানে অর্থ অসহায় ব্যক্তিকে অথবা অন্যান্যদেরকে দান করতেন। এই রেওয়ায়েতসমূহ কি ঠিক?

শিক্ষক ঃ হয়তো এই ধরনের কোন রেওয়ায়েতের উপযুক্ত সনদ নাও থাকতে পারে। তবে এ ধরনের রেওয়ায়েত এত বেশী যে, তা অবিশ্বাস করার যো নেই। অবশ্যই অধিকাংশ রেওয়ায়েত উপযুক্ত সনদ সম্বলিত। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

১- আব্দুর রহমান সালামী, ইমাম হুসাইনের (আঃ) ছেলেকে সূরা হামদ শিক্ষা দিয়েছিল, তাই তিনি তাকে এক হাজার দিনার ও এক হাজার হুল্লাহ্ (গরম পোশাক) তাকে উপহার দিয়েছিলেন[১]।

২- একজন মুসাফির উপায়হীন হয়ে ইমাম রেযার (আঃ) কাছে এসে বলল ঃ আমার সফর করার অর্থ শেষ হয়ে গেছে। কিছু পরিমান অর্থ আমাকে দিন যা দিয়ে আমি আমার শহরে পৌছাতে পারি। যখন আমি আমার বাড়ীতে পৌছে যাবো আপনার দেয়া অর্থের সমপরিমান অর্থ গরীব লোককে দিয়ে দেব।

ইমাম রেযা (আঃ) উঠে বাড়ীর ভিতরে গেলেন এবং দুইশত দিরহাম পূর্ণ একটি থলি এনে তাকে দিলেন। আর তাকে বললেন ঃ এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। যখন তুমি তোমার বাড়ীতে পৌছে যাবে তখন তা আমার পক্ষ থেকে তা ছদকা দেয়ার দরকার নেই[২]।

৩- বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফারাযদাক যখন জেলখানায় বন্দি ছিল তখন ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বার হাজার দিরহাম তার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। এর সাথে নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্র কসম! এই অর্থ সে যেন গ্রহণ করে। আর ফারাযদাক তা গ্রহণও করেছিল[৩]।

৪- আহ্লে বাইতের (আঃ) করুন কাহিনী বর্ণনাকারী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক দে'বেলকে ইমাম রেযা (আঃ) একশত দিনার পূর্ণ একটি থলি দিয়েছিলেন। সে ঐ অর্থ

---

[১]। মানাকিবে আলে আবিতালিব, খণ্ড-৪, পৃঃ-৬৬।
[২]। ইকতিবাস ফুরুগে কাফী থেকে, খণ্ড-৪, পৃঃ-২৩, ২৪।
[৩]। আনোয়ারুল বাহিয়্যাহ্, পৃঃ-১২৫।

দিয়ে নিজের জীবনকে সচল করেছিল[১]।

এ ধরনের রেওয়ায়েত প্রচুর পরিমানে আছে যা বলে শেষ করা যাবে না।

ছাত্র ঃ যদি রেওয়ায়েত সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কেন ইমাম আলী (আঃ) বাইতুল মাল খরচের ব্যাপারে এত কঠোরতা করতেন? আর তা সব সময়ের জন্যে সমান ভাবে বন্টন করতেন। যেমন ঃ তাঁর ভাই আকিল নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তাঁর কাছে কিছু বেশী পরিমান আটা চেয়েছিল তিনি তা না দিয়ে তার হাতে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাকা লাগিয়ে দিলেন। ছ্যাকা লাগার সাথে সাথে সে চিৎকার দিয়ে উঠলো। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন ঃ হে আকিল! তোমার বাড়ীর মহিলাদেরকে যেন তোমার দুঃখে কাঁদতে হয়। মানুষ খেলা করার জন্য যে আগুন তৈরী করে সেই আগুনে সে নিজেই পুড়ে থাকে। আর আমাকে এমন আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছ যে, সেখানে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণে আগুন প্রজ্জলিত হবে। তুমি এই অল্প আঘাতে চিৎকার দিচ্ছ, তাহলে আমি কি দোযখের আগুনের ভয়ে যা অনেক সময় ধরে জলবে চিৎকার দেব না?[২]

শিক্ষক ঃ তোমরা এ ব্যাপারে যে ভুলটি করে থাকো তা হচ্ছে এই যে, তোমাদের ধারনা হচ্ছে ইমামগণের (আঃ) উপার্জনের পথ শুধুমাত্র বাইতুল মাল থেকেই ছিল। আর তাই ইমাম আলীর (আঃ) বাইতুল মাল খরচের ব্যাপারে কঠোরতা ও অন্যান্য ইমামগণের (আঃ) বদাণ্যতার মাঝে এক ধরনের বিরোধ লক্ষ্য করে থাকো।

কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এটা যে, ইমামগণের (আঃ) উপার্জনের উৎস ছিল বিভিন্ন ধরনের। তাঁরা সকলেই শুধুমাত্র বাইতুল মালের ব্যাপারে এমন কঠোরতা করতেন যেমন আলী (আঃ) করেছেন। কেননা তা ছিল সাধারণ মানুষের সম্পদ। তার পুরটাই তো ইমামগণের (আঃ) ছিল না। বাইতুল মাল ব্যতীত ইমামগণের (আঃ) অন্যান্য যে উপার্জনের উৎস ছিল তা হচ্ছে যেমন ঃ আলী (আঃ) ২৫ বছর (আবু বকর, ওমর ও উসমানের খেলাফতকালে) রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন মাথা না ঘামিয়ে বরং শিয়াদের অর্থনৈতিক কষ্ট দেখে এবং প্রকৃত ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ঐ বছরগুলোতে কৃষি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ঐ বছরগুলোতে প্রচুর পরিমানে খেজুর বাগান, পানির ভূগর্ভস্থ নালা তৈরী করেছিলেন। আর তা থেকে যে উপার্জন হত তা অর্থহীনদেরকে দান করতেন এবং তাদেরকে পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে ঐ বাগানগুলো ও পানির ভূগর্ভস্থ নালাসমূহকে তাঁর সন্তানদের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার উপার্জন থেকে গরীব অসহায় মানুষদেরকে দেখা-শুনার জন্য ওয়াসিয়াত করে গিয়েছিলেন।

---

[১]। আ'ইনু আখবারুর রেযা, খণ্ড-২, পৃঃ-২৬৩, ২৬৬।

[২]। নাহ্‌জুল বালাগাহ্‌, খুৎবা-২২৪।

ইমাম সাদিক, ইমাম বাকির ও ইমাম কাযিম (আঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণও (আঃ) কৃষি কাজ ও পুশু পালণ করতেন। আর কারো কারো ব্যবসা করার জন্য নিযুক্ত করে রেখে ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, যদি গরীব অসহায় শিয়াদের জন্যে এরূপ না করেন তাহলে হয়তো অর্থের অভাবে তারা শত্রুর সাহায্য প্রার্থী হতে পারে। তাই তাঁরা তাদের অনুসারীদের জন্য ও প্রকৃত ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য কষ্ট করে গেছেন। বাইতুল মাল থেকে তাঁরা কখনো কারো ব্যাপারেই অতিরিক্ত কিছু দেন নি।

ছাত্র ঃ আপনার যুক্তিসঙ্গত আলোচনার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। আমি এ থেকে প্রকৃত বিষয়টি সুন্দরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটি দাবী হচ্ছে যে, আমাকে ইমামগণের (আঃ) এ ধরনের আরো কয়েকটি উপার্জনের উৎস সম্পর্কে বলুন।

শিক্ষক ঃ তোমার জানার স্পৃহা দেখে খুব ভাল লাগছে। ঠিক আছে আরো কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ

১- আলী (আঃ) নিজের দুটি উন্নত মানের ক্ষেত যার মধ্যে প্রচুর গাছ-গাছালী ও কুয়া ছিল তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আবুনাইযার নামে এক মুসলমানের উপর অর্পন করলো। যা পরবর্তীতে আবুনাইযার ক্ষেত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। অন্যটি ছিল বুগাইবুগাহ্ নামে। আবুনাইযার বলে ঃ একদিন আমি ঐ ক্ষেতে ছিলাম, হটাৎ ইমাম আলী (আঃ) সেখানে এসে বললেন ঃ তোমার কাছে খাবার আছে কি?

বললাম ঃ সামান্য তেল দিয়ে এই ক্ষেতের কদু রান্না করেছি। আমি খাবারটি নিয়ে এলাম। তিনি তা খাওয়ার পর কোদাল হাতে কুয়ার মধ্যে নামলেন। তিনি কুয়া কাটতে শুরু করলেন। কিছু সময় পর কপালে ঘাম নিয়ে উপরে উঠে আসলেন। কিছু সময় পর পুনরায় কুয়ার মধ্যে নেমে গেলেন। কুয়ার ভিতর তাঁর কোদাল চালানোর শব্দ বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিলো। তিনি ঐ কুয়াটার পরিধি এমনভাবে বাড়িয়ে দিলেন যে, তা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি তড়িৎ গতিতে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন ঃ আল্লাহ্কে সাক্ষি রাখছি যে, এই কুয়াটিকে ওয়াকফ করে দিলাম। কাগজ ও কলম আনতে বললেন। আমি দ্রুত তা হাজির করলাম। তিনি ওয়াকফ নামাটি লিখলেন .... তাতে উল্লেখিত হল যে, ইমাম হাসাইন (আঃ) এর দায়িত্ব বহণ করবেন। পরবর্তীতে মুয়া'বিয়া দুইশ হাজার দিনার তা ক্রয়ের জন্য পাঠিয়েছিল।

ইমাম হুসাইন (আঃ) তা গ্রহণ না করে বললেন ঃ আমার পিতা এই দুটি কুয়া ও ক্ষেত ওয়াকফ করে গেছেন যাতে করে কিয়ামতের দিনে তাঁর চেহারা মুবারক দোযখের আগুন থেকে নিরাপদে থাকে, সুতরাং আমি তা কখনোই বিক্রি করবো না[১]।

---

[১]। মু'জামুল বিলদান, খণ্ড-৪, পৃঃ-১৭৬।

২- ইমাম বাকির (আঃ) ফসল লাগানোর জন্য যমিন তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির নামে এক লোক দেখানো দুনিয়া ত্যাগি ইমামের কাজের ব্যাপারে আপত্তি তুলে এবং তাকে দুনিয়া লোভী মনে করে বলল ঃ যদি তুমি এই অবস্থায় ইন্তেকাল কর তবে তা তোমার জন্য হবে অনেক কষ্টের।

ইমাম বাকির (আঃ) তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! যদি এই অবস্থায় মৃত্যু আমার কাছে আসে তবে এমন সময় তা এসেছে যে সময় আমি আল্লাহ্‌ নির্দেশে কাজে ব্যস্ত। আর আমি কাজ করার কারণে তোমার মত লোকের সাহায্যের প্রয়োজন রাখি না। আমি ঐ সময়ে মৃত্যুর ভয় পাই যখন আমি গোনাহ্‌ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবো।[১]

....

এরূপ ঘটনা ইমাম সাদিকের (আঃ) ব্যাপারেও উল্লেখ হয়েছে[২]।

৩- আবু হামযাহ্‌ বলে ঃ আমার পিতা বলেছেন ঃ ক্ষেতে গিয়ে দেখি ইমাম কাযিম (আঃ) কোদাল চালানোর কাজে ব্যস্ত। আর তাঁর সমস্ত শরীর মুবারক ঘামে ভিজে গেছে। তাকে বললাম ঃ অন্যরা কোথায় যে, আপনি কোদাল চালাচ্ছেন?

তিনি বললেন ঃ তারা আমার ও আমার পিতার থেকেও ভাল ছিল যারা হাত দিয়ে কাজ করতো।

জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তারা কারা?

তিনি বললেন ঃ

رسول الله و امير المؤمنين و آبائي كلهم كانوا قد عملوا بايديهم و هو من عمل النبيين و المرسلين و الاوصياء و الصالحين

- রাসূলে খোদা (সাঃ) ও আমিরুল মু'মিনি আলী (আঃ) এবং আমদের সকল পিতামহই নিজেদের হাত দিয়ে কাজ করতেন। কাজ করা হচ্ছে নবীগণের ও রাসূলগণের এবং আউলিয়াগণের বিশেষত্ব[৩]।

ছাত্র ঃ আপনার সুন্দর বর্ণনার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু যদি আপনার আরো

---

[১]। ইরশাদ -শেইখ মুফিদ, পৃঃ-২৮৪ এবং মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, খণ্ড- ২, পৃঃ-৫১৪।

[২]। ফুরুগে কাফী, খণ্ড-৫, পৃঃ- ৭৪।

[৩]। ফুরুগে কাফী, খণ্ড-৫, পৃঃ- ৭৫,৭৬।

কিছু বলার থাকে তবে তা বলতে পারেন। তা থেকে আমি আরো বেশী জানতে পারবো।

শিক্ষক ঃ এটা পরিস্কার যে, ইমামগণের (আঃ) সময়ে শিয়াগণ প্রকৃত ইসলামের রাস্তায় ছিলেন। বিপদের মধ্যে থেকেও নিশ্চুপ ছিলেন। তাদের অধিকারকে হরণ করে নেয়া হয়েছিল। বিশেষ চাপের মুখে দিনাতিপাত করেছিলেন। আর এটাও পরিস্কার যে, শিয়াদের দেখা-শুনা করাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামের স্তম্ভকে দেখে রাখার শামিল। কারণ এদের মাধ্যমেই ইসলাম বিরোধীদের ধ্বংশ করা সম্ভব। সে কারণে খোমস ও বাইতুল মাল থেকে তাদেরকে অর্থ দেয়াটা বৈধ ছিল। যাতে তাদের মাধ্যমে ইসলামে মুহাম্মদী (সাঃ) ও আলাভী (আঃ), অপবিত্র হাতের কবল থেকে নিরাপদে থাকে। কেননা বাইতুল মাল খরচের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে

দ্বীনকে শাক্তিশালী করা ও নিরাপদে রাখা[১]।

---

[১]। খোমসের বিষয়টি অনেক ব্যাপক যা এখানে বর্ণনা করা সমোচিৎ হবে না। তবে সংক্ষিপ্তাকারে বললে বলতে হয় যে, সূরা আনফালের ৪৩ নং আয়াতে খোমসের আসল বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর তার অন্যান্য বিষয়গুলো ইসলামী রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়ে শুধুমাত্র ওয়াসায়েলুশ শিয়ার ৬ নং খণ্ডেই প্রায় ৮০ টি রেওয়ায়েত আমরা দেখতে পাই। খোমস হচ্ছে একটি সরাকারী সম্পদ এবং যাকাতের বিপরীত। কেননা যাকাত হচ্ছে জনসাধারণের সম্পদ। খোমসের অর্ধেক হচ্ছে ইসলামী সরকারের প্রাপ্য (বর্তমানে তা মার্যায়ে তাকলীদের হাতে দেয়া হয়ে থাক) আর অর্ধেক হচ্ছে সাইয়্যেদদের প্রাপ্য।

ইমামগণ (আঃ) বিলায়তের অধিকারী ছিলেন এবং সাইয়্যেদও ছিলেন তাই তাদের হাতে উভয় অংশই অর্পিত হত। তাঁরা এই খোমস গরীব শিয়াদের মধ্যে বন্টন করতেন এবং তাদের পরিচালনা করতেন। কেননা তাদের জীবন পরিচালনার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামকে টিকিয়ে রাখা হত। ইমামগণের (আঃ) জীবদ্দশায় শিয়াদের বাচিয়ে রেখে প্রকৃত ইসলামকে বাচিয়ে রাখাই ছিল তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। আর তা হচ্ছে নবীর (সাঃ) রেখে যাওয়া ইসলাম।

৯১- ইমাম আলীর (আঃ) মর্যাদা ও ওহীর বিষয়ে মুনাযিরা

মসজিদ লোকে লোকারণ্য ছিল। একজন আলেম ইমাম আলীর (আঃ) শানে বক্তব্য রাখলো। সে তার বক্তব্যে বলল ঃ

একদিন রাসূলে খোদা (সাঃ) পানি চাইলেন, ঐ সময় আলী (আঃ), ফাতিমা (সালাঃ), ইমাম হাসান ও হুসাইন (আঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। পানি আনা হল। নবী (সাঃ) পানির পাত্র প্রথমে ইমাম হাসান (আঃ) তারপর ইমাম হুসাইন (আঃ) তারপর হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) ঐ পানি পাত্রটি দিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ঐ পাত্র থেকে অল্প অল্প করে পানি পান করলেন। তখন নবী (সাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

هنيئاً مريئاًلك ....

- সুপেয় হোক এবং তৃপ্তিভরে পান কর, হে ....

কিন্তু যখন পাত্রটি আলীর (আঃ) কাছে দিলেন এবং তিনি তা থেকে অল্প পানি পান করলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যে নবী (সাঃ) বললেন ঃ

هنيئاً مريئاًلك يا وليي و حجتي على خلقي

- সুপেয় হোক এবং তৃপ্তিভরে পান কর হে আমার স্থলাভিষিক্ত এবং সৃষ্টির উপর হুজ্জাত।

তারপর তিনি সিজদাতে গেলেন।

হযরত ফাতিমা (সালাঃ) রাসূলে খোদাকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার এই সিজদা দেয়ার অর্থ কি?

নবী (সাঃ) বললেন ঃ যখন তোমরা পাত্র থেকে পানি পান করছিলে এবং আমি বলছিলাম সুপেয় হোক এবং তৃপ্তিভরে পান কর .... তখন আমার কানে ফেরেশ্‌তাগণের আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, তাঁরা এবং জিব্রাঈল আমিন স্বয়ং আমার সাথে উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করছিলেন। কিন্তু যখন আলী (আঃ) ঐ পাত্র থেকে পানি পান করলো এবং আমি তাকে বললাম ঃ সুপেয় হোক এবং তৃপ্তিভরে পান কর .... তখন আমি আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, আলীর ব্যাপারে আমার বলা বাক্যটিকেই তিনি বলছেন। তাই তার শুকরিয়া

আদায় করার জন্য আমি সিজদা দিয়েছি[১]।

উপস্থিত জনগণ ঃ আল্লাহ্‌র কি কণ্ঠ আছে যে, নবী (সাঃ) তা শুনতে পেয়েছিলেন?

বক্তা ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা শুন্যে অথবা কোন স্থানে একটি ধ্বনিকে সৃষ্টি করে থাকেন। আর তাঁর নবী (সাঃ) ঐ আওয়াজকে শুনেছিলেন।

ব্যাখ্যা স্বরূপ ঃ আল্লাহ্‌র সাথে নবীগণের কথোপকথনের প্রক্রিয়া হচ্ছে তিন পথে যা নিম্নরূপঃ

১- ক্বলবে প্রত্যাবর্তীত হওয়া। অনেক আম্বিয়ার কাছেই এই পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হত।

২- জিব্রাঈলের (আঃ) মাধ্যমে। এই বিষয়টি সূরা বাকারার ৯৭ নং আয়াতে পরিস্কার করে বর্ণিত হয়েছে।

৩- পর্দার আড়াল থেকে অথবা ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে। যেমনভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তুর পাহাড়ে মুসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন ঃ

و كلّم الله موسى تكليماً

- এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসার (আঃ) সাথে কথা বললেন[২]।

এবং সূরা ত্বা-হার ১১, ১২ নং আয়াত মোতাবেক হযরত মুসা (আঃ) আগুনের মধ্যে আল্লাহ্‌র আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন, যেমন পড়ে থাকি ঃ

فلما اتاها نودي يا موسى - اني انا ربك ....

- যখন (মুসা) আগুনের কাছে গেল, তখন আওয়াজ দেয়া হয়েছিল যে, হে মুসা। আমি তোমার পরওয়ারদিগার।

এই তিন ধরনের ওহী, সূরা শুরার ৫১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালা শুন্যে অথবা কোন স্থানে ধ্বনি সৃষ্টি করে থাকেন। আর তাঁর নবীগণ তা শুনে থাকেন। আর এটা হচ্ছে এক ধরনের ওহী প্রত্যাবর্তনের মাধ্যম।

শ্রোতাগণ ঃ ক্ষমা করবেন। আমার ধারনা ছিল যে, ওহী শুধুমাত্র এক পন্থায় প্রেরীত হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে শুধুমাত্র জিব্রাঈলের (আঃ) মাধ্যমে। কিন্তু আপনার বর্ণনা শুনে বিষয়টি বুঝতে পারলাম। আর এটাও বুঝতে পারলাম যে, আলীর (আঃ) মর্যাদা কত উচ্চে। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নবীর উচ্চারিত বাক্যটিকেই আলীর (আঃ) ব্যাপারে বলছেন ঃ

هنيئاً مريئاًلك ....

- সুপেয় হোক এবং তৃপ্তিভরে তা পান কর ....

---

[১]। ইকতিবাস মুসারিকুল আনোয়ার থেকে, বিহারুল আনোয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে, খণ্ড-৭৬, পৃঃ-৫৭।

[২]। নিসা ঃ ১৬২।

কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, কোরআন ব্যতীত অন্য বিষয়ে নবীর (সাঃ) উপর আল্লাহ্ ওহী নাযিল হত কি?!

বক্তা ঃ হ্যাঁ, নবীর (সাঃ) উপর কোরআন ছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ্র ওহী নাযিল হত। তিনি ইসলামের জন্য যত কাজই করেছেন আল্লাহ্ তা'য়ালার ওহী ব্যতীত নয়। কেননা সূরা নাজমের ২ ও ৩ নং আয়াতে আমরা পড়ে থাকবো ঃ

و ما ينطق عن الهوى – ان هو الا وحي يوحى

- নবী (সাঃ) কখনো হাওয়ায়ে নফসের থেকে কথা বলেন না। যা কিছু নিয়ে এসেছে তা ওহী বৈ অন্য কিছুই নয় যা তার উপর ওহী করা হয়েছিল।

৯২- আল্লাহ্‌কে দেখার ব্যাপারে এক আলেম ও এক ছাত্রের মধ্যে মুনাযিরা

মুসলিম জনতার উপস্থিতিতে এক আলেম ও এক ছাত্রের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞতার আলোকে নিম্নোক্ত মুনাযিরা সংঘটিত হয় ঃ

ছাত্র ঃ আমার পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকি যে, যেমন ঃ সূরা আ'রাফের ১৪৩ নং আয়াতে মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌কে বললেন ঃ

رب اري انظراليك

- হে আল্লাহ্! তোমাকে আমায় দেখাও যাতে করে আমি তোমাকে দেখতে পারি।
কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা এর উত্তরে বলেন ঃ

لن تراني

- আমাকে কখনো দেখতে পাবে না।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার তো কোন শরীর নেই বা কোন স্থান দখল করেন না বা তাকে দেখা যাবে না। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) তাঁর একজন উলুল আযম নবী হওয়ার সত্বেও কিভাবে এরূপ দাবী করেন? নিঃসন্দেহে একজন সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও এ ধরনের প্রশ্ন অপছন্দনীয়।

আলেম ঃ হযরত মুসা (আঃ) হয়তো তাকে অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখার দাবী জানিয়েছেন, বাহ্যিক চক্ষু দিয়ে নয়। তিনি তার এই দাবীর মাধ্যমে এটা চেয়েছেন যে, তার আত্মার ও চিন্তার একটি পরিপূর্ণ শুহুদ (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা) অর্জিত হোক। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে এমন করে দাও যে, আমার অন্তর যেন পরিপূর্ণ বিশ্বাস হাসিল কারতে পারে। আর এমনটাই যে, তোমাকে দেখেছি[১]।

আর এই ধরনের ক্ষেত্রে (দেখা) শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ আমি আমার মধ্যে এমন শক্তিকে দেখতে পাই যে, ঐ কাজটি আঞ্জাম দিতে পারবো। কিন্তু শক্তি বা ক্ষমতা তো কখোনা দেখা যায় না বরং তা বলার অর্থ হচ্ছে তা অনুভব করতে পারছে।

ছাত্র ঃ এমন তফসির আয়াতের বাহ্যিক রূপের বিপরীত। কেননা বাহ্যিকভাবে

---

[১]। হযরত ইব্রাহীমও (আঃ) আখিরাতের ব্যাপারে এরূপ দাবী করেছিলেন, বাকারাহ্ ঃ ২৬০।

আয়াতে (ارني) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি নিজেকে আমায় দেখাও। এখানে দেখার বিষয়টি শারীরিক চক্ষুর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। আর তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলছেন لن تراني আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসার (আঃ) দাবীটা ছিল এই শারীরিক চক্ষুর মাধ্যমে তাকে দেখতে পাওয়া। আর তার দাবীর অর্থ যদি তার আত্মার ও চিন্তার একটি পরিপূর্ণ শুহুদ (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা) অর্জিন হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্র উত্তর না-সুচক হতে পারে না।

আলেম ঃ যদি ধরে নেই যে, মুসা (আঃ) আল্লাহ্ পবিত্র সত্তাকে দেখার দাবী করেছিল। যা আয়াতের বাহ্যিক রূপ থেকে বুঝা যায়। কিন্তু যদি ইতিহাসে এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে সেখানে দেখতে পাব যে, মুসার (আঃ) এই দাবীটা তার গোত্রের লোকদের পক্ষ থেকে ছিল। তার উপর তার গোত্রের পক্ষ থেকে এত চাপের সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তিনি উপয়হীন হয়ে তাদের কথাটা আল্লাহ্র কাছে পৌছে দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ ফিরআউনদের ধ্বংসের পরে এবং বনী ইসরাঈলের পরিত্রাণ পাওয়ার পর মুসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ভিন্ন ধরনের ঘটনার সুত্রপাত হয়। তার একটি এমন ছিল যে, বনী ইসরাঈলের একটি দল মুসাকে (আঃ) বলেছিল যে, তারা আল্লাহ্কে দেখতে চায়। আর এ ছাড়া তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না। অবশেষে মুসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে ৭০ জনকে নির্দিষ্ট করলেন যে, তাদেরকে সাথে নিয়ে তুর পাহাড়ে আল্লাহ্র কাছে তাদের দাবী পৌছে দেবেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসার (আঃ) উপর ওহী পাঠালেন এ মর্মে যে, আমাকে কখনোই দেখা যাবে না (আ'রাফ ঃ ১৪৩)। আর তা বনী ইসরাঈলের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং মুসা (আঃ) তার গোত্রের পক্ষ থেকে এমন দাবী জানিয়েছিলেন। কেননা তাদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। আর যখন তুর পাহাড়ে ভূমিকম্প হয়ে ঐ ৭০ জনের সকলেই বেহুস হয়ে গিয়েছিল তখন মুসা (আঃ) আল্লাহ্র কাছে এরূপ ফরিয়াদ করেছিলেন ঃ

اهلكنا بما فعل السفهاء منا

- আমাকেও কি তাদের মত ধ্বংশ করে দিবে? (আ'রাফ ঃ ১৫৫)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসাকে (আঃ) বললেন ঃ আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। কিন্তু তুর পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য কর। যদি তা নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে আমাকে দেখতে পাবে। যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তার নিজের তাজাল্লিকে (নূরকে) তুর পাহাড়ের উপর প্রতিফলিত করলেন তখন মুসা (আঃ) বেহুস হয়ে যমিনে পড়ে

গিয়েছিলেন। আর যখন তাঁর হুস ফিরে এলো তখন আল্লাহ্‌কে বলল ঃ

سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنين

- হে আল্লাহ্! তুমি তো (দেখা থেকে) পাক ও পবিত্র। আমি তওবা করছি আর আমি হচ্ছি প্রথম মু'মিন (আ'রাফ ঃ ১৪৩)।

পাহাড়ের উপর আল্লাহ্‌র নূরের প্রতিফলন হচ্ছে তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। যা ছিল এ্যটোমের মত। যার কারণে সম্পূর্ণ তুর পাহাড়টি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে মুসা (আঃ) ও তাঁর সাথের ৭০ জন বেহুস হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে মুসার (আঃ) সাতে আগতদেরকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র তাজাল্লিকে ধারন করারা ক্ষমতা রাখো না। তাহলে কিভাবে আল্লাহ্‌কে দেখতে চাও। তোমরা কখনোই শরীরিক চুক্ষুর মাধ্যমে যা হচ্ছে দুনিয়াবী তা দিয়ে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কিছুকে দেখতে পারবে না।

সুতরাং আল্লাহ্‌র এই তাজাল্লির ফলে মুসার (আঃ) সাথে আগতরা অন্তর চক্ষু দিয়ে আল্লাহ্‌কে দেখেছিল। আর বুঝতে পেরেছিল যে, শারীরিক চক্ষুর মাধ্যমে তাকে কখনোই দেখা সম্ভব নয়।

আর মুসার (আঃ) তওবাটাও আল্লাহ্‌কে দেখার দাবীর মতই তাদের পক্ষ থেকে ছিল। আর সংশয় দুর করার জন্য প্রয়োজন ছিল যে, মুসা (আঃ) ঈমানের প্রকাশ ঘটাবেন এ কারণে যে, সাথের লোকজন যাতে বুঝতে পারে সে কখনোই এরূপ ঈমানের বিপরীতে অহেতুক দাবী জানান না। তিনি শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকে মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ছাত্র ঃ আপনার উপযুক্ত ব্যাখ্যার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি আসল বিষয়টি উপলব্দি করতে পেরেছি। আশা করি এ ধরনের যুক্তিসঙ্গত আলোচনা অন্যান্য সব সংশয়ের অবষাণ ঘটাবে। এখানে আমার আরো একটি প্রশ্ন রয়েছে, তা আগামি আলোচনায় উত্থাপন করবো।

আলেম ঃ আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, সুন্নী মাযহাবের অধিকাংশ মুফাসসিরগণ আয়াতুল কুরসির তফসিরের ক্ষেত্রে মুসার (আঃ) ব্যাপারে উপরোক্ত বিষয়টিকে উল্ল্যেখ করে থাকেন। যা এ হচ্ছে রকম ঃ মুসা (আঃ) ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ফেরেশ্‌তাগণকে প্রশ্ন করলেন যে, আমাদের আল্লাহ্ কি ঘুমান? আল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরেশ্‌তাগণকে ওহী করলেন যে, মুসাকে ঘুমাতে দিও না। ফেরেশ্‌তাগণ মুসাকে (আঃ) তিনবার ঘুম থেকে ডেকে তুললেন এবং তাঁর দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন যে, সে যেন না ঘুমায়। আল্লাহ্‌র ওহী অনুযায়ী পানি ভর্তি দুটি বোতল মুসার (আঃ) হাতে দেয়া হল। আর তিনি তাঁর দুই হাতে দুটি বোতল ধরে রেখেছিলেন। তারপর ফেরেশ্‌তাগণ মুসাকে (আঃ) ছেড়ে চলে গেলেন। কিছু সময় না যেতেই মুসা (আঃ) ঘুমে ঢলে পড়লেন। আর তখনই

একটি বোতল হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসাকে (আঃ) ওহী করলেন ঃ আমি আসমান ও যমিনসমূহকে নিজের ক্ষমতাবলে ধরে রেখেছি, অতএব ঃ

فلو اخذني نوم او نعاش لزالتا

- যদি ঘুম আমাকে আকড়ে ধরে তাহলে আসমান ও যমিনসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে[১]।

এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মুসা (আঃ) ফেরেশ্তাদের কিভাবে এমন প্রশ্ন করতে পারেন। কেননা তিনি তো আল্লাহ্র নবী। তিনি তো অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহ্ তো শারীরিক মানুষের মত নয় এবং তাঁর ঘুমও আসে না।

ফাখরে রাজী এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ জবাব দিয়েছেন ঃ যদি উপরোক্ত রেওয়ায়েতকে সত্য ধরে নেই তবে বলতে হয় যে, মুসা (আঃ) তাঁর গোত্রের নাদান লোকদের পক্ষ থেকে এরূপ প্রশ্ন করেছিলেন[২]।

পরিস্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, মুসা (আঃ) অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের চাপের মুখে আল্লাহ্র কাছে এই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। যাতে করে আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতাবলে ঐ মূর্খ লোকদেরকে হিদায়েতের পথ দেখান। আর মুসার (আঃ) হাতে বোতল ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনাটি একটি ছোট্ট ব্যাপার হলেও কিন্তু তা সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্য অত্যন্ত গভীর বিষয়।

মুসার (আঃ) গোত্রের মধ্যে এমন অনেক লোকই ছিল যারা এ ধরনের অহেতুক প্রশ্ন করতো। তিনি তাদেরকে হিদায়েত করার জন্য আল্লাহ্র কাছে এরূপ ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন, যাতে তারা গোমরাহী থেকে মুক্তি পেতে পারে।

---

[১]। তফসিরে রুহুল বায়ান, খণ্ড-১, পৃঃ-৪০০ এবং তফসিরে কুরতাবী, খণ্ড-২, পৃঃ-১০১৮ এবং তফসিরে ফাখরে রাজী, খণ্ড-৭, পৃঃ-৯।

[২]। তফসিরে ফাখরে রাজী, খণ্ড-৭, পৃঃ-৯।

৯৩- মহিলাদের দেন-মোহ্‌রের বিষয়ে ছাত্র ও আলেমের মধ্যে আরেকটি মুনাযিরা

ছাত্র ঃ আমি অনেকবার শুনেছি যে, ইসলাম বিয়ের সময় বেশী পরিমানে মহিলার দেন-মোহ্‌র করতে নিষেধ করেছে। যেভাবে নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

شوم المرئة غلاء مهرها

- অনক্ষুণে মহিলা তারাই যাদের দেন-মোহ্‌র অনেক বেশী[১]।

افضل نساء امتي اصبحن وجهاً و اقلهنّ مهراً

- আমার উম্মতের মধ্যে তারই হচ্ছে উত্তম মহিলা যারা উত্তম ব্যবহার সম্বলিত ও যাদের দেন-মোহ্‌র কম[২]।

কিন্তু পবিত্র কোরআনের দুই স্থানে দেখতে পাওয়া যায় যে, দেন-মোহ্‌র বেশী করার ব্যাপারে রায় দিয়েছে!

আলেম ঃ পবিত্র কোরআনের কোথায় এমন বিষয় উল্লেখ হয়েছে?

ছাত্র ঃ প্রথমতঃ সূরা নিসার ২০ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে,

و ان اردتم استبدال زوج و اتيتم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً ....

- যদি নিজের স্ত্রীর স্থানে অন্য কোন মহিলার সাথে বিয়ে করতে চাও এবং প্রচুর পরিমানে অর্থ তার (প্রমথ স্ত্রীর) দেন-মোহ্‌র হিসেবে নির্দিষ্ট করে থাকো তবে পরবর্তীতে তার ঐ প্রদত্ত অর্থ থেকে কিছু ফিরিয়ে নিও না।

এই আয়াতে "কিনতার" শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচুর পরিমান ধন-সম্পদ। যা হয়তো হাজার হাজার দিনারও হতে পারে। পবিত্র কোরআন এই আয়াতে "কিনতার" শব্দটির ব্যাপারে কোন না-বোধক মন্তব্য করে নি। বরং বলেছে যদি তা দিয়ে থাকো তবে তার থেকে তা ফিরিয়ে নিও না। সুতরাং বেশী দেন-মোহ্‌র দেয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদি হত তাহলে কোরআন সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পেশ করতো।

এই ব্যাপারে রেওয়ায়েত এসেছে যে, ওমর ইবনে খাত্তাব তার

খেলাফতের সময় যখন দেখলো যে, মহিলাদের দেন-মোহ্‌রের পরিমান দিনের

---

[১]। ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খণ্ড-১৫, পৃঃ-১০।

[২]। ঐ ।

পর দিন বেড়েই চলেছে তখন সে মিম্বারে উঠে বলল ঃ কেন দেন-মোহ্‌রকে বেশী করছো। সাথে সাথে সে হুসিয়ারী উচ্চারণ করে বলল, যদি কেউ চারশত দিরহামের বেশী দেন-মোহ্‌র করে তবে ঐ পরিমানের অতিরিক্ত দিরহাম নিয়ে নেয়া হবে এবং তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর ঐ অতিরিক্ত অর্থ বাইতুল মালের অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হবে। একজন মহিলা তার মিম্বারের পাশ থেকে বলে উঠলো যে, তুমি চারশত দিরহামের বেশী দেন-মোহ্‌র করতে নিষেধ করছো? এবং অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে নেবে তাই বলছো?

ওমর বলল ঃ হ্যাঁ।

মহিলা ঃ তুমি কি এই আয়াতটি পড়নি, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

و آتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً

- যখনই কোন মহিলাকে দেন-মোহ্‌র বাবদ বেশী পরিমানে অর্থ প্রদান করবে তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নিও না। বরং সম্পূর্ণটাই তাকে দিয়ে দিবে।

ওমর এই কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করলো এবং বলল ঃ

كل الناس افقه من عمر حتى المخدرات في الحجال

- সমস্ত মানুষ- এমনকি মহিলারা পর্যন্ত পর্দার আড়ালে থেকেও ওমরের থেকে বেশী জ্ঞানী [১]।

আলেম ঃ এই আয়াতের শানে নুজুল হচ্ছে এরূপ ঃ ইসলাম পূর্ব যুগে অর্থাৎ জাহেলিয়াতের যুগে নিয়ম ছিল যে, কেউ যখন নিজের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য মহিলার সাথে বিয়ে করতে চাইতো, তখন পূর্বের স্ত্রীকে যে দেন-মোহ্‌র দিয়েছিল তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। আর প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে তা গ্রহণ করে দ্বিতীয় স্ত্রীকে দেন-মোহ্‌র হিসেবে প্রদান করা।

এই আয়াতে এই অমানুষিক কাজের সাথে দারুণভাবে বিরোধীতা করে তার বিপরীতে এমন বলেছে যে, যদি প্রচুর পরিমানে দেন-মোহ্‌র নির্দিষ্ট করে থাকো তবে তার থেকে কিছু ফিরিয়ে নিও না। ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু মানুষের জন্য উত্তম তাই নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এটা তো খুবই ভাল জিনিষ যে, দেন-মোহ্‌র বেশী না হওয়া। তবে যদি কেউ দেন-মোহ্‌রকে বেশী পরিমানে নির্ধারণ করে থাকে তবে পরবর্তীতে তার স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে এক চুল পরিমানও কম করতে পারবে না। সুতরাং উক্ত আয়াতটি দেন-মোহ্‌র কম হওয়ার সাথে কোন প্রকার বিরোধীতা রাখে না।

আর ওমরের ঘটনাটি এবং ঐ মহিলার জবাব দানের বিষয়টির ব্যাপারে অবশ্যই

---

[১]। তফসিরে দুররুল মানছুর, খণ্ড-২, পৃঃ-১৩৩, তফসিরে ইবনে কাছির, খণ্ড-১, পৃঃ-৪৬৭, তফসিরে কুরতাবী, কাস্‌সাফ ও গুরাইবুল কুরআন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

বলতে হয় যে, ঐ মহিলার জবাবটি যাথাযোগ্য ছিল। কেননা ওমর বলেছিল ঃ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে কারো দেন-মোহ্‌র যদি চারশত দিরহামের বেশী হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে নিবে এবং তা বাইতুল মালের অংশ হিসেবে স্থান দিবে। তদ্রুপ ঐ মহিলাও হাসতে হাসতে উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছে যে, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে তোমার তা নেয়ার অধিকার নেই। সেক্ষেত্রে ওমরও তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ফলাফল ঃ ইসলাম দেন-মোহ্‌র নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তা কম হওয়ার ব্যাপারে মুসতাহাব নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ তা আঞ্জাম দিলে ভাল। কিন্তু না দিলে তাতে কোন গোনাহ্ নেই। আর যদি কেউ দেন-মোহ্‌রের পরিমান বেশী করে থাকে তবে পরে যেন তা কমিয়ে না দেয়।

ছাত্র ঃ আপনার এই মুল্যবান ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। এখন আমাকে যদি আপনি অনুমতি দেন তবে দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে প্রশ্ন করবো।

আলেম ঃ হ্যাঁ, বল।

ছাত্র ঃ পবিত্র কোরআনে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত শো'য়েবের (আঃ) ঘটনা বর্ণনায় এসেছে যে, যখন হযরত মুসা (আঃ) ফিরআউনদের আক্রমনের ভয়ে মিশর থেকে পালিয়ে মাদাইন শহরে হযরত শো'য়েবের (আঃ) বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল তখন হযরত শো'য়েব (আঃ) হযরত মুসাকে (আঃ) বলেছিলেন ঃ

اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشراً فمن عندك و ما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصابرين

-আমি চাই যে, আমার দুই কন্যার মধ্যে একজনের সাথে তোমার বিয়ে দিতে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, তুমি আট বছর আমার জন্য কাজ করবে। আর যদি দশ বছর কাজ কর তবে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে আমার উপর ভালবাসা। আমি চাই না যে, তোমার উপর কোন ভারী কাজ চাপাতে। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমাকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে (কাসাস ঃ ২৭)।

মুসা (আঃ) শো'য়েবের (আঃ) প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন।

এ থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, দুইজন নবী এই ভারী দেন-মোহ্‌র কবুল করেছেন। আর কোরআন তার বিপরীতে কিছু না বলে বা তার প্রতি না-বোধক কোন কথা উচ্চারণ না করেই তা বর্ণনা করেছে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, কোরআন ভারী বা বেশী পরিমান দেন-মোহ্‌র নির্ধারণ করার পক্ষে।

আলেম ঃ মুসার (আঃ) সাথে শো'য়েবের (আঃ) কন্যার বিয়েটা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। এটা ছিল একটি ভূমিকা মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি এই বিয়ের কারণে শর্ত সাপেক্ষে আট বছর বৃদ্ধ পীরে কামেল শো'য়েবের (আঃ) কাছে অবস্থান করে সেখান থেকে জ্ঞান ও পরিপূর্ণতা অর্জন করবেন। আর এই কারণেই দেন-মোহ্‌র

বাবদ তাকে আট বছর কাজের শর্ত দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্য দিকে শো'য়েবই (আঃ) মুসার (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীর জীবন পরিচালনার খরচ বহন করেছিল। তাই আমারা যদি মুসার (আঃ) কাজের পারিশ্রমিক থেকে তাঁর জীবন পরিচালনার খরচকে বাদ দেই তবে এমন কোন পরিমান অর্থ অবশিষ্ট থাকবে না। আর তা দেন-মোহ্রের ক্ষেত্রে কোন বেশী পরিমান নয়। সুতরাং বাহ্যিকভাবে দেখতে পাওয়া বেশী পরিমান দেন-মোহ্র ছিল মুসার (আঃ) প্রাথমিক জীবনের ভূমিকা স্বরূপ। যা তিনি তাঁর কন্যার অনুমতিতেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলে। আর শো'য়েব (আঃ) এর মাধ্যমে চেয়েছিলেন যে, মুসাকে (আঃ) ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানো থেকে নাজাত দিবেন। তাই তিনি এরূপ একটি কঠিন শর্তের মাধ্যমে এ কাজ করেছিলেন। এ ছাড়া মুসার (আঃ) ব্যাপারে তাঁর আর অন্য কোন পরিকল্পনাও ছিল না। যেমন তিনি প্রথমেই বলেছেন ঃ

و ما ارید ان اشق علیك ....

- তোমাকে কোন কঠিন কাজ দেয়ার ইচ্ছা আমার নেই ....।

এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসার (আঃ) ব্যাপারে শো'য়েবকে (আঃ) এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন।

ছাত্র ঃ আপনার যুক্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। শো'য়েব (আঃ) খুব চিন্তা-ভাবনা করেই এরূপ কাজ করে মুসাকে (আঃ) সাহায্য করেছিলেন।

৯৪- মুয়া'বিয়ার উপর লানত করা জায়েয কিনা সে ব্যাপারে মুনাযিরা

বিশিষ্ট মার্জা মরহুম আয়াতুল্লাহ্ আল উ'যমা সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ্ সিরাযী বলেনঃ ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুরবাতে জাম এলাকার প্রায় ২০ জন হজ্জ করতে এসেছিল। তারা ছিল সুন্নী মাযহাবে অনুসারী। মদীনায় সাফা বাগানে আমরা এক সঙ্গে অবস্থন করেছিলাম। এমতাবস্থায় ইসফাহান প্রদেশের আরো কিছু লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে সেখানে একত্রিত হল।

যেখানে আমরা ছিলাম সেখানে ইমাম হুসাইনের (আঃ) জন্য আযাদারীর ব্যবস্থা করার চিন্তা করলাম। কারণ আশুরা অতি নিকটেই ছিল। অন্যান্যদের সাথে কথা বললাম তারা সকলেই সম্মতি দিলো। সকলের সম্মাতিক্রমে আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম।

মদীনার সুন্নী মাযহাবের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও সেখানে দাওয়াত করা হল। তাদের সাথে আমার ইমাম আলীর (আঃ) বিভিন্ন ফাযায়েল (ফযিলত) ও মানাকিব (জীবনবৃত্তান্ত) নিয়ে আলোচনা হল। তারা আমার সব কথাই মেনে নিল এবং তারা নিজেরা ইমাম আলীর (আঃ) ব্যাপারে নবীর (সাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস উল্লেখ করলো যে, নবী (সাঃ) আলীকে (আঃ) বলেছেন ঃ

لحمك لحمي دمك دمي

- তোমার শরীরের মাংস হচ্ছে আমার মাংস, আর তোমার শরীরের রক্ত হচ্ছে আমার রক্ত।

এবং আরো অন্যান্য রেওয়ায়েত উল্লেখ করলো যে, আলীর (আঃ)

বন্ধু হচ্ছে নবীর (সাঃ) বন্ধু এবং তাঁর শত্রু হচ্ছে নবীর (সাঃ) শত্রু, নবীর (সাঃ) শত্রু হচ্ছে আল্লাহ্র শত্রু। ইত্যাদি ....।

আলোচনা করতে করতে মুয়া'বিয়ার উপর লানত করার বিষয়ে পৌছে গেলাম। তারা বলল ঃ মুয়া'বিয়ার উপর লানত করা জায়েয নয়, কিন্তু ইয়াযিদের উপর লানত করা হচ্ছে জায়েয। কেননা সে ইমাম হুসাইনকে (আঃ) হত্যা করেছে।

বললাম ঃ তোমাদের মাযহাবের দৃষ্টিকোণে তো মুয়া'বিয়ার উপর

লানত করা জায়েয। কেননা তার উপর লানত করার কারণটি তোমরা একটু আগেই উল্লেখ করছো যে, নবী (সাঃ) আলীর ব্যাপারে বলেছেন ঃ

اللهم عاد من عاداه

- আল্লাহ্ তা'য়ালা আলীর (আঃ) শত্রুকে শত্রু মনে করেন[১]।

এটা তো স্পষ্ট যে, মুয়া'বিয়া আলীর (সাঃ) শত্রুতা পোষণ করতো এবং জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। আর এ কাজের জন্য তওবাও করে নি। আলীর (আঃ) সম্পর্কে বাজে কথা বলতে দিধাবোধ করতো না।

সুতরাং যেহেতু নবী (সাঃ) আলীর (আঃ) শত্রুর উপর লানত করেছেন[২], সেহেতু মুয়া'বিয়া ছিল আলীর (আঃ) প্রধান শত্রু তাই তার উপর লানত করা জায়েয[৩]।

এখানে বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আহ্‌লে সুন্নাতের নির্ভূল দলিলের ভিত্তিতে রাসূলে খোদা (সাঃ) স্বয়ং মুয়া'বিয়া, আবু সুফিয়ান ও ইয়াযিদের উপর লানত করেছেন। এমনকি বলেছেন যে, যখন মুয়া'বিয়াকে মিম্বারের উপর দেখবে তখন তাকে হত্যা করবে[৪]।

সুতরাং যদিও বলা হয়ে থাকে যে, মুয়া'বিয়া ইজতিহাদের ভিত্তিতে আলীর (আঃ) সাথে শত্রুতা করেছে। তাই এর উত্তরে বলতে হয় ঃ নবীর (সাঃ) কথার বিপরীতে ইজতিহাদ করা কখনোই জায়েয নয়। আর তিনি মুয়া'বিয়ার দুষ্ট চরিত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি তার উপর লানত করেছেন। এমনকি সুন্নী মাযহাবের দলিল অনুযায়ী নবী (সাঃ) একদিন মুয়া'বিয়া ও আ'মরু আ'সের ব্যাপারে এরূপ লানত করছিলেন ঃ

আল্লাহ্ মুয়া'বিয়া ও আ'মরু আ'সকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ কর[৫]।

সুন্নী মাযহাবের কাছে গ্রহণযোগ্য অনেক সাহাবাই মুয়া'বিয়ার ব্যাপারে বেশ বাজে কথাও বলেছেন। (এই বিষয়টির ব্যাখ্যা আল গাদীর নামক গ্রন্থের ১০ নং খণ্ডে ১৩৯ থেকে ১৭৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

---

[১]। হাদীসে গাদীরের অংশ।

[২]। ইকতিবাস আল ইহতিজাজাতুল আশারাহ্ , ৫নং ইহতিজাজ।

[৩]। তারিখে তাবারী, খণ্ড-১১, পৃঃ-১৩৫৭, তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃঃ-২০৯।

[৪]। তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-১২, পৃঃ-১৮১, শারহি নাহ্‌জুল বালাগাহ্, ইবনে আবীল হাদীদ, খণ্ড-৪, পৃঃ-৩৩।

[৫]। সিফ্‌ফিন কিতাব, ইবনে মাযাহীম, পৃঃ-২১৯ ও মুসনাদে আহ্‌মাদ, খণ্ড-৪, পৃঃ-২৪৮।

৯৫- ইমাম হুসাইনের (আঃ) জন্য ক্রন্দনের ব্যাপারে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে মুনাযিরা

একজন বিজ্ঞ বক্তা মিম্বারে উঠে বক্তব্য দেয়ার সময় সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইনের (আঃ) জন্যে ক্রন্দনের ছওয়াব রয়েছে এ মর্মে অনেক রেওয়ায়েত তুলে ধরে বলল, রাসূলে আকরাম বলেছেন ঃ

كان عين باكية يوم القيامة الا عين بكت على مصاب الحسين فانها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة

- কিয়ামাতের দিনে সমস্ত চক্ষুগুলো ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে শুধুমাত্র যে চক্ষুগুলো ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে কেঁদেছে সেগুলো ব্যতীত। আর এ ধরনের ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিনে বেহেশ্‌তী নে'য়ামতে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দে হাসবে[১]।

বক্তব্য শেষে ঐ বক্তার সাথে একজন শ্রোতার নিম্নোক্ত মুনাযিরা অনুষ্ঠিত হয় ঃ

শ্রোতা ঃ ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে কাঁদার ফলে এত পুরস্কার দানের কারণ কি?

(যদিও ইমাম হুসাইন (আঃ) দুনিয়ায় বিশেষ সাহসিকতার সাথে কিয়াম করে বিজয় অর্জন করেছেন ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছেন। সাথে সাথে নিজের এবং তাঁর পরিবারবর্গের পবিত্র রক্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় উজাড় করে ইয়াযিদ ও তার লোকজনদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। আর আখিরাতে বেহেশ্‌তকে নিজের আয়ত্তে এনেছেন। বর্তমান সময়ে তিনি আলামে বারযাখের উচ্চ স্থানে অবস্থান করছেন এবং আল্লাহ্‌র নে'য়ামত উপভোগ করছেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণে আসলে তিনি ইন্তোকাল করেন নি। কেননা পবিত্র কোরআন সূরা আলে ইমারানের ১৬৯ নং আয়াতে বলেছে ঃ

و لا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً احياء عند ربهم يرزقون

- হে নবী! কখনোই মনে করো না যে, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেন তারা মারা গেছেন রবং তারা জীবিত আছেন এবং তাদের পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে রিজিক পেয়ে থাকে।

বক্তা ঃ আমাদের কাছে প্রচুর পরিমানে রেওয়ায়েত আছে যে, মু'মিনদেরকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে তারা যেন ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতের জন্য ক্রন্দন ও আযাদারী করেন। আর ক্রন্দনের মাধ্যমেই যেন ইমাম হুসাইনকে (আঃ) জীবিত

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৪৪, পৃঃ-২৯৩।

রাখেন। শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবেই এই রেওয়ায়েত উল্লেখিত আছে যে, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (সালাঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ আবেদন জানাবেন ঃ

اللهمّ أقبل شفاعتي فيمن بكى على ولدي الحسين (ع)

- হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমার সন্তান হুসাইনের জন্য ক্রন্দন করেছে তার ব্যাপারে আমার শাফা'য়াত গ্রহণ কর।

এবং এই রেওয়ায়েতের পর এসেছে যে ঃ

فيقبل الله شفاعتها و يدخل الباكين على الحسين (ع) في الجنة

- আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত ফাতিমা যাহ্‌রার (সালাঃ) শাফায়া'তকে কবুল করে নিবেন এবং ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে যারা ক্রন্দন করছে তারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে[১]।

বিভিন্ন রেওয়ায়েরেত অনুযায়ী নবীগণ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আহ্‌লে বাইতের সকল ইমামগণ (আঃ), ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে ক্রন্দন ও আযাদারী করেছেন। যদি আমরা আল্লাহ্‌র অলি-আউলিয়াগণকে অনুসরণ করে ইমাম হুসাইনের (আঃ) জন্য ক্রন্দন করি তবে তাতে সমস্যা কোথায়? আমাদের দৃষ্টিতে তাতে কোন সমস্যা তো নে-ই বরং এই সুন্নতকে জীবিত রাখার কারণে নবী (সাঃ) ও অন্যান্য ইমামগণের (আঃ) কাছে প্রিয় এবং পুরস্কৃত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

ইমামগণ (আঃ) ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতের ব্যাপারে ক্রন্দন করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে

দুটি বিশেষ ধরনের ঐতিহাসিক বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

১- একদিন ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) শুনতে পেলেন যে, বাজারে একজন ব্যক্তি এই বলে চিৎকার দিচ্ছে ঃ হে মানব সকল! আমার উপর দয়া কর, আমি এক সহায়-সম্বলহীন লোক! (انا الغريب فارحموني) ।

ইমাম সজ্জাদ (আঃ) বাজারের দিকে ছুটে গেলেন। তাকে দেখে বললেন ঃ যদি এমন হয়ে থাকে যে, তুমি এখানেই এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে তবে কি তোমার জানাযা দাফনহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকবে?

সে বলল ঃ আল্লাহু আকবার! কেন আমার জানাযা দাফন করবে না, আমি তো

---

[১]। আল্ ইহতিজাজাতুল আশারাহ্, পৃঃ-২০।

মুসলমান এবং ইসলামের উম্মতের মাঝেই আছি।

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) কেঁদে ফেলে বললেন ঃ

وا أسفاه عليك يا ابتاه! تبقي ثلاثة ايام بلا دفن و انت ابن بنت رسول الله (ص).

- হায় মুসিবত। এটা কত দুঃখের বিষয় যে, হে আমার পিতা হুসাইন (আঃ) তুমি নবীর (সাঃ) কন্যার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিন দিন তোমার জানাযা দাফনহীন অবস্থায় মাটির উপর পড়ে ছিল[১]।

২- ইতিহাসে এসেছে যে, মানসুর দাওয়ানিকি (দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা) তার মদীনার গর্ভণরের কাছে এ মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছিল যে, ইমাম সাদিকের (আঃ) বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দাও।

মদীনার গর্ভণর উক্ত নির্দেশ পেয়ে আগুন জ্বালানোর উপকারণ সরঞ্জাম করতে বলল এবং ইমাম সাদিকের (আঃ) বাড়ীর দিকে রওনা হল। অবশেষে তারা ইমামের বাড়ীতে আগুন লাগালো। যখন আগুন সমগ্র বাড়ীটাকেই গ্রাস করলো তখন ঘরের ভিতর থেকে বাড়ীর মহিলাদের চিৎকারের ধ্বনি বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিলো। ইমাম অনেক কষ্টে ঐ আগুন নিভাতে সক্ষম হন। পরের দিন তাঁর কয়েকজন অনুসারী বা ভক্তবৃন্দ তাকে দেখতে গিয়ে দেখলো যে, তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় আছেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি কি গতকালের ঘটনা এবং শত্রুদের এই রূঢ় আচারণের কারণে কাঁদছেন; যদিও এরূপ ঘটনা আপনাদের নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইতের পরিবারের সাথে এই প্রথম বার নয়?

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন ঃ না, আমি গতকালের ঘটনার জন্য কাঁদছি না। বরং আমার কাঁদার কারণ হচ্ছে যে, গতকাল বাড়ীতে আগুন লাগার পর আমি আমার পরিবারের লোকজনকে বাচানোর জন্য এঘর থেকে ওঘরে দৌড়াচ্ছিলাম যাতে করে আগুন যেন তাদেরকে কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, হটাৎ

فتذكرت روعة عيال جدي الحسين يوم عاشورا لما هجم القوم عليهن، و مناديهم ينادي احرقوا بيوت الظالمين

- আশুরার দিনে আমার পূর্ব পুরুষ ইমাম হুসাইনের (আঃ) পরিবারের লোকজনের অতর্কিত মূহূর্তগুলোর কথা, যখন শত্রুরা তাদেও উপর হামলা করেছিল এবং শত্রুরা

১। মাসাতুল হুসাইন, লেখক আল খাতিব শেইখ আব্দুল ওহাবুল কাস্‌সি, পৃঃ- ১৫২।

চিৎকার দিয়ে বলছিল যালেমদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগাও, আমার স্মরণে পড়ে গেল[১]।

উপরোল্লিখ দুটি ঘটনা এবং আরো না বলা ঘটনা রয়ে গেছে যা থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, ইমামগণ (আঃ) চেয়েছিলেন প্রতিটি সময় ইমাম হুসাইনের (আঃ) হৃদয় বিদারক কারবালার ইতিহাসকে জীবিত রাখতে এবং হৃদয়বান মানুষের ব্যথীত অন্তরসমূহকে একত্রিত করতে। সুতরাং আমরা নবী (সাঃ) ও ইমামগণকে (আঃ) অনুসরণের মাধ্যমে ইমাম হুসাইনের (আঃ) বেদনাময় কারাবালার ইতিহাসকে জীবিত রাখবো। আর এ কাজের জন্য আখিরাতে আমাদেরকে যে, বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে ক্রন্দন করা বা ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়া যে কত পবিত্র ও মর্যাদার ব্যাপার যা ইমাম যামান (আঃ) ইমাম হুসাইনের (আঃ) প্রতি দুরুদ পাঠ করে বলেন ঃ

السلام على الجيوب المضرجات

- সালাম তাদের উপর যারা ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে ক্রন্দনরত হয়[২]।

শ্রোতা ঃ এই বিষয়ের প্রতি আপনার সুমধুর ব্যাখ্যা দানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। অবশ্যই আমরা আউলিয়া ও ইমামগণকে (আঃ) আমাদের জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবো। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে, ইসলামের সমস্ত নির্দেশই কোন না কোন মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখেই দেয়া হয়েছে এবং তা অবশ্যই একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নির্দেশিত হয়েছে। কতই না ভাল হয় যে, আমরা সেগুলোর প্রতি বিশেষ পরিচিতি নিয়ে তা আঞ্জাম দেবো। আর তাই এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে, এই ক্রন্দনের প্রকৃত দর্শন কি?

বক্তা ঃ ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে ক্রন্দন করার দর্শনের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

১- সম্মান প্রদর্শন ঃ মৃত মু'মিন ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা তার প্রতি এক ধরনের সম্মান প্রদর্শন করা। আর তাতে এটাই বুঝায় যে, সমাজে তার স্থানটি খালি রয়ে গেছে। সে আর বেচে নেই যে, মানুষ তার থেকে উপকৃত হতে পারবে। ক্রন্দন হচ্ছে অন্তরের এক নিগুড় প্রেরণা বা ভালবাসা যা হৃদয়ের সাথে একাকার হয়ে থাকে। তা এটাই প্রমাণবহ যে, তার উপস্থিতিটা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য ছিল বরকত ও রহমত স্বরূপ। আর এটা তো একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, মানুষ যতই বড় হবে ক্রন্দন তার জন্য আরো বেশী গভীর অর্থবহ হবে।

কোন ব্যক্তি যদি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং তার জন্য কেউ ক্রন্দন না

---

[১]। মাসাতুল হুসাইন, লেখক আল খাতিব শেইখ আব্দুল ওহাবুল কাস্‌সি, পৃঃ- ১৩৫,১৩৬।

[২]। আলওয়াকায়া' ওয়াল হাওয়াদিস, খণ্ড-৩, পৃঃ-৩০৭।

করে তবে এটা কি তার প্রতি অসম্মান হল না?

একজন ইমাম আলীর (আঃ) কাছে জিজ্ঞাসা করলো ঃ উত্তম নৈতিক চরিত্র কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ

ان تعاشروا الناس معاشرة ان عشتم حنوا اليكم و ان متّم بكوا عليكم

- মানুষের সাথে এমনভাবে চলা-ফেরা করবে যে, তোমার জীবিত থাকা অবস্থায় তারা যেন তোমার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং তোমার ইন্তেকালের পরে তারা যেন তোমার জন্যে ক্রন্দন করে[১]।

আর প্রতিটি সামাজেরই রীতিনীতি হচ্ছে যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তার জন্য ক্রন্দন করা এবং তার পরিবারের লোকজনকে সহমর্মিতা দেখানো। আর ইমাম হুসাইন (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণের শাহাদতবরণ করাটা তো ছিল দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং তা হচ্ছে বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ট ত্যাগ। তাই তাঁর জন্য ক্রন্দন করার অর্থ হচ্ছে তার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা এবং দ্বীনের শ্লোগান। যেমন পবিত্র কোরআন বলেছে ঃ

و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

- যে কেউ খোদায়ই শ্লোগনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তা হচ্ছে অন্তরে তাকওয়া থাকার নমুনা স্বরূপ (হাজ্জ ঃ ৩২)।

২- ভালবাসার ক্রন্দন ঃ এক দিনের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শুষ্ক কণ্ঠ, জিহ্বা ও ঠোট নিয়ে ইমাম হুসাইন (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনার প্রকৃত মানুষের অন্তর ব্যথা-বেদনায় পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া এবং অত্যাচারীর সেই নিদারুণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর এক ঐশীক শক্তি সঞ্চারীত হয়ে থাকে। আর নিঃসন্দেহে কারবালার সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা এতই গভীর ও বেদনা দায়ক যে, তা কখনোই পুরাতন হয়ে যাবে না এবং তা কখনোই ভুলে যাবার নয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

হযরত ঈসার (আঃ) শত্রুরা তাদের (খৃষ্টানদের) বিশ্বাস মতে তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছে। এখন সারা বিশ্বে সব ক্ষেত্রেই যদি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, খৃষ্টানরা ক্রুস চিহ্নটিকে ঈসার (আঃ) সম্মানে গলায় ঝুলিয়ে রাখে আর তা প্রতিটি স্থানে (কবরের পাথররের উপর এবং আরো

---

[১]। আলওয়াকায়া' ওয়াল হাওয়াদিস, খণ্ড-৩, পৃঃ-১৩৭।

বিভিন্ন স্থানে) স্থাপন করে থাকে। যদিও ঈসা (আঃ) হত্যা হওয়ার ঘটনাটি (যা তারা বলে থাকে) সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইনের (আঃ) শাহাদতের ঘটনার থেকেও অনেক ক্ষুদ্র পরিষরের। সুতরাং তাঁর জন্য আযাদারী এবং ক্রন্দন করার মাধ্যমে তাঁর ঐ পবিত্র কিয়ামের সাথে আমাদের একটি সম্পর্ক স্থাপন হয়ে থাকে।

একজন শিক্ষকের কথা অনুযায়ী ঃ কোন কিছু বয়ান করার মাধ্যম হচ্ছে আক্বল কিন্তু ভালবাসা বয়ানের মাধ্যম হচ্ছে চোখ। যখনই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে কারো দুঃখে চোখের পানি ঝরবে তখনই ভালবাসা সেখানে উপস্থিত হবে। কিন্তু যখন কোন যুক্তিসঙ্গত কথা বয়ান করা হবে আক্বল সেখানে উপস্থিত হবে।

সুতরাং যুক্তিসঙ্গত বয়ান যেমন বক্তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রকাশ করে থাকে তদ্রূপ চোখের পানির মাধ্যমেও শত্রুর বিপক্ষে ও ভালবাসার পক্ষে যুদ্ধ করা যেতে পারে[১]।

কখনোই শত্রুর মুকাবিলায় উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে এবং তাদের ধ্বংসের জন্য হৃদয় সম্বলিত বিষয়াদিকে ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা শয়তানী শক্তির কারণেই অভ্যূর্থানের চক্র ঘূর্ণিত হয়ে থাকে।

৩- ক্রন্দন হচ্ছে অনুমোদন দেয়া ঃ ইমাম হুসাইনের মুসিবতে ক্রন্দনের আরো একটি অর্থ হচ্ছে তাঁর সে পবিত্র কিয়ামকে অনুমোদিত করা। আর শত্রুর বিপক্ষে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্বেষ প্রকাশ করা এবং এর অর্থ হচ্ছে তুমি আমাদের অন্তরে ও ভালবাসায় সদা-সর্বদা অবস্থান করছো হে হুসাইন (আঃ)! যেমন বলা হয়ে থাকে যে, (আমাদের অন্তর কবরে তুমি মৃত দেহ নিয়ে জীবিত আছে, তুমি তো আমাদের হৃদয়, আর প্রকৃত পক্ষে তুমি তো আমাদের অন্তর কুঠিরে রয়েছো)। এই হচ্ছে আমাদের শিয়াদের প্রতিটি সময়ের ও প্রতিটি স্থানের কথা যা তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ

ক)- আমাদের অন্তর ইমাম হুসাইন (আঃ) যার জন্যে নিহত হয়েছেন সেই স্রষ্টার প্রতি দৃঢ় ঈমান ধারন করে।

খ)- আমাদের কর্ণ সর্বদা তাঁরই বক্তব্য শ্রবণ করে থাকে।

গ)- আর আমাদের ক্রন্দনরত চোখের পানির কনাগুলো কারবালায় ইমাম হুসাইনের (আঃ) নির্মমভাবে হত্যা হওয়ার ঘটনাকে পুনরাবৃত্তি করে থাকে। যে ক্রন্দন এই তিনটি বিশেষনের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তা মানুষের সুস্থ প্রকৃতিগত স্বভাব (ফিতরাত) থেকে গৃহীত। আর তাতে কোন সমস্যা তো নে-ই বরং প্রচুর পরিমানে ফয়দাও রয়েছে বটে। যা ইমাম হুসাইনের সত্য পথের পথিক হতে আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

---

[১]। মাযহাব সৃষ্টির কারণ, পৃঃ- ১৫০।

৪- ক্রন্দন, শত্রুর নষ্ট চেহারাকে উন্মোচন এবং একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করে থাকে ঃ যে কোন ব্যক্তিই ইমাম হুসাইনের (আঃ) নির্মমভাবে হত্যা হওয়ার ঘটনাকে শুনবে এবং জানবে যে, তাঁর পরিবারের মহিলা ও শিশুগণ সেই উত্তপ্ত মরুভুমির উপরে কারো কোন সাহায্য ছাড়াই শত্রুর আক্রমনে সব কিছু হারিয়েছে তখন তার অন্তর ভাবাবেগে আপ্লুত এবং ইয়াযিদদের নষ্ট চরিত্র সম্পর্কে অবগত হবে। সুতরাং ইমাম হুসাইনের (আঃ) জন্য ক্রন্দন করা হচ্ছে জুলুমের বিপক্ষে লড়াই করা এবং শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে মু'মিনগণকে একত্রিত করা। আর তা হচ্ছে এক ধরনের ভাল কাজে উপদেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ করা। অতএব যখনই ক্রন্দনের মাধ্যমে শত্রুর নষ্ট চেহারাকে উন্মোচন এবং একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য (এলাহী উদ্দেশ্য) পেশ করা হবে তখনই তা হবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শত্রু ও জুলুমের ধ্বংসের ব্যাপারে এক উত্তম পদক্ষেপ।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে ঃ ক্রন্দন হচ্ছে কয়েক প্রকারের। যেমন ঃ আল্লাহ্ ভয়ে ক্রন্দন করা, ব্যাথা-বেদানায় ক্রন্দন করা, ভালবাসার ক্রন্দন এবং একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করার ক্রন্দন ....। আর যদি এই ক্রন্দনসমূহ থেকে তার সঠিক বক্তব্য উদঘাটন করা যায় তবে অনেক পছন্দের ও উপযুক্ত হবে। হ্যাঁ, এক ধরনের ক্রন্দন আছে যা হচ্ছে ভেঙ্গে পড়ার ক্রন্দন যা (যিল্লাত) অপমানের কারণ হয়ে থাকে। এ ধরনের ক্রন্দন শুধুমাত্র অসহায় ব্যক্তিরাই করে থাকে এবং আল্লাহ্র আউলিয়গণ কখনোই এ ধরনের ক্রন্দন করেন নি।

সুতরাং আযাদারী বা ক্রন্দনের দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে সম্মান জনক এবং অপরটি হচ্ছে অপমান জনক। আমরা অপমান জনক ক্রন্দনকে পরিহার করে সম্মান জনক ক্রন্দনকে গ্রহণ করে থাকি। কেননা তাতে অনেক ফয়দা রয়েছে। যেমন তা হচ্ছে ভাল কাজের উপদেশ দান এবং খারাপ কাজে নিষেধ করার একটি উত্তম পন্থা এবং অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সমমান।

শ্রোতা ঃ আপনার আলোচনার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। তা আমাকে সঠিক চিন্তায় পৌছাতে সাহায্য করেছে।

বক্তা ঃ এখানে আরো একটা কথা বলতে চাই যে, ইসলামের অনেক পদক্ষেপের সাথে রাজনীতির সম্পর্কেও রয়েছে। আর ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতে আযাদারী বা ক্রন্দন করা হচ্ছে তারই একটি অংশ। যা আমরা পূর্বে ৮১ নং মুনাযিরাতে উল্লেখ করেছি। ইমামগণ (আঃ) আযাদারীর মাধ্যমে সত্যকে বাতিলের থেকে আলাদা এবং অসচেনত মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। সাথে সাথে এটাও চেয়েছিলেন যে, এর মাধ্যমেই আশুরাকে জীবিত রাখতে। যেমন ইমাম কাযিম (আঃ) বলেছেন ঃ ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) আংটিতে লেখা ছিল যে,

خزي و شقي قاتل الحسين بن علي عليه السلام

- ইমাম হুসাইনের (আঃ) হত্যাকারী ধ্বংস হয়ে গেছে[১]।

এটা তো ভাবনার বিষয় যে, ইমাম সাজ্জাদ কেন তাঁর আংটিতে এই বাক্যটি লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন?

উত্তরে বলতে হয় যে, তিনি চেয়েছিলেন এই লেখার মাধ্যমে ইমাম হুসাইনের (আঃ) কারবলা প্রন্তরে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনাটি যেন কেউ ভুলে না যায় এর বেশী কিছু নয়। কেননা মানুষ যখন তাঁর কাছে আসবে তখন ঐ আংটির লেখার উপর তাদের দৃষ্টি পড়বে তখন উমাইয়্যাদের জুলুমের ঘটনাকে তাদের স্মরণে আনবে।

---

[১]। মুনাতিয়াল আমাল, খণ্ড-২, পৃঃ-৩।

৯৬- মুহাম্মদ (সাঃ) যে সর্বশেষ নবী সে ব্যাপারে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ ইসলামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, নবী (সাঃ) হচ্ছেন দ্বীনের সর্ব শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না এবং তাঁর আনিত শরীয়তই কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এই বিষয়ের উপর পবিত্র কোরআনে প্রচুর আয়াতও এসেছে। যেমন ঃ সূরা আহ্যাবের ৪০ নং আয়াত, সূরা ফুরাকানের ১নং আয়াত, সূরা ফুস্সিলাতের ৪১, ৪২ নং আয়াত, সূরা আনয়া'মের ১৯ নং আয়াত এবং আরো অন্যান্য সূরাতে।

এ ব্যাপারে রেওয়ায়েত এসেছে প্রচুর পরিমানে। কিন্তু এত সব দলিল থাকা সত্বেও নবীর (সাঃ) পরবর্তী সময়ে একদল লোক এই বিষয়টিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মিথ্যা নবী তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন মাযহাব যেমন ঃ কাদিয়ানী, বাবী ও বাহায়ীর মত আরো কত মাযহাবের জন্ম দেয়। এখন এ পর্যায়ে আমরা মুসলমানের সাথে এক বাহায়ীর মুনাযিরা তুলে ধরার চেষ্টা করবে ঃ

মুসলমান ঃ তোমরা তো তোমাদের লিখিত গ্রন্থসমূহে লিখেছে যে, ইসলাম ও কোরআনকে গ্রহণ করে থাক। তবে পার্থক্য শুধু এতটুই যে, তোমার কথা হচ্ছে ইসলামের পরেও অন্য দ্বীন এসেছে। এ ব্যাপারে তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, যেহেতু পবিত্র কোরআনে প্রচুর আয়াত আছে যা ইসলামকে একটি বিশ্বব্যাপী ও চিরন্তন দ্বীন হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। সাথে সাথে "খাতামিয়াত"-এর বিষয়টি উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আর কোন নতুন দ্বীন আসবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্বীন হচ্ছে বাতিল এ প্রসঙ্গে তোমার মতামত কি?

বাহায়ী ঃ কোরআনের কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবী (সাঃ) হচ্ছেন সর্ব শেষ নবী ?

মুসলমান ঃ সূরা আহ্যাবের ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شيىء عليماً

- মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কারো পিতা নন, বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র নবীগণের সর্বশেষ নবী; আর আল্লাহ্ সকল কিছুর ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন।

"খাতামান্নাবীইন" বাক্যটি পরিস্কারভাবে বলছে যে, নবী (সাঃ) হচ্ছেন সর্ব শেষ নবী।

কেননা "খাতাম" শব্দটির কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে। তবে এখানে তার অর্থ হচ্ছে সমাপ্তকারী। সুতরাং এই আয়াতের দৃষ্টিতে নবী (সাঃ) হচ্ছেন সর্ব শেষ নবী বা অন্যান্য নবীগণের কাজের পরিসমাপ্তকারী। আর তাঁর পরে আর কোন দ্বীন বা শরীয়ত আসবে না।

বাহায়ী ঃ "খাতাম" এর অর্থ হচ্ছে আংটি। যা আঙ্গুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, নবী (সাঃ) অন্যান্য নবীগণের সৌন্দর্য স্বরূপ।

মুসলমান ঃ "খাতাম" শব্দটির সর্বজন বিধিত অর্থ হচ্ছে ঐটিই যা আমি আগে বলেছি। আর "খাতাম" শব্দটিকে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির ব্যাপারে কোথাও ব্যবহার করা হয় নি এবং অভিধানে আমার বলা অর্থটিরই উল্লেখ আছে। তাই এখানে কোন প্রশ্নই উঠে না যে, "খাতাম" শব্দের প্রকৃত অর্থ রেখে অন্য কোন অর্থের দিকে হাত বাড়াবো। এখানে কয়েকটি অভিধানে "খাতাম" শব্দের অর্থ তুলে ধরা হলঃ

ফিরুযাবাদী "কামুস আললোগাহ্" -তে লিখেছেন যে, "খাতাম" শব্দটির অর্থ হচ্ছে সিল-মোহ্র করা এবং "খাতামাস সাই"-এর অর্থ হচ্ছে তার শেষ পর্যায় পৌছিয়েছে।

জাওয়াহীরি তার "সাহাহ্" অভিধানে লিখেছে যে, "খাতামাস সাই"-এর অর্থ হচ্ছে তার শেষ পর্যায় পৌছিয়েছে।

আবু মানযুর তার "লিসানুল আরাব" অভিধানে লিখেছে যে, "খাতামুল কাউম"-এর অর্থ হচ্ছে কোন গোত্রের সর্ব শেষ ব্যক্তি।

রাগিব তার মুফরাদাতে লিখেছে যে, "খাতামুন্নাবীইন" শব্দের অর্থ হচ্ছে নবীর (সাঃ) দুনিয়ায় আসার মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাকে সমাপ্ত করেছেন বা নবুওয়াতের ধারাকে বন্ধ করেছেন[১]।

ফলাফল ঃ "খাতাম" শব্দের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য অর্থ ব্যবহার করলে তা অভিধানের অর্থের সাথে বিরোধ পোষণ করবে। আর তা ব্যবহারের পক্ষে কোন দলিলও নেই।

বাহায়ী ঃ "খাতাম" শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিঠির খামের উপর মোহ্রাঙ্কিত করা যা সত্যায়ণের কাজ করে থাকে। তাই নবীও (সাঃ) অন্যান্য নবীগণের কাজের সত্যায়ণকারী।

মুসলমান ঃ উপরের আলোচনাতে পরিস্কার হয়ে গেছে যে, "খাতাম" শব্দের অর্থ হচ্ছে সমাপ্তকারী। আর তা থেকে সত্যায়ণ অর্থটি কখনোই বুঝা যায় না। যেহেতু সে ব্যাপারে কোন দলিলও নেই তাই আমরা এর প্রকৃত অর্থ থেকে সরে আসার কোন

---

[১]। অভিধান সমূহে 'খাতাম' শব্দটি দেখুন।

কারণও খুজে পাই না। আর "খাতাম" শব্দের অর্থ যে, তুমি বলছো মোহ্‌রাঙ্কিত করার অর্থও এটাই বুঝায় যে, সমাপ্তি।

বাহায়ী ঃ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবী (সাঃ) হচ্ছেন "খাতামুন্নাবীইন" অর্থাৎ নবীগণের সর্ব শেষ নবী। সেখানে তো বলা হয় নি যে, "খাতামুল মুরসালীন" অর্থাৎ রাসূলগণের সর্ব শেষ রাসূল। সুতরাং তাঁর পরে রাসূল আসার পথ তো আর বন্ধ হয়ে যায় নি!!

মুসলমান ঃ যদিও পবিত্র কোরআনে নবী ও রাসূলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। উদারহরণ স্বরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ইসমাঈলকে (আঃ) কখনো রাসূল বলেছেন আবার কখনো নবী বলেছেন (মারইয়াম ঃ ৫৪)। তদ্রুপ হযরত মুসাকে (আঃ) কখনো রাসূল বলেছেন আবার কখনো নবী বলেছেন (মারইয়াম ঃ ৫১)। কিন্তু এই বিষয়টি "খাতামুন্নাবীইন" শব্দের সাথে কোন সম্পর্কই স্থাপন করে না। কেননা নবী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পয়গাম্বরীর দায়িত্ব পেয়েছেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। হয়তো তিনি তা মানুষে মাঝে বর্ণনা করার জন্য দায়িত্ব পেয়েও থাকতে পারেন আবার নাও পেয়ে থাকতে পারেন। তবে রাসূল হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শরীয়ত এবং আসমানী কিতাব পেয়ে থাকেন এবং তা মানুষের মাঝে অবশ্যই বয়ান করবেন। সুতরাং প্রতিটি রাসূলই হচ্ছেন নবী, কিন্তু প্রতিনি নবীই রাসূল নন। তাহলে যদি বলা হয়ে থাকে যে, নবী (সাঃ) হচ্ছেন খাতামুল আম্বিয়া অর্থাৎ তার পরে আর কোন নবী আসবে না। আর যদি বলা ধরে নেই যে, প্রতিটি নবীই রাসূল তবে তাঁর পরে আর কোন রাসূলও আসবে না।

এই উদাহরণের ভিত্তিতে নবী ও রাসূলের মধ্যে ঠিক মানুষ ও জ্ঞানী মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক বিদ্যমান। যখনই বলল যে, আজ বাড়ীতে কোন মানুষ আসে নি অর্থাৎ জ্ঞানী মানুষও আসে নি। কিন্তু আলোচনার বিষয়ে যদি এটাও বলা হত যে, রাসূলে খোদার (সাঃ) পরে আর কোন নবী আসবে না, তার অর্থ হচ্ছে এটাই যে, আর কোন রাসূলও আসবে না।

বাহায়ী ঃ নবী ও রাসূলের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে নবী আছে সেখানে রাসূল আসবে না। আর যেখানে রাসূল থাকবে সেখানে নবী আসবে না। এ দৃষ্টিকোণে আমার কথাই যে সঠিক তা প্রমাণিত হল।

মুসলমান ঃ নবী ও রাসূলের মধ্যে এমন পার্থক্য করাটা হচ্ছে আয়াত ও রেওয়ায়েের বিপরীত। কেননা নিম্মোক্ত আয়াতে বলা হচ্ছেঃ

و لکن رسول الله و خاتم النبیین

- মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছে আল্লাহ্ রাসূল ও নবীগণের সর্ব শেষ নবী।

তদ্রুপ সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে মুসাকে (আঃ) রাসূলও বলা হয়েছে অবার

নবীও বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতে ঈসাকে (আঃ) রাসূল হিসেবে এবং সূরা মারইয়ামের ৩০ নং আয়াতে তাকে নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি এই দুটি শব্দের মধ্যে কোন প্রকার বিভেদ থাকতো তবে তা নবী (সাঃ), মুসা ও ঈসার (আঃ) মধ্যে স্বভাবের পার্থক্যে পরিলক্ষিত হত।

এ ছাড়াও এই বিষয়ের প্রতি প্রচুর পরিমানে রেওয়ায়েত রয়েছে। যা নবীকে (সাঃ) "খাতামুল মুরসালীন" এবং "লাইসা বা'দীয়া রাসূল" এবং "খাতামে রুসুলিহ্" বাক্যে সম্মানিত হয়েছেন।

বাহায়ী ঃ "খাতামুন্নাবীইন" শব্দটি হয়তো কোন বিশেষ নবীগণের সমাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহারিত হয়ে থাকতে পারে। আর এরূপ শব্দের ব্যবহার

সকল নবীর জন্যে নয়।

মুসলমান ঃ এমন কথা উল্লেখিত সকল কথার বিপরীত এবং

হাস্যকর। কেননা কেউ যদি সামান্ন পরিমানে আরবী ব্যাকারণের উপর ধারনা নিয়ে থাকে তবে সে সহজেই বুঝতে পারবে যে, আলিফ ও লাম অক্ষর দুটি কোন বহুবচনের সাথে মিলিত হলে তা সাধারণ অর্থে পরিণত হয়ে যায়। তবে যদি কেউ এ কথার অবিশ্বাস করে তবে তো আর কিছু বলার নেই। যদিও এখনো পর্যন্ত এমন কথা কেউ বলে নি। কারণ তা বলার কোন দলিলই নেই।

৯৭- ইমাম হুসাইনের (আঃ) হত্যাকারীদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মুনাযিরা

ওহাবী ঃ এই যে, শিয়ারা ইমাম হুসাইনের (আঃ) মুসিবতের ব্যাপারে আযাদারী করে থাকে এবং তাঁর প্রতি বিশেষ ধরনের ভালবাসা রাখে। তা হচ্ছে তাদের নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যা তাদের পিতাগণ করে গেছে। কেননা তাদের পিতারাই ইমাম হুসাইনকে (আঃ) হত্যা করেছিল। এখন তারা সে কাজের তওবা করে থাকে। আর তারা "তাউয়্যাবিন" হিসেবে নিজেদের অতীত পাপ মোচনের জন্য এ কাজ করে থাকে।

শিয়া ঃ এই মিথ্যা অপবাদটি কোন দলিলের ভিত্তিতে দিচ্ছো?

ওহাবী ঃ যারা সেদিন ইমাম হুসাইনের (আঃ) সাথে কারাবালায় যুদ্ধ করতে এসেছিল তারা শাম, হিজাজ ও বসরার অধিবাসী ছিল না বরং তারা কুফার অধিবাসী ছিল। আর ঐ সময়ে কুফার অধিবাসীরা প্রায় সবাই শিয়া ছিল। তারাই কারবালায় এসেছিল। সুতরাং তারাই ইমাম হুসাইনকে (আঃ) হত্যা করেছিল।

শিয়া ঃ প্রথমতঃ যদি ধরে নেই যে, কোন কোন শিয়া তলোয়ারের ভয়ে এবং ইয়াযিদের চাপের মুখে ইমাম হুসাইনের (আঃ) সাথে যুদ্ধের জন্য করবালায় এসেছিল। তবে এটা তো আর দলিল হতে পারে না যে, শিয়া মাযহাব এবং এই মাযহাবের সকলেই ভুল করেছিল এবং ইয়াযিদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, দুই দলের মধ্যে কেউ কেউ গোমরাহ্ হয়ে গিয়েছিল। তাই বলে তা তো ঐ মাযহাবের সকলের গোমরাহ্ হয়ে যাওয়া বুঝায় না।

দ্বিতীয়তঃ এটা পরিস্কার যে, আমাদের ব্যাপারে এটা হচ্ছে একটি জলন্ত মিথ্যা কথা।

ওহাবী ঃ কেন?

শিয়া ঃ যে সৈন্য দলটি সেদিন কুফা থেকে কারবালায় ইমাম হুসাইনের (আঃ) সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিল তারা কেউই শিয়া ছিল না। বরং তারা ছিল খাওয়ারেয ও উমাইয়্যাদের মিশ্রণে গঠিত একটি দল। আর তারা সকলেই ছিল কাফির। তারা অতীতেও ইমাম আলী (অঃ) ও ইমাম হাসানের (আঃ) সাথে শত্রুতা করেছিল। তাদের দলের নেতারা হচ্ছে তারাই যাদেরকে ইমাম আলী (আঃ) খেলাফতের দায়িত্ব পেয়ে সরকারী দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। সে কারণেই তারা রাসূলের পরিবারের সাথে আগে থেকেই শত্রুতা করতো। আর এ সুযোগে ইবনে যিয়াদ তাদেরকে ভালভাবে ব্যবহার করে নিয়েছিল।

তাদের সৈন্য দলে অধিকাংশই ছিল অনারব। অর্থের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে

আনা হয়েছিল। সুতরাং তাদের মাঝে শিয়া ছিল না[১]।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আলীর (আঃ) খেলাফতের সময় কুফাতে শিয়া ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইমামে শাহাদতের পরে মুয়া'বিয়ার খেলাফতের সময় তার চরিত্রহীন ও নির্দয় লোকজনের ভয়ে ও অত্যাচারে শিয়ারা একের পর এক সেখান থেকে দুরে চলে যায়। অবশ্য তাদের বেশীর ভাগই মুয়া'বিয়ার অত্যাচারী লোকের হাতে নিহত হয়েছিল। আর মুয়া'বিয়ার ইরাকের গভর্ণর যিয়াদ ইবনে আবিহ্‌র শাসনামলে কুফার শিয়ারা হয় নিহত হয়েছিল অথবা কুফা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

মুয়া'বিয়ার খেলাফতকালে যদি কেউ শির্‌ক বা কুফরির দোষে দোষী হত তবে তার কোন ভয় ছিল না। কিন্তু যদি কেউ শিয়া হিসেবে পরিচিত হত তবে তাকে হত্যা করা, তার সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়াই ছিল অত্যাচারী মুয়া'বিয়ার লোকজনদের কাজ।

যিয়াদ ইবনে আবিহ্‌ সুমাইয়্যা রুসফীর সন্তান ছিল। যখন সে কুফার দারুল আমারাহ্‌তে প্রতিষ্ঠিত হল তখন মুয়া'বিয়া তাকে এরূপ চিঠি লিখেছিল ঃ

হে যিয়াদ! যারা আলীর দ্বীনের সাথে আছে প্রথমে তাদেরকে কতল কর তারপর তাদের সাথে সন্ধি করবে।

যিয়াদ, কুফার জনগণকে মসজিদে একত্রি করে তাদেরকে আলীর (আঃ) উপর লানত করতে বলল। আরো বলল যে, যদি কেউ এটা করতে অপারগতা দেখায় তবে তাকে হত্যা করা হবে[২]।

বলা হয়ে থাকে যে, যিয়াদ ইবনে আবিহ্‌ সাঈদ ইবনে সিরহ্‌ নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য খুজে বেড়িয়েছিল। ইমাম হাসান (আঃ) একটি চিঠিতে যিয়াদকে লিখলেন যে, "........... সাঈদ ইবনে সিরহ্‌ হচ্ছে একজন বে-গোনাহ্‌ ব্যক্তি ....।

যিয়াদ ইবনে আবিহ্‌ ঐ চিঠির উত্তরে ইমাম হাসানকে (আঃ) লিখে জানালো যে, ... অবশেষে সে আমার হাতে ধরা পড়বেই....... তাকে তোমার (নাউজুবিল্লাহ্‌) অসভ্য পিতার ভালাবাসার দায়ে হত্যা করা হবে[৩]।

---

[১]। যখন শত্রু পক্ষ খিমার দিকে অগ্রসর হয়েছিল তখন ইমাম হুসাইন (আঃ) আশুরার দিনে তাদেরকে আলে আবু সুফিয়ানের অনুসারী উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ

ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان ...... হায় তোমাদের কি হবে এই আবু সুফিয়ানের অনুসারীরা। যদি তোমাদের দ্বীন না থেকে থাকে এবং কিয়ামতের দিনের ভয় না পেয় থাকো তবে অন্তত পক্ষে দুনিয়ায় স্বাধীন থাকো (লুহুফ -সাইয়্যেদ ইবনে তাউস, পৃঃ-১২)।

সুতরাং তারা ইমাম আলীর (আঃ) প্রকৃত অনুসারী তো ছিলই না এবং বাহ্যিকভাবেও না।

[২]। মুরুজুয যাহাব, খণ্ড-২, পৃঃ-৬৯, শারহে নাহাজুল বালাগা -ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড-৩, পৃঃ-১৯৯, আল্‌ গাদীর, খণ্ড-১১, পৃঃ-৩২ ও ৩৯।

[৩]। শারহে নাহ্‌জু হাদীদি, খণ্ড-৪, পৃঃ-৭২০।

যিয়াদ ইবনে আবিহ্‌র সব থেকে বড় ধরনের অত্যাচার হচ্ছে সামুরাতু ইবনে জানদাবকে তার পক্ষ থেকে কুফা ও বছরার দায়িত্বে নিযুক্ত করে। যিয়াদ ইবনে আবিহ্‌র মৃত্যুর পর মুয়া'বিয়া তাকে কুফার দারুল ইমারাতের দায়িত্বে নিযুক্ত করে। সে পরবর্তীতে ৮০ হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়[১]।

আবু সাওয়ার আদাওয়াভী বলেন ঃ সামুরাতু ইবনে জানদাব একদিন সকালে আমার গোত্রের ৪৭ জনকে যারা সকলেই কোরআনের হাফেজ ছিল নির্মমভাবে হত্যা করে[২]।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেমন ঃ হিজর ইবনে আ'দভী ও তার সঙ্গী-সাথীগণ, মালিক আশতার, মুহাম্মদ ইবনে আবু বরক, আ'মরু ইবনে হামিক ও আরো অনেকে মুয়া'বিয়ার বিশেষ অত্যাচারে শাহাদতবরণ করেন। মুয়া'বিয়ার আতঙ্কজনক খেলাফত এমন ছিল যে, আমরু ইবনে হামিকের মাথা কেটে তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল[৩]। আর সকল স্থানে তার গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই মানুষ তার অতি আপনজনের প্রতিও বিশ্বাস রাখতো না এ কারণে যে, হয়তো সে মুয়া'বিয়ার গোয়েন্দা।

আল্লামা আমিনি (রহঃ) লিখেছেন ঃ যিয়াদ ইবনে আবিহ্ কুফার লোকজনকে চিনতো, কেননা সে আলীর (আঃ) খেলাফতের সময় কুফাতেই বসবাস করতো। তাই সে শিয়াদেরকে অতি সহজেই চিনে ফেলতো এবং হত্যা করতো অথাব তাদের হাত ও পা কেটে দিতো অথবা চোখ উপড়ে ফেলতো অথবা জেলে পাঠিয়ে দিতো। আর যারা শিয়া নামে পরিচিত ছিল তাদের একজনকেও কুফায় অবশিষ্ট রাখে নি[৪]।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, ইমাম হাসানের খেলাফতকালে কুফাতে ৪/৫ হাজার শিয়া ব্যতীত আর কোন শিয়া ছিল না। কিন্তু যখন যিয়াদ ইবনে আবিহ্ গভর্ণর হয়ে এলো তখন ইমাম হুসাইন (আঃ) ইরাকে প্রবেশের আগেই তাদেরকে বন্দী করে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর এবং যিয়াদের সেখান থেকে বছরায় চলে যাওয়ার পর জেলখানার দরজা ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে আসে এবং ইমাম হুসাইনের (আঃ) রক্তের বদলা নিতে কিয়াম করে। এই ঘটনাটি ইমাম হুসাইনের (আঃ) শাহাদতের প্রায় ৪ বছর পরে ঘটে। আর তখনও মুখতারের কিয়াম সংঘটিত হয়নি। তারা ৯৩ বছর বয়স্কো সোলাইমান ইবনে সুরদ খুযায়ী'র নেতৃত্বে কিয়াম করে শামে যায় এবং সেখানে তারা বীরের মত যুদ্ধ করে শাহাদতবরণ

---

[১] । তারিখে তাবারী, খণ্ড-৬, পৃঃ-১৩৬, কামিল ইবনে আছির, খণ্ড-৩, পৃঃ-১৮৩।

[২] । ঐ

।

[৩] । আল্ গাদীর, খণ্ড-১১, পৃঃ-৪৪।

[৪] । ঐ , পৃঃ-২৮।

করেন।

আল্লামা মামাকানী লিখেছেন ঃ ইমাম হুসাইনের (আঃ) ইরাকে প্রবেশের পূর্বে ইবনে যিয়াদ ৪,৫০০ জন শিয়াকে আটক করে জেলে পাঠায়। তাদের মধ্যে সোলাইমান ইবনে সুরদীও ছিল। প্রায় ৪ বছর তারা ঐ জেলে আটকা ছিল। সুতরাং যা সত্য এবং যেভাবে ইবনে আছির উল্লেখ করেছে যে, তারা সে সময় তাদের নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিল এবং ইমাম হুসাইনের (আঃ) শাহাদতের পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে সোলাইমানের নেতৃত্বে তাউয়্যাবিন নামে একটি দল গঠন করে ইমাম হুসাইনের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য কিয়াম করে। যাতে করে পূর্বের ভুলের সমাধান হয়ে যায়[১]।

সুতরাং ইমাম হুসাইনের (আঃ) হত্যাকারী কুফার শিয়াগণ ছিলেন না। বরং তা ছিল খাওয়ারেজ ও মুনাফিকদের সংমিশ্রণে একটি সৈন্য দল, যারা ইমাম আলী ও ইমাম হাসানের (আঃ) খেলাফতকালে তাদের সাথে শত্রুতা করেছিল এবং অনারব ছিল।

---

[১]। তানকিহুল মাকাল, খণ্ড-২, পৃঃ-৬৩। যদি ধরেও নেই যে, তাদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক শিয়া নামধারী তাদের মধ্যে ছিল, তবুও তাদেরকে শিয়া হিসেবে ধরা যায় না। কেননা তারা রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণে নিম্ন পর্যায়ের শিয়া ছিল। যার কারণে শত্রু পক্ষ অতি সহজেই তাদেরকে ধোকা দিয়েছিল এবং অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে ইমাম হুসাইনের (আঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু যে শিয়ারা হক ও বাতিলকে চিনতো এবং রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণে অনেক বিচক্ষণ ছিল তাদের একজনও ইমাম হুসাইনের (আঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়নি। সুতরাং এটা কখনই বলা ঠিক হবে না যে, শিয়ারা ইমাম হুসাইনকে (আঃ) শহীদ করেছে এবং পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তাউয়্যাবিন দল গঠন করে। অবশ্যই পরিস্কার হয়ে গেছে যে, শত্রু পক্ষের ইতিহাস বেত্তারা এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে লিখেছে যে, শিয়ারাই ইমাম হুসাইনকে (আঃ) শহীদ করছে।

৯৮- হালাকাতের (ধ্বংসের) আয়াতের ব্যাপারে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতটিতে (যা হালাকাতের বা ধ্বংসের আয়াত নামে পরিচিত) এরূপ বলা হয়েছে ঃ

و انفقوا في سبيل الله و لا يلقوا بايديكم الى التهلكة و احسنوا ان الله يحب المحسنين

- আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা দান কর এবং নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংস করো না, আর ভাল কাজের আঞ্জাম দাও। কেননা আল্লাহ্ ভাল কাজের আঞ্জাম দানকারীকে পছন্দ করেন।

এখানে আমরা উক্ত আয়াত নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে, মুনাযিরা সংঘটিত হয়েছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

ছাত্র ঃ এই আয়াতের মধ্যে এক স্থানে বলা হয়েছে যে, (নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না)। এই আয়াত অনুসারে যে কিয়ামে জীবন নাশের হুমকী রয়েছে তা না করাই শ্রেয়। কেননা তা তো ধ্বংস হয়ে যাওয়ারই সমান। আর মানুষের উচিৎ নয় যে, নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে। তাই এখানে এই প্রশ্নটি উত্থিত হতে পারে যে, ইমাম হুসাইনের (আঃ) কিয়ামের সাথে এই আয়াতকে কিভাবে মিলানো যায়?

শিক্ষক ঃ এই আয়াতটি তার শুরুতেই আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার কথা বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ দান করাও হচ্ছে এক প্রকার জিহাদ। তাই বলা হয়েছে যে, এই দানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী করে অথবা তা দান না করে নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংস করো না।

তফসিরে আদদুররুল মানছুর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আসলাম ইবনে আবি ই'মরানের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছে যে, তিনি বলেন ঃ আমরা তুরস্কের রাজধানী ইসতামবুলে ছিলাম, সেখানে উ'কবাতু ইবনে আ'মের মিশরের অধিবাসীদের সাথে এবং ফায্‌যালতু ইবনে উ'বাইদ শামের অধিবাসীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রোম থেকে বিশাল বাহিনী ময়দানে উপস্থিত হল। আমরা আমাদের দলকে তাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। ঠিক ঐ সময় মুসলমানদের ভিতর থেকে রোম বাহিনীর মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো। তখন মুসলমানদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ চিৎকার করে বলল ঃ ঐ ব্যক্তি নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করলো।

রাসূলে খোদার (সাঃ) সনাম ধন্য সাহাবা আবু আইয়ুব আনসারী দাড়িয়ে বললঃ

হে মানব সকল! তোমরা নিজেদের কাছে এই আয়াতের অর্থ ভিন্ন রূপে করেছোঃ و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة । এই আয়াতটি আমাদের (আনসারদের) উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। কেননা যখন আমরা রাসূলে খোদার (সাঃ) অনুপস্থিতিতে একে অপরকে বলছিলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের বিজয় ঘটিয়েছেন এবং বর্তমানে ইসলামের অনেক শুভাকাঙ্খি হয়েছে। মধ্য থেকে আমাদের সম্পদগুলো পানিতে গেল। আল্লাহ্ তো তাঁর দ্বীনের বিজয় ঘটালেনই, তাই আমরা যদি আমাদের সম্পদের দিকে খেয়াল রাখতাম এবং তা পানিতে না ফেলতাম তবে আমাদের সম্পদগুলো নষ্ট হত না। ঐ সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত আয়াতটিকে নাযিল করেন। সতুরাং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের সম্পদকে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে দান না করা[1]।

ছাত্র ঃ এতে কোন অসুবিধা আছে কি যে, এই আয়াতটিকে আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থ দানের ব্যাপারেই বলা হয়েছে কিন্তু তাতে একটি সূত্রের মাধ্যমে এও বলে দিয়েছে যে, و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة "নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না"। যাতে করে তা সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়?!

শিক্ষক ঃ তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই আয়াতকে তখন এই ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, যে সকল ক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা বুঝা যাবে, তখন যেন আমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংস না করি।

কিন্তু প্রয়োজনীয় ও অতি প্রয়োজনীয় সূত্রের ভিত্তিতে যদি দেখা যায় যে, কোন বিষয় অত্যন্ত কঠিন বা জীবনের উপর হুমকি থাকা সত্বেও বাধ্য হয়েই করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে তা আঞ্জাম দেয়াতে কোন সমাস্যা তো নে-ই বরং তা ওয়াজীব বা প্রয়োজনীয়। আর ইসলামের অনেক আহ্‌কাম প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যেমন জিহাদ, নাহী আনিল মুনকার ওয়া আমর বে মারুফ জীবনের ঝুকি রয়েছে। কিন্তু এই ঝুকি হচ্ছে আখিরাতের পার হয়ে যাওয়ার পুল। আর তা অবশ্যই প্রশংসনীয়ও বটে।

আসলে "হালাকাত" শব্দের অর্থ হচ্ছে যার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বুঝায়। কিন্তু জিহাদের মত ঝুকিপূর্ণ কাজে আছে আখিরাতের পুরস্কার ও দুনিয়ায় সম্মান। আর এ তো কোন ধ্বংস নয়।

ইমাম হুসাইনের (আঃ) কিয়ামের ব্যাপারেও এই একই কথা বলতে হয়। কেননা তারা ঝুকিপূর্ণ কাজ করেছিল এবং শাহাদতবরণ করেছিল আর এই শাহাদত তাদেরকে এনে দিয়েছে বেহেশ্‌তের প্রশান্তি। যা কাল কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ যদি কেউ এমন একটি ঝুকিপূর্ণ কাজ করলো যার কারণে

---

[1]। তফসিরে মিযান, খণ্ড-২, পৃঃ-৭৪।

কয়েকজন নিহত হলো এবং কয়েক হাজার দিনার পরিমান অর্থেও ক্ষতিসাধন হলো। কিন্তু এই কাজের কারণে হাজার হাজার মানুষ গোমরাহীর পথ থেকে মুক্তির পথে ফিরে আসলো এবং লক্ষ লক্ষ দিনার আয় উপার্জিত হলো। এমন ঝুকিপূর্ণ কাজকে কি ধ্বংস হওয়া বলা যাবে?

আর কৃষকরা কয়েক মণ ধান ছিটিয়ে বীজ তলা তৈরী করে তা থেকে কয়েক হাজার মণ ধান উৎপন্ন করে থাকে, সেক্ষেত্রে কি তার প্রতি এমন অভিযোগ করা যাবে যে, কেন তুমি মাটিতে ধান ছিটাচ্ছো?

আর এ কারণেই কোরআন বলছে ঃ

و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض

- আর যাদি আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি মাধ্যমে ধ্বংস না করেন তবে যমিন ফ্যাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে (বাকারা ঃ ২৫১)।

ছাত্র ঃ আপনার উপযুক্ত যুক্তির কারণে আমি যে বিষয়টি সম্পর্কে খুব ভাল বুঝতে পেরেছি এ জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

৯৯- ইরানী শিয়াদের গোপন বিষয় নিয়ে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ ইরানে ইসলাম প্রবেশ করেছে ওমরের খেলাফতের সময়ে। তাহলে কেন ইরানের অধিকাংশই শিয়া মাযহাবের অনুসারী?

ইরানী শিয়া ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, ইরানীরা প্রথম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভবে শিয়া মাযহাবের অনুসারী হয়েছে। আর প্রতিটি ধাপেই তা হয়েছে প্রথম ধাপের তুলনায় আরো দৃঢ়তর। এখানে এ বিষয়ে একটি মুনাযিরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

এক অগ্নি পুজারক জ্ঞানী ব্যক্তি ঃ আমার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলোর কারণে ইরানীরা শিয়া মাযহাবের প্রতি আকর্ষিত হয়েছে তা ৪ ভাবে বিভক্ত ঃ

১- ইরানীদের যেহেতু আগে থেকেই সালতানাতী (বাদশার ছেলে বাদশাহ্) পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার প্রতি অভ্যাস ছিল তাই তারা সালতানাতী ইমামতের শাসন ব্যবস্থাকে সহজেই মেনে নিয়েছে।

২- ইরানীরা সেই পুরাতন আমল থেকেই মনে করতো যে, সালতানাত হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত। আর এরূপ আক্বীদা-বিশ্বাস শিয়া মাযহাবের সাথে ওতোপ্রতোভাবে মিশে আছে।

৩- ইরানের বাদশাহ্র কন্যা শাহারবানুর সাথে ইমাম হুসাইনের (আঃ) বিয়ের কারণে।

৪- আরবদের বিপরীতে এই শিয়ারই ছিল যে, তাদের ছত্র ছায়ায় যেন ইরানীরা অগ্নিপুজা চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং শিয়া মাযহাব হচ্ছে ইরানীদের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে তৈরীকৃত একটি মাযহাব[1]।

মুসলিম চিন্তাবিদ ঃ তোমার বর্ণিত ৪ টি বিষয়ের একটিও ইরানীরা

যে শিয়া মাযহাবের অনুসারী তার গোপন রহস্যকে প্রকাশ করতে পারেনি।

কেননা নবীর (সাঃ) আমলেই এই দেশে শিয়ার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপিত হয়েছিল। আর নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর বনি হাশিমের মধ্যে এবং সালমান, আবুযার, মিকদাদ ও আম্মারের মত লোকের মধ্যে তা প্রসার লাভ করতে থাকে। সুতরাং ইরানীদের শিয়া হওয়ার আসল কারণটি হচ্ছে নবীর (সাঃ) নূরের ছটা।

আর সাসানী শাহ্দের ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা ইরানের

---

[1]। এই বিষয়টিকে দুই ভাবে বলা হয়ে থাকে ঃ ১- অসহায় সুন্নী যারা শিয়া বলতে শুধুমাত্র একটি ইরানী রাজনৈতিক দল হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে, ২- ইরানী জাতীয়তাবাদী যারা মনে করে যে, ইরানীরা তাদের পুরাতন আইন-কানুনকে শিয়া মাযহাবের ছত্র ছায়ায় রক্ষা করেছে।

মানুষের সাথে কতই না খারাপ ব্যবহার করেছে। অতএব ইরানীরা সালতানাতের (সুলতান প্রথার) বিরুদ্ধে এবং তারা ন্যায়পরায়ণতায় বলিষ্ঠ একটি নিয়ম-নীতির খোজে ছিল যা তাদেরকে অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারবে।

আর শাহারবানুর সাথে ইমাম হুসাইনের (আঃ) বিয়ের কারণে হয়তো ইরানীদের শিয়া হওয়ার পিছনে একটুখানি প্রভাব ফেলতেও পারে।

তবে তা কখনোই প্রকৃত কারণ নয়।

অগ্নি পুজারক ঃ যদি আমার বর্ণিত ৪ টি বিয়ষ ইরানীদের শিয়া হওয়ার কারণ না হয়ে থাকে তবে প্রকৃত কারণসমূহ কি যা ইরানীদেরকে শিয়া মাযহাবের প্রতি আকর্ষিত করেছে?

মুসলিম চিন্তাবিদ ঃ এটা একটি দীর্ঘ সূত্রের ভিত্তিতে রূপ লাভ করেছে। আর তা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ১১ টি পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

১- প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশে অত্যাচারী সাসানী শাহ্দের অত্যাচারে ইরানীরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং তারা ন্যায়পরায়ণতায় বলিষ্ঠ একটি নিয়ম-নীতির খোজে ছিল যা তাদেরকে অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারবে। এ কারণে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর এ ব্যাপারে সালমানের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল। আর সালমান যেহেতু নবী (সাঃ) ও আলীর (আঃ) অতি ভক্ত ছিল তাই ইরানীরাও তদ্রূপ নবী (সাঃ) ও আলীর (আঃ) ভক্ত হয়ে যায়। কেননা ইসলামকে জানার জন্য সালমান আলীকে (আঃ) ইরানীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়।

২- ইমাম আলীর (আঃ) খেলাফতকালে তাঁর প্রশাসনিক কার্যক্রম কুফায় হওয়াতে ইরানীরা সেখানে সহজেই যাতায়াত করতো এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যায়।

৩- ইমাম হুসাইনের (আঃ) কারবালার ঘটনাও ছিল একটি মাধ্যম। যার মাধ্যমে ইরানীরা বনি উমাইয়্যার নষ্ট চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের প্রতি ধিক্কার দেয় এবং নবীর (আঃ) আহ্‌লে বাইতের প্রতি ভালাবাসা স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর ইমামে জন্য বেদনায় ভারাক্রন্ত হয়ে ওঠে।

৪- পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম সাদিকের (আঃ) সাংস্কৃতি প্রচার-প্রসারের ফলে এবং দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কারণে, যেখানে ৪ হাজারেরও বেশী ছাত্র দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষা অর্জন করে বিভিন্ন স্থানে তার প্রাচারের কাছে লিপ্ত থাকতো।

৫- ইরাকের পরে ইরানের কোম শহরে বিদেশী শিয়া ছাত্রদের দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৬- ইমাম রেযার (আঃ) মদীনা থেকে ইরানের খোরাসান প্রদেশে আসাটাও হচ্ছে একটি বড় কারণ। তিনি সেখানে আসার পর বিভিন্ন দ্বীন ধর্মের বড় বড় আলেমগণকে

মুনাযিরার জন্য দাওয়াত করতেন। ইমাম মদীনা থেকে খোরাসানে আসার সময় প্রথম নিশাপুরে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি তৌওহীদ ইমামত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। প্রায় ২০/২৪ হাজার

লোক তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছিল[১]।

৭- ইমাম রেযা (আঃ) খোরাসানে আসার কারণে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা ও ছাত্র একের পর এক ইরানে আসতে শুরু করে। আর তাদের সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাটাও হচ্ছে একটি কারণ।

৮- শিয়া মাযহাবের বড় বড় আলেম ইরানে আসার কারণে। যেমন ঃ শেইখ কুলাইনি, শেইখ তুসি, শেইখ সাদুক, শেইখ মুফিদ ....। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত। তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে সাধারণ মানুষকে হিদায়ত করতেন।

৯- আলে বুয়ের শাসক যিনি শিয়া ছিলেন, তিনি ৪/৫ শতাব্দীতে রাজনৈতিকভাবে ইরানে শিয়া প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১০- সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে আল্লামা হিল্লির মাধ্যমে সুলতান খোদাবান্দের শিয়া মাযহাব গ্রহণ করাটাও ছিল একটি বিশেষ কারণ। এই সময়ে শিয়া মাযহাবের ব্যাপারে আল্লামা হিল্লি প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন।

১১- দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সাফাওয়াভীয়েদের ইরানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এর জন্য শিয়া বিশিষ্ট আলেমগণ যেমন আল্লামা হিল্লি, শেইখ বাহায়ী, মীর দামাদী ও আরো অনেকেই যথেষ্ট কষ্টও করেছিলেন। এই সরকারই সরকারীভাবে শিয়া মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করে[২]।

অগ্নি পুজারক ঃ শুধুমাত্র বাইরের প্রভাবের কারণেই কি ইরানে শিয়া মাযহাবের সূচনা হয়েছে, না কি আভ্যন্তরিণ প্রভাবও ছিল? না কি উভয়

প্রভাবই?

মুসলিম চিন্তাবিদ ঃ অবশ্যই বলতে হবে যে, উভয় প্রভাবই ছিল। কেননা একদিকে যেহেতু ইরানীদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবী, সত্যবাদীতার দাবী এবং নৈতিকতার আরো অন্যান্য দিক থাকার কারণে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিল সেহেতু আভ্যন্তরিণ প্রভাব অবশ্যই ছিল। তেমন অপরদিকে বাইরের প্রভাব বলতে মাসুম ইমামগণের (আঃ) দ্বারা প্রদত্ত এক ঐশীক শাসন ব্যবস্থা যা ইরানীদেরকে শিয়া মাযহাবের প্রতি আকর্ষিত করেছে।

---

[১]। আ'ইয়ানুশ শিয়া, খণ্ড-২, পৃঃ-১৮ (নতুন প্রিন্ট)।

[২]। এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারীত জানার জন্য লেখকের লেখা 'ইসলামরে প্রাথমিক পর্যায়ে ইরানী মুসলমান ও ইরানে তাশাইয়্যুর ইতিহাস' বইটি দেখুন।

ইরানীরা এই পরিপূর্ণ আইন ব্যবস্থাকে ইমাম আলী (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণের ঐশীক তাজাল্লির মধ্যে খুজে পেয়েছিল। আর তারা দেখেছিল যে, শত্রুরা তাদের ঐ ঐশী আইন ব্যবস্থার প্রতি বিরোধীতা করছে। এমতাবস্থায় তাদের সামনে দুটি রাস্তা খোলা ছিল। আর তারা নবীর (সাঃ) আহলে বাইতকে (আঃ) প্রকৃত ইসলাম হিসেবে মনস্ত করলো। তাদের অন্তরসমূহ তাদেরকে আনুগত্য করার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। তাই তাদের মাধ্যমে ইরানে প্রকৃত ইসলাম শিয়া মাযহাব রূপে প্রকাশ পেল। তাই ইরানীদের শিয়া হওয়ার পিছনে বাইরের ও ভিতরের উভয় প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। আর তাই তো নবী (সাঃ) পূর্বেই এই ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছিলেন ঃ

اسعد العجم بالاسلام اهل فارس

- আরব ব্যতীত সৌভাগ্যবান মানুষ (ইসলামকে গ্রহণ করার ব্যাপারে) হচ্ছে ইরানীরা।

এবং আরো বলেছেন ঃ

اعظم الناس نصيباً في الاسلام اهل فارس

- মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের থেকে বেশী লাভ অর্জন করবে ইরানীরা [১]।

---

[১]। কানজুলুল উ'ম্মাল, হাদীস নং ৩৪১২৫।

১০০- কোরআনের কিছু আয়াতের সাথে বাহ্যিকভাবে অন্য কিছু আয়াতের বিরোধিতা রয়েছে এ বিষয়ে মুনাযিরা

ছাত্র ঃ আমি যখন কোরআনের আয়াত পড়ি তখন কোন কোন আয়াতের সাথে অন্য কোন কোন আয়াতের বিরোধ দেখতে পাই এর কারণ কি?

শিক্ষক ঃ আল্লাহ্র বাণীতে কখনোই এরূপ পার্থক্য এবং কোন প্রকার বিরোধ থাকতে পারে না[১]। সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতটিতে পড়ে থাকবো যে,

و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

- আর যদি কোরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তবে তার মধ্যে প্রচুর পরিমানে বিরোধ ও পার্থক্য পরিলক্ষিত করতে।

আর এটি হচ্ছে কোরআনের নির্ভূলতার পক্ষে একটি বড় দলিল, যাতে কোন প্রকার বিরোধ নেই। আর এই বিরোধ না থাকাটাই হচ্ছে কোরআনের জীবিত থাকা এবং তা মু'জিযা হওয়ার কারণ। মানুষের চিন্তা শাক্তি দিয়ে তৈরীকৃত কোন বিষয় তাতে নেই বরং তা আল্লাহ্র কাছ থেকে নাযিল হয়েছে।

ছাত্র ঃ তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমি যখন কিছু কিছু আয়াতের সাতে অন্য কিছু কিছু আয়াতের তুলনা করি তখন মনে হয় আয়াতগুলোর মধ্যে বিরোধ রয়েছে?

শিক্ষক ঃ তুমি দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ কর। যাতে করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে বুঝা যাবে যে, তাদের মধ্যে বিরোধ আছে কি নেই।

ছাত্র ঃ উদাহরণ স্বরূপ দুটি নমুনা উল্লেখ করছি ঃ

১- কোরআনের কিছু কিছু আয়াতে মানুষের মর্যাদাকে অতি উচ্চে উল্লেখ করে বলেছে ঃ

فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

যখন আদমকে (মানুষকে) তৈরী করেছিলাম এবং আমার রুহ তার মধ্যে প্রবাহিত করেছিলাম তখন তাকে সিজদা করবে[২]।

কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে মানুষের মর্যাদকে এত নিচে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকে চার পা বিশিষ্ট পশুর ন্যায় বরং তার থেকেও আরো নিচে বলা হয়েছে। যেমন

---

[১]। কানজুলুল উ'ম্মাল, হাদীস নং ৩৪১২৬।

[২]। সা-দ ঃ ৭২, হিজর ঃ ২৯।

নিম্নের আয়াতটি ঃ

و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون

জিন এবং ইনসানের অনেক দলকে দোযখের জন্য তৈরী করেছি। তার এমন অন্তরের অধিকারী যার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে না এবং এমন চোখের অধিকারী যার মাধ্যমে দেখতে পায় না, আর এমন কানের অধিকারী যার মাধ্যমে শুনতেও পায় না। তারা অনুরূপ চার পা বিশিষ্ট পশুর ন্যায় বরং তার থেকেও আরো নিচে। তারা হচ্ছে উদাসীন বা অসচেতন[১]।

শিক্ষক ঃ উক্ত আয়াত দু'টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং এই আয়াত দু'টি মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করেছে, ১- ভাল, ২-মন্দ। ভালরা আল্লাহ্র দরবারে এত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন যে, ফেরেশ্তাদের সিজদা পাওয়ার যোগ্য। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের অস্তিত্বের কারণে সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করতে। কিন্তু মন্দদের মর্যাদা এত নিম্নে যে, তারা পশুদের থেকেও নিম্ন স্তরের। কেননা তাদের মধ্যে আক্বলের মত উন্নত জিনিষ থাকা অবস্থায়ও তারা পশুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।

সুতরাং প্রথম আয়াতে মানুষের এত উচ্চ প্রশংসা করার কারণ হচ্ছে, তারা তাদের বিচক্ষণতা দিয়ে ভাল পথকে অনুসরণ করেছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে এত নিম্নমানের পরিচয় দেয়ার কারণ হচ্ছে, তাদের বিচক্ষণতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ না করিয়ে বরং পশুত্বতার গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়েছে।

ছাত্র ঃ আপনার যুক্তি সঙ্গত আলোচনার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। যদি অনুমতি দেন তবে আরো নমুনা উল্লেখ করবো।

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।

ছাত্র ঃ আমরা নিম্ন আয়াতটিতে পড়ে থাকবো যে ঃ

.... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة .....

পবিত্র মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও, দুই অথবা তিন অথবা চারটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো তবে যদি ভয় পাও যে, তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে

---

[১]। আনয়া'ম ঃ ১৭৯।

না, সেক্ষেত্রে একটি স্ত্রীকে গ্রহণ কর[১]।

এই আয়াত অনুযায়ী, ইসলামে একটি পুরুষের জন্য (যদি সে তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে) চারটি স্ত্রী গ্রহণ করা জায়েয।

কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াতে পড়ে থাকবো ঃ

و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم

স্ত্রীগণের মধ্যে কখনই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তা যতই তোমরা চেষ্টা কর[২]।

তাই ফলাফল দাড়ালো এটাই যে, প্রথম আয়াত অনুযায়ী চারটি স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, কখনই তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই একের বেশী স্ত্রী গ্রহণ করা জায়েয নয়। এক্ষেত্রে এই দু'টি আয়াতের মধ্যে এক ধরনের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষক ঃ ইমাম সাদিকের (আঃ) সময় ইবনে আবিল আ'উজা নামে এক নাস্তিকের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হলে, হিশাম ইবনে হাকাম এই প্রশ্নের উত্তরটি ইমাম সাদিকের (আঃ) কাছ থেকে গ্রহণ করে তা প্রশ্নকারীদের মধ্যে বয়ান করে ও তারা উপযুক্ত উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যায়[৩]। উত্তরটি নিম্নরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে আচার-আচরণ এবং স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বিতীয় আয়াতে যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে আন্তরিক ভাবে স্ত্রীগণকে সমান পরিমানে পছন্দের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং এই দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নেই। যদি কেউ আচার-আচরণের দিক দিয়ে তার স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে (আন্ত রিক ভাবে স্ত্রীগণকে সমান পরিমানে পছন্দের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা নাও করতে পারে) তবে চারটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।

ছাত্র ঃ এই দুই আয়াতের ক্ষেত্রে 'আদালত' শব্দটিকে দুই রকম অর্থ করবো, কেননা 'আদালত' (ন্যায় প্রতিষ্ঠা) শব্দটির একটি অর্থ ব্যতীত আর কোন অর্থ নেই?

শিক্ষক ঃ সাহিত্যিক দিক দিয়ে, যদি কোন নিদর্শন থেকে থাকে তবে উক্ত শব্দের বাহ্যিক অথবা বাতেনি অর্থ করা যেতে পারে। আর উক্ত দুই আয়াতে এই নিদর্শন পরিস্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রথম আয়াতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা শুধুমত্র আচার-আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কেননা বাহ্যিক ভাবে তাই বুঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির

---

[১]। নিসা ঃ ৩।

[২]। নিসা ঃ ১২৯।

[৩]। তফসিরে বুরহান, খণ্ড-১, পৃঃ-২২০।

পরের অংশে পড়ে থাকবো ঃ

فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

নিজের সমস্ত প্রকার চাহিদাকে একজন স্ত্রীর মাধ্যমে পুরণ করো না যা অন্যদেরকে ছেড়ে দেয়ার মত হয়ে যায় বা তাদেরকে দায়িত্বহীন করে দেয়।

তাই এই দু'টি আয়াত থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে দ্বিতীয় আয়াতে আন্তরিক ভাবে স্ত্রীগণকে সমান পরিমানে পছন্দের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে আচার-আচরণ এবং স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়নি।

সুতরাং এই দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

ছাত্র ঃ আপনার যুক্তির কাছে আমি পরাজিত হলাম এবং তা গ্রহণ করলাম, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

১০১- আমাদের যুগের ইমাম হযরত মাহ্‌দীর (আঃ) ৩১৩ জন সাথীর ব্যাপারে মুনাযিরা

পূর্ব কথা ঃ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয় যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যখন আবির্ভূত হবেন তখন ৩১৩ জন সঙ্গী-সাথী কা'বার পাশে তাঁর সাথে দেখা করতে আসবে। ইমাম তাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। তারাই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যারা ইমামের সাথে বাইয়াত করবে। আর ঐ সময় ইমামের কিয়াম শুরু হবে। তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবেন। ঐ ৩১৩ জন ইমামের পতাকাবাহী হবেন এবং তারা ইমামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের গভর্ণরও হবেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা ইসলামের একজন গবেষক ব্যক্তি ও একজন সত্যের সন্ধানীর মধ্যে সংঘটিত মুনাযিরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

সত্যের সন্ধানী ঃ অনুগ্রহ করে আমাকে ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) ৩১৩ জনের সঙ্গী-সাথীর হাদীসটি বলুন?

গবেষক ঃ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ হয়েছে। একটি হাদীস তো নয়। তবে প্রত্যেক হাদীসেই বলা হয়েছে যে, তাঁর সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা হচ্ছে ৩১৩ জন। আর এই হাদীসসমূহ এত বেশী পরিমানে উল্লেখ হয়েছে যে, মানুষ তার সত্যতার ব্যাপারে জ্ঞান হাসিল করবে। তাই এটা সম্ভব নয় যে, একদল মিথ্যাবাদী এমন হাদীস জাল করবে।

সত্যের সন্ধানী ঃ মাওলানা রুমির মাসনাবীতে যেভাবে উল্লেখ হয়েছে ঃ

সমুদ্রের পানি ছেঁচে ফেলা না গেলেও,
তা থেকে তো তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়।

এরূপে, সে ব্যাপারে আমাকে কয়েকটি উদাহরণ দিন।

গবেষক ঃ সূরা হুদের ৮০ নং আয়াতের তফসিরে এসেছে যে, হযরত লুত (আঃ) তার গোত্রের লোকেদেরকে বলেন ঃ

لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد

- হায়! যদি তোমাদের বিপক্ষে আমার শক্তি থাকতো অথবা আশ্রয় স্থল অথবা ক্ষমতাবান সাহায্যকারী কেউ থাকতো তবে আমি দেখাতাম তোমাদের মত গোমরাহ্‌কারীদের সাথে কি করতে হয়?

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ এই আয়াতে ঐ 'কুওয়াহ্' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইমাম

মাহ্‌দী (আঃ)। আর "মজবুত পৃষ্ঠপোষক" -এর অর্থ হচ্ছে উক্ত ৩১৩ জন[১]।

অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, ইমাম বাকির (আঃ) বলেছেন ঃ

لكاني انظر اليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاث مأة و بضعة عشر رجلًا كان قلوبهم زبر الحديد ....

এমনটাই ভাবলাম যে, ঐ তিন'শ তেরজন সঙ্গী-সাথী যেন কুফার নাজাফ থেকে উপরে উঠছে, মনে হয় তাদের কলবসমূহ লোহার টুকরো[২]।

সত্যের সন্ধানী ঃ এই পৃথিবীর বিশাল ভুমিতে ইমাম যামানের ৩১৩ জন সঙ্গী-সাথী পাওয়া যায় নি যে, তারা তাঁর সাক্ষাতে হাজির হবে এবং তিনি আবির্ভূত হবেন ও দুনিয়ার মানুষ নাজাত পারে?

গবেষক ঃ রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, এই ৩১৩ জন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। যেহেতু ইমাম আবির্ভূত হননি তাই বুঝা যায় যে, এই দুনিয়া এখনো ঐ রূপ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মানুষ তৈরী করতে ব্যর্থ।

সত্যের সন্ধানী ঃ তারা কেমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন?

গবেষক ঃ যেমন রেওয়ায়েতে উল্লেখ হয়েছে যে, ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বলেছেন ঃ যখন ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) মক্কায় অনেক লোকের সমাগমের মধ্যে নিজের পরিচয় তুলে ধরবেন এবং তাদেরকে তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবেন তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক তাকে হত্যা করার জন্য উঠে দাড়াবে।

فيقوم ثلاثمأة و نيف فيمنعونه منه

তখন এই ৩১৩ জন রুখে দাড়াবে এবং ইমামকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে এবং তাদের পথরোধ করবে[৩]।

এ ছাড়া আরো অন্যান্য রেওয়ায়েতে তাদের ব্যাপারে এসেছে যে ঃ

.... يجمعهم الله بمكة قزعاً كقزع الخريف

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে মক্কায় একত্রিত করবেন, ঠিক হেমন্তের খণ্ড খণ্ড মেঘের ন্যায়[৪]।

(অর্থাৎ তারা দ্রুত গতিতে উচ্চ পর্যায়ে এবং উত্তম সজ্জায় নিজেদেরকে মক্কায় উপস্থিত করবেন)।

---

[১]। তফসিরে বুরহান, খণ্ড-২, পৃঃ-২২৭।

[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ-৩৪৩।

[৩]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ-৩০৬।

[৪]। আ'ইয়ানুশ শিয়া, খণ্ড-২, পৃঃ-৮৪।

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ

و كاني انظر الى القائم على منبر الكوفة، و حوله أصحابه ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلًا عدة اهل البدر، و هم اصحاب الالوية و هم حكام الله في ارضه على خلقه ...

এমনটাই যে, ইমাম যামানকে (আঃ) কুফার মিম্বারের উপর দেখলাম আরো দেখলাম ৩১৩ জন সঙ্গী-সাথী অনুরূপ বদরের মুসলিম যোদ্ধাদের মত তাঁর চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তারা হচ্ছে মানুষের উপর নেতৃত্বদানকারী ও পতাকাবাহী[১]।

এই হাদীস অনুসারে, ঐ ৩১৩ জন জ্ঞান, পূর্ণতা, সাহসিকতা এবং অন্যান্য ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে থাকবেন যে, যদি পৃথিবীকে ৩১৩ ভাগে ভাগ করা হয় এবং তাদের যে কোন একজন ঐ ৩১৩ ভাগের এক ভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন (যেমন ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরানের পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন) তাহলে তা পরিচালনার ক্ষমতা তাদের মধ্যেও থাকতে হবে। সাথে সাথে তাদের প্রত্যেকেরই সমাজে প্রবেশের এবং তার উপর নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। যাতে করে তারা পৃথিবীর ঐ অংশে ইমাম মাহ্‌দীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

সত্যের সন্ধানী ঃ এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে, বর্তমান পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ৩১৩ জন ব্যক্তি নেই। অবশ্যই তার জন্য নিখুত পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ করা প্রয়োজন। যাতে করে এই পৃথিবী ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আবির্ভাবকে গ্রহণ করার জন্য তৈরী হয়। যেমনভাবে নবীগণ নিজেদের পবিত্র উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিচক্ষণ ও সাহসী সঙ্গী-সাথীর প্রয়োজন রাখতেন। ইমাম মাহ্‌দীরও (আঃ) অবশ্যই তেমন ধরনের সঙ্গী-সাথী থাকতে হবে। আমি উক্ত ৩১৩ জনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো জানতে ইচ্ছুক।

গবেষক ঃ নিম্নোক্ত আয়াতটিতে আমরা পড়বো ঃ

اين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً

যেখানেই থাকো আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন[২]।

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) সাহাবাগণ যারা হচ্ছেন ৩১৩ জন। আল্লাহ্‌র কসম! তারা হচ্ছেন এমন উম্মত যারা সকলেই এক ঘন্টার মধ্যে একত্রিত হবেন। যেমন হেমন্তের খণ্ড খণ্ড মেঘ প্রবল বাতাসের মাধ্যমে একত্রিত ও স্তূপীকৃত হয়[৩]।

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ-৩২৬।

[২]। বাকারা ঃ ১৪৮।

[৩]। নুরুস্ সাকালাইন, খণ্ড-১, পৃঃ-১৩৯।

তাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ দূরবর্তী শহর ও দেশ থেকে মক্কায় একত্রিত হবে[১]। ইমাম মাহ্দী (আঃ) মক্কার এক কিলোমিটার দূরে তাদের (৩১৩ জন) জন্য অপেক্ষা করবেন। তারা যখন ইমামের কাছে আসবেন তখন তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে কা'বার পাশে আসবেন[২]। আর তারাই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যারা ইমামের সাথে সবার আগে বাইয়াত করবেন[৩]।

তারা ইমামের পাশে অবস্থান করায় ঐশী সাহায্যের আওতাভূক্ত। আল্লাহ্র হাত ইমাম ও তাদের মাথার উপর থাকবে। যেমন ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বলেছেন ঃ এমনই যে, তোমাদের নেতাকে (ইমাম মাহ্দী) ৩১৩ জন সঙ্গী-সাথীসহ কুফার পিছনে নজাফের প্রতি অগ্রসর হতে দেখলাম। সে সময় জিব্রাঈল তাঁর ডান পার্শ্বে ও মিখাঈল তাঁর পা পার্শ্বে এবং ইসরাফিল তাঁর সামনে নবীর (সাঃ) পতাকাকে হাতে নিয়ে অগ্রসরীত হচ্ছেন। ঐ পতাকাকে কোন বিরোধী দলের সামনে ঝুকাবেন না। আল্লাহ্ তাঁর বিরোধীদেরকে ধ্বংস করবেন[৪]।

সত্যের সন্ধানী ঃ ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে শুধুমাত্র পুরুষের কথা বলা হয়েছে, তাহলে কি মহিলাদের এ ব্যাপারে কোন ভুমিকাই নেই?

গবেষক ঃ এই যে, পুরুষের কথা বেশী বলা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে, ইমামের কিয়ামের শুরুতেই প্রচুর পরিমানে জিহাদ ও যুদ্ধের বিষয় রয়েছে। যেখানে স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষা রয়েছে। কিন্তু মহিলাগণ যুদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ভাবে ইমামের নির্দেশিত পথে কাজ করে যাবে। কিছু কিছু রেওয়ায়েতে ইমামের ৩১৩ জন সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে মহিলারাও যে থাকবে তা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম বাকির (আঃ) বলেছেন ঃ

و يجيئ و الله ثلاث مئة و بضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرئة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعاً كقزع الخريف

আল্লাহ্র কসম! ৩১৩ জন পুরুষ আসবে তাদের মধ্যে ৫০ জন হচ্ছে মহিলা। পূর্বে কোন রূপ ওয়াদা দেয়া ছাড়াই তারা মক্কায় একত্রিত হবে। তাদের আসাটা অনুরূপ হেমন্তের মেঘের ন্যায়[৫]।

মুফায্যাল হতে উল্লেখ হয়েছে যে, ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সাথে ১৩ জন মহিলা থাকবে।

---

[১] । ইসবাতুল হুদা, খণ্ড-৭, পৃঃ-১৭৬।
[২] । ঐ , পৃঃ-৯২।
[৩] । বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ-৩১৬।
[৪] । ইসবাতুল হুদা, খণ্ড-৭, পৃঃ-১১৩, আ'ইয়ানুশ শিয়া, খণ্ড-২, পৃঃ-৮২ (নতুন প্রিন্ট)।
[৫] । বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ- ২৩৩, আ'ইয়ানুশ শিয়া, খণ্ড-২, পৃঃ-৮৪ (নতুন প্রিন্ট)।

বললাম ঃ তারা কি কারণে ইমামের পাশে থাকবে?

তিনি বললেন ঃ তারা আহতদেরকে সেবা করবে, যেমন নবীর (সাঃ) সময় তাঁর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উক্ত কাজের আঞ্জাম দিত[১]।

সত্যের সন্ধানী ঃ উক্ত সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ইমাম মাহ্দীর (আঃ) বিশ্বব্যাপী কিয়ামের ক্ষেত্রে খুবই কম।

গবেষক ঃ এই সংখ্যক সঙ্গী-সাথী কাজের শুরুতেই ইমামের সাথে একত্রিত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তা দিনের পর দিন পর্যায়ক্রমিকভাবে সঙ্গী-সাথীর পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ তারা হচ্ছে ইমামের বিশেষ সঙ্গী-সাথী ও তাঁর বিশ্বব্যাপী কিয়াম পরিচালনার মূল কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করবে। যেমন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, "৩৬০ জন এলাহী পুরুষ হাজারুল আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে ইমামের সাথে বাইয়াত করবে এবং তারা হচ্ছে তাঁর মন্ত্রী। যারা এই পৃথিবী পরিচালনা করার গুরুদায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিবেন"।

ইমাম বাকির (আঃ) বলেছেন ঃ কুফার থেকে ৭০ হাজার লোক যারা হচ্ছে সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সাহায্য করার জন্য একত্রিত হবে[২]।

---

[১]। ইসবাতুল হুদা, খণ্ড-৭, পৃঃ-১৫০ ও ১৭১।

[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ-৩৯০।

মুনাযিরা বিষয়ক আলোচনা পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বিশেষ কিছু হাদীস

১- ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ

ان القائم صلوات الله عليه ينادي باسمه ليلة ثلاث و عشرين و يقوم يوم عاشورا يوم قتيل فيه الحسين (ع).

ঐরূপ হযরত কায়েমের (আল্লাহ্‌র দরুদ তাঁর উপর বর্ষিত হোক) নাম ২৩শে (রমযানের) রাতে ধ্বনিত হবে। আশুরার দিনে, ইমাম হুসাইনে (আঃ) শাহাদাত দিবসে তিনি কিয়াম করবেন[১]।

২- ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বলেছেন ঃ

اذا قام قائمنا اذهب الله عزو جل عن شيعتنا العاهة، و جعل قلوبهم كزبر الحديد و جعل قوة الرجل منهم قوة اربعين رجلا و يكونون حكّام الارض و سنامها

যখন আমাদের কায়েম কিয়াম করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা সব ধরনের আপদ ও আতঙ্ককে আমাদের শিয়াদের থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন এবং তাদের অন্তরসমূহকে লৌহ খণ্ডের ন্যায় মজবুত করে দিবেন। আর তাদের প্রত্যেকের শক্তিকে ৪০ জনের শক্তির সমান করে দিবেন এবং তারা পৃথিবীর নেতৃত্বদানকারী হবে[২]।

৩- ইমাম বাকির (আঃ) বলেছেন ঃ

فاذا وقع امرنا و خرج مهدينا، كان احدهم اجرى من الليث، و امضى من السنان، و يطأ عدونا بقدميه و يقتله بكفيه

যখন আমাদের নির্দেশ চলমান হবে এবং আমাদের মাহ্‌দী আবির্ভূত হবে, আমাদের শিয়াদের প্রত্যেকেই সিংহের থেকে বেশী সাহসী ও বল্লমের থেকেও তীক্ষ্ম হবে। শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে[৩]।

৪- ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ

لتعدن احدكم لخروج القائم و لو سهماً

তোমরা অবশ্যই কায়েমের কিয়ামের জন্য অন্ত্যতপক্ষে একটি তীর সংগ্রহ করার

---

[১] । এরশাদে মুফিদ, পৃঃ-৩৪১, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ-২৯০।
[২] । বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ- ৩১৭।
[৩] । ইসবাতুল হুদা, খণ্ড-৭, পৃঃ- ১১৩।

মাধ্যমে হলেও তৈরী হয়ো[১]।

৫- তিনি আরো বলেছেন ঃ

يدل له كل صعب

সকল ও সব ধরনের সমস্যা ইমাম মাহ্দীর (আঃ) উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ ও বশীভূত হবে[২]।

-সমাপ্ত-

[১]। গাইবাতুন না'মানি, পৃঃ-১৭২।
[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫২, পৃঃ- ২৮৩।